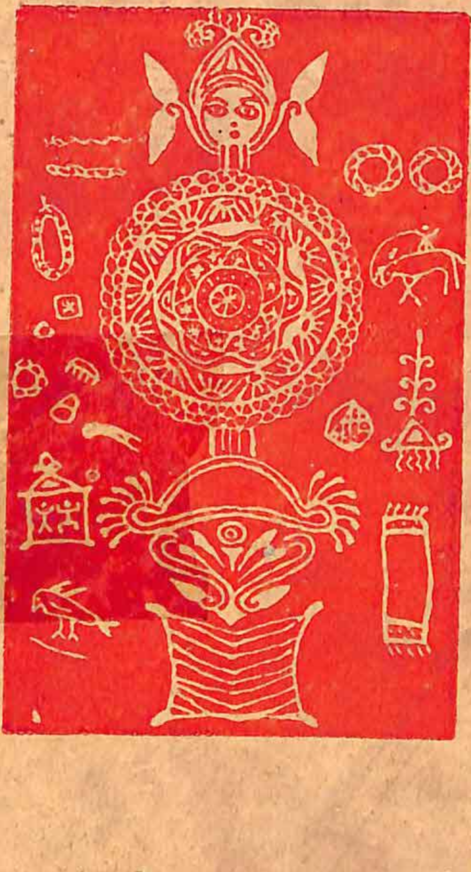
বাঙালীর ইতিহাস



॥ সংক্ষেপে ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়-এর 'বাঙালীর ইতিহাস (আদি পর্ব)' ॥

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

বাঙালীর ইতিহাস

বাঙালীর ইতিহাস

(সংক্ষেপে ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়-এর 'বাঙালীর ইতিহাস : আদিপর্ব')

স্বভাষ মুখোপাধ্যায়

নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

নিউ এজ সংস্করণ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭
জুন, ১৯৬০

প্রকাশক :
জে. এন. সিংহ রায়
নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ
২২, ক্যানিং স্ট্রীট
কলিকাতা-১

প্রচ্ছদপট :
খালেদ চৌধুরী

মুদ্রক :
রণজিৎ কুমার দত্ত
নবশক্তি প্রেস
১২৩, লোয়ার সারকুলার রোড
কলিকাতা-১৪

ছয় টাকা

নতুন সংস্করণের ভূমিকা

সুভাষ-কৃত সংক্ষিপ্ত "বাঙালীর ইতিহাস"-এর দ্বিতীয় সংস্করণ বেরুচ্ছে, আমার পক্ষে এ অত্যন্ত আত্মপ্রসাদের বিষয়। এ-সংস্করণে প্রথম অধ্যায়ের গোড়ার দিকটা একেবারে নোতুন করে লেখা হয়েছে; ইতিমধ্যে যে-সব নোতুন তথ্য ও ব্যাখ্যা পণ্ডিত-সমাজের গোচর হয়েছে তাতে এর প্রয়োজন ছিল। কিছু কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারও ইতিমধ্যে হয়েছে; তার ফলাফলও এই সংস্করণে ব্যবহার করা হলো।

বাঙালী জীবনের ইতিহাস ও "বাঙালীর ইতিহাস" গ্রন্থের প্রতি সুভাষের অনুরাগ আবার এই সংস্করণের পাতায় পাতায় ধরা পড়েছে। এই উপলক্ষে সুভাষের প্রতি আমার প্রীতি, তার উপর আমার শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের স্বাক্ষর আবার আমার রাখবার সুযোগ হলো, এজন্য ধন্য মানছি।

২৩. ৫. ৬০

নীহাররঞ্জন রায়

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

মূল "বাঙালীর ইতিহাস : আদিপর্ব" প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই অগণিত বাঙালীচিত্তের গুটি দুই অনুরোধ আমার কাছে পৌছেছিল ; প্রথমটি, এই গ্রন্থের একটি সহজ সংক্ষিপ্ত সুলভ বাংলা সংস্করণ, এবং দ্বিতীয়, একটি সংক্ষিপ্ত ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশ করা। এই দুটি প্রস্তাবের একটিতেও আমার এতটুকু ব্যক্তিগত আপত্তি ছিল না, এখনও নেই, বরং সাগ্রহ সম্মতি আছে। কিন্তু, সব কাজ তো সকলের সাধ্য নয়, সকলের কর্তব্যের সীমার মধ্যেও নয়। আমার ধারণা, উপরোক্ত দুটি প্রস্তাবই আমার সাধ্যের অতীত এবং আমার সীমিত কর্তব্যেরও অতীত। তাছাড়া, যে স্বল্প সময় ও শক্তি আমার আয়ত্তে, তা মৌলিক. গবেষণা ও আলোচনায় নিয়োগ করে যে ভাবে আমি সার্থক হতে পারবো, অন্যতর উপায়ে আমার ক্ষুদ্রশক্তিতে তা সম্ভব নয়। তবু, মনে মনে আশা ছিল, দেশবাসীর আগ্রহের মূলে যদি সত্যনিষ্ঠা কিছু থেকে থাকে, তা হলেই তাঁদেরই কেউ না কেউ অগ্রসর হবেন এ-কাজ নিজের হাতে তুলে নিতে।

আমার সে-আশা অংশত সার্থক হয়েছে এই কিশোর সংস্করণ প্রকাশে।

সাত মাস আগে, আমার এবারকার প্রবাস-যাত্রার প্রায় অব্যবহিত পূর্বে, আমার কনিষ্ঠ সোদরোপম সুহৃদ, কবি, লেখক ও দেশব্রতী শ্রীমান সুভাষ মুখোপাধ্যায় যেদিন নিজের হাতে কিশোর-সংস্করণ রচনার প্রস্তাব নিয়ে আমার কাছে এসেছিলেন সেদিন সাগ্রহ সম্মতিদানে আমার এতটুকু দ্বিধা ছিল না, একমুহূর্তও বিলম্ব হয়নি। আজ আমার প্রবাসবাসের মধ্যেই সে-গ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে, পাণ্ডুলিপি বা মুদ্রিত গ্রন্থাংশ দেখবার ও পড়বার সুযোগও আমার হয়নি, তবু আমি জানিয়েছি, গ্রন্থ মুদ্রিত হতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নেই। শ্রীমান সুভাষকে যাঁরা জানেন তাঁরা অন্তত বুঝবেন, আমার এই নিরংকুশ বিশ্বাসের মূল কোথায়। আশা করি, এর বেশি কিছু বলবার প্রয়োজন নেই।

মূল "বাঙালীর ইতিহাস : আদিপর্ব"-র প্রকাশক "বুক এম্পরিয়মের"

BANGALIR ITIHASH

by

Subhas Mukhopadhyaya

Rs. 5·00 only.

বিচিত্র বাঙালী

বাংলা দেশের দোরগোড়ায় রাজমহল পাহাড়। সেখানে বনেজঙ্গলে থাকে পাহাড়ী জাত মালেরা। দ্রবিড়-ভাষায় 'মাল' বলতে বোঝায় পাহাড়ী। তাদের ছোট্টখাট্টো চেহারা, গায়ের রং মিশমিশে কালো, নাক চ্যাটালো—বেদে নিষাদদের যে বর্ণনা আছে তার সঙ্গে হুবহু মেলে। সিংহলের ভেড্ডাদের মত দেখতে ব'লে এদের নৃতাত্ত্বিক নাম ভেড্ডিড।

পুরনো খবর

এই 'ভেড্ডিড' বা ভেড্ডাপ্রতিম মানুষেরাই এদেশের প্রকৃত আদিবাসী। শুধু বাংলাদেশ নয়, সারা ভারতবর্ষেই এক সময়ে তাদের বিস্তৃত বসবাস ছিল। এদেশের বেশির ভাগ মানুষের রক্তে তাদের রক্ত মিশে আছে।

এতদিন আগের কথা আজ আমরা কেমন ক'রে জানলাম? ছোট ছেলে দেখে যেমন আমরা বলি 'নাকটা হয়েছে বাপের মত কিন্তু চোখ দুটো হয়েছে মা'র মত', তেমনি নৃতাত্ত্বিকেরা দেহের গড়ন দেখে ব'লে দেন কার শরীরে কোন্ পূর্বপুরুষদের রক্তের ধারা বইছে। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা একেবারে মাটির পেট থেকে যেসব খবর বার করেন, বিভিন্ন জাতের ঠিকুজি কুলজি বার করার ব্যাপারে নৃতাত্ত্বিকদের তা খুবই কাজে লাগে।

যেমন, একটা খবরের কথা ধরা যাক। শিবালিক পাহাড় অঞ্চলে টারশিয়ারি যুগের নরবানরের দাঁত আর চোয়ালের হাড় পাওয়া গেছে। এ থেকে বোঝা যায়, এদেশে বিবর্তনের ধারায় মানুষের আবির্ভাবের জমি তখন থেকেই তৈরি হচ্ছিল।

একেবারে পুরনো পাথরের যুগ থেকেই এদেশে যে মানুষের বসবাস ছিল তার তো অঢেল পাথুরে প্রমাণ ঢের আগেই আমাদের হাতে এসেছে। তাহলে এ-কথা জোর ক'রেই বলা যায়, হিমযুগের পর থেকে এদেশ কখনই জনশূন্য থাকেনি। এখানকার নানা জায়গায় নানা রকম জলহাওয়ায় নানান দলে ভাগ হয়ে মানুষ বসবাস

পাথুরে প্রমাণ

সৌজন্য ও সাগ্রহ সম্মতি ছাড়া এই কিশোর সংস্করণ প্রকাশ সম্ভব হতো না। তাঁরা এই সূত্রে এবং নানাভাবে আমার সকৃতজ্ঞ বন্ধুত্ব অর্জন করেছেন।

এই সংস্করণ যদি বাংলাদেশের কিশোর-কিশোরীদের চিত্তকে কোনো দিক দিয়ে সার্থক ও সমৃদ্ধ করে, তাহলে তার যা কিছু কৃতিত্ব সে হবে বাংলাদেশের এবং শ্রীমান সুভাষের প্রাপ্য। সুভাষ একান্ত উৎসুক ও অগ্রণী না হলে এত শীঘ্র এই সংস্করণ প্রকাশিত হতো কিনা সন্দেহ। তা ছাড়া, এমন সহৃদয় ও প্রতিভাদীপ্ত পরিবেষ্টাও তো বাংলাদেশে খুব সুলভ নয়। সুভাষের শক্তি, হৃদয়বত্তা ও আদর্শনিষ্ঠায় আমার শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস বহুদিনের, তার সঙ্গে আমার প্রীতিময় বন্ধুত্বের সম্বন্ধও বহুদিনের ; কাজেই, কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সে-সম্বন্ধকে খর্ব করবার ইচ্ছে আমার নেই। তবে, আজ এই কিশোর সংস্করণ উপলক্ষ ক'রে তা প্রকাশ্য স্বীকৃতি লাভ করলো এতে আমি আনন্দিত। ৩০ জুলাই, ১৯৫২।

ওয়াশিংটন সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়,
সিয়াটেল ॥ য়ুনাইটেড্ স্টেট্স্ ॥

নীহাররঞ্জন রায়

প্রথম সংস্করণ প্রসঙ্গে

ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়-এর 'বাঙালীর ইতিহাস : আদিপর্ব' আগাগোড়াই আমি এ-বইতে সহজ ক'রে সংক্ষেপে বলবার চেষ্টা করেছি। সে চেষ্টা কতটা সার্থক হয়েছে পাঠকেরা বিচার করবেন। মূল গ্রন্থটিকে আমি পায়ে পায়ে সশ্রদ্ধভাবে অনুসরণ করেছি—যেখানে পেরেছি মূলগ্রন্থের ভাষা পর্যন্ত প্রায় অবিকল রেখেছি। সহজ ও সংক্ষেপ করতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রেই হয়ত তা সম্ভব কিংবা সফল হয়নি। তথ্যের দিকে সজাগ থাকতে গিয়ে জায়গায় জায়গায় হয়ত ভারাক্রান্ত ব'লে মনে হবে; খটোমটো নাম, সালতারিখের জঙ্গলে অনেক ক্ষেত্রে পাঠকের হয়ত ধাঁধাঁ লাগবে। লেখবার সময়ও এ মুশকিল সম্বন্ধে আমি অবহিত ছিলাম। কিন্তু তা সত্ত্বেও তা বাদ দিইনি এজন্যে যে, হয়ত মনে রাখার দিক থেকে অত সব তথ্য, সালতারিখ বা নামের দরকার হবে না—তবু বইতে থাকা ভালো। কোন সময় কোন দরকার হ'লে যাতে হাতের কাছে পাওয়া যায়। পড়তে ভালো না লাগলে স্বচ্ছন্দে বাদ দেওয়া যাবে। বিশেষ ক'রে হয়ত কাঠখোট্টা মনে হবে রাজারাজড়া'র অধ্যায়। এ অধ্যায় সকলের পক্ষে খুঁটিয়ে পড়ার দরকার নেই। অথচ বাঙালীর ইতিহাসের একটা কালানুক্রমিক ধারণা খাড়া করার জন্যে বিভিন্ন অধ্যায় পড়তে গিয়ে মাঝে মাঝে হয়ত রাজারাজড়ার অধ্যায়ে চোখ বুলিয়ে নেবার দরকার হবে। রাজবংশের কালানুক্রম বুঝতে যাতে কিছুটা সুবিধে হয়, তার জন্যে ঐ অধ্যায়ের শেষে রাজবংশের মোটামুটি একটা তালিকা দেওয়া হল। মূলগ্রন্থটিতে প্রায় প্রত্যেক অধ্যায়ের সঙ্গেই গ্রন্থ-পঞ্জী আছে। তা থেকে মাত্র কয়েকটি বেছে নিয়ে একত্র ক'রে এই বইয়ের শেষে দেওয়া হল। মূলগ্রন্থের মতই এ বইতে people অর্থে 'জন', caste অর্থে 'বর্ণ' বা 'জাত', race অর্থে 'নরগোষ্ঠী', tribe অর্থে 'কোম', tribal অর্থে 'কৌম' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

বাংলাদেশের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করবার অধিকার কিংবা স্পর্ধা আমার নেই। এ বইতে সে চেষ্টাও আমি করিনি। মূলগ্রন্থ সহজ ও সংক্ষেপ

করতে গিয়ে নিজের অজ্ঞাতে হয়ত দু'এক জায়গায় এমন ধারণারও সৃষ্টি ক'রে থাকতে পারি, যা ভুল অথবা মূলগ্রন্থের লেখকের অভিপ্রেত নয়।

মূলগ্রন্থের লেখক ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়কে কৃতজ্ঞতা না জানালে সংকলকের কথা ফুরোয় না। কৃতজ্ঞতাটা মামুলি নয়। বাংলাদেশের ইতিহাস যে এত হৃদয়গ্রাহী, এত কৌতূহলোদ্দীপক হতে পারে 'বাঙালীর ইতিহাস: আদিপর্ব' পড়বার আগে আমার মত অনেকেরই বোধ হয় তা জানা ছিল না। বাংলাদেশকে আরও বেশি ভালবাসতে, আরও গভীরভাবে জানতে এই বই আমাকে প্রেরণা দিয়েছে। এ বই পড়তে পড়তে মনে হয়েছে বাংলাদেশের ইতিহাসে এখনও অনেক ফাঁক আছে যা পূরণ হয়নি, এখনও অনেক তথ্য উপেক্ষিত আছে যা জোড়া দেওয়া হয়নি। সেই সঙ্গে মনের মধ্যে জেগে উঠেছে অনেক জিজ্ঞাসা। বাংলাদেশের ইতিহাসে কোথায় কেমন ক'রে লুকিয়ে আছে সেই অনিবার্য শ্রেণী-সংগ্রাম—ইতিহাসকে যা সামনে ঠেলে নিয়ে যায়? সমাজে-রাষ্ট্রে-সংস্কৃতিতে যা দুরপনেয় ছাপ ফেলে? মূলগ্রন্থটি প'ড়ে পাঠকের মনে যে অনুসন্ধিৎসা জাগে, তার জন্যে লেখকের কাছে কৃতজ্ঞ না থেকে উপায় নেই। এতবড় একটি স্মরণীয় গ্রন্থকে যদি কোথাও ক্ষুণ্ণ ক'রে থাকি, সে দোষ আমার।

এ কাজে কোন্ স্পর্ধায় হাত দিয়েছি নীহারবাবু এ বইয়ের ভূমিকায় তা বলেছেন। আমার প্রতি তিনি অমিতব্যয়ীর মত যে প্রশংসা বর্ষণ করেছেন, সে কথা না তুলেই আমি বলছি—সুচিরকালের এই বাংলাদেশ আর তার মানুষকে ভালবাসি ব'লেই ইতিহাসে অনধিকার সত্ত্বেও 'বাঙালীর ইতিহাস: আদিপর্ব' সহজ ও সংক্ষেপ করতে আমি সাহসী হয়েছি। আর পড়তে পড়তে কেবল ভেবেছি যদি আরও কম বয়সে ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়-এর বই আমাদের হাতে আসত! তাই লিখতে গিয়ে বাংলাদেশের আমার ছোট ভাইবোনদের কথা আপনিই আমার মনে এসে গেছে। এ সব কথা এখুনি তাদের মাথায় হয়ত ঢুকবে না, কিন্তু ফেলেছেড়ে যেটুকু তারা বুঝবে ভবিষ্যতের জন্যে তাও তাদের পুঁজি হয়ে থাকবে।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

১৯৫২

নতুন সংস্করণ প্রসঙ্গে

নতুন সংস্করণ অনেক আগেই বার হওয়া উচিত ছিল। এই দেরির জন্যে পাঠকদের কাছে ক্ষমা চাইছি।

'বাঙালীর ইতিহাস' প্রকাশিত হবার পর ভারতের জনতত্ত্ব সম্পর্কে ভারতীয় নৃতত্ত্ববিদ্‌রা পুরনো মত বর্জন ক'রে নতুন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। শ্রদ্ধেয় ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় এ বিষয়ে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং এ বইয়ের গোড়ার অংশটি সেইমত নতুন ক'রে ঢেলে সাজবার উপদেশ দেন। মূল গ্রন্থকর্তার উপদেশ অনুযায়ী আমি এ বইয়ের গোড়ার অংশটি আগাগোড়া একেবারে নতুন ক'রে লিখেছি। বলা বাহুল্য, এই পরিবর্তন ও পরিবর্জন বাঙালীর ইতিহাসের ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

এ বই লেখা ও প্রকাশের ব্যাপারে আমি মূল গ্রন্থকর্তার কাছ থেকে যে অকুণ্ঠ সাহায্য ও প্রশ্রয় পেয়েছি, সে সম্বন্ধে কিছু বলতে স্বভাবতই আমার দ্বিধা হচ্ছে। আমি তাঁর কাছে ঋণী—শুধু এই স্বীকৃতি আমার কাছে খুব অকিঞ্চিৎকর ঠেকছে।

প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হবার পর পাঠকদের কাছ থেকে আমি যে উৎসাহ পেয়েছি, নতুন সংস্করণ প্রকাশের সময় কৃতজ্ঞচিত্তে আমি তা স্মরণ করতে চাই। তাঁদের নির্দেশিত কিছু কিছু ত্রুটি এই সংস্করণে সংশোধন করবার চেষ্টা করেছি। তা সত্ত্বেও অনবধানতাবশত কিছু কিছু ত্রুটি নিশ্চয়ই থেকে গেল। পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধনের চেষ্টা করব।

২৭ পৃষ্ঠায় ৫ম লাইনে 'ষোড়শ শতাব্দী'র স্থলে 'ষষ্ঠ শতাব্দী' হবে এবং কোথাও কোথাও 'দেশোপদেশ' গ্রন্থটি ভুলক্রমে 'দশোপদেশ' গ্রন্থ ব'লে উল্লিখিত হয়েছে।

এ বই প'ড়ে পাঠকদের মধ্যে যদি মূল গ্রন্থটি পড়বার আকাঙ্ক্ষা জাগে, নকলনবিশ হিসেবে তাহলেই আমার শ্রম সার্থক হয়েছে ব'লে আমি মনে করব। মূল জিনিসটার আঁচ পাইয়ে দেবার জন্যেই 'বাঙালীর ইতিহাস'-এর এই রেখাচিত্র ; আশা করি, পাঠকেরা সেই দৃষ্টিতেই এ বইকে দেখবেন।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

২৫. ৫. ৬০

করত। পরে তাদের রক্তে বাইরে থেকে নানা রক্তের ধারা এসে মিশেছে। বাঁচবার আলাদা আলাদা ধরনের দরুন এবং রক্তে রক্তে মেশামেশি হওয়ায় দেশভেদে চেহারার নানা রকম ধাঁচ দাঁড়িয়ে গেছে। মনের গড়নে, মুখের ভাষায়, সভ্যতার বাস্তব উপাদানে তার প্রচুর ছাপ আছে।

বাংলাদেশের মাটির গুণ আর সেই মাটিতে নানা জাতের মেলামেশা —এরই মধ্যে বাঙালীর জনপ্রকৃতির বৈচিত্র্য আর ঐক্যের গোড়া খুঁজে পাওয়া যাবে।

ভেড্ডাপ্রতিম আদিবাসী

এদেশে আগে যাদের 'আদি-অস্ট্রেলীয়' বলা হত, এখন তাদের বলা হয় 'ভেড্ডিড'। 'দ্রবিড়' বা 'আর্য' আসলে নরগোষ্ঠীর নাম নয়, । ভাষাগোষ্ঠীর নাম। একই নরগোষ্ঠীর মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীর ভাষার চলন থাকতে পারে; কাজেই ভাষা দিয়ে নরগোষ্ঠীর নামকরণ করা ঠিক নয়। অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের সঙ্গে চেহারার মিল পাওয়া গিয়েছিল ব'লেই এক সময়ে এখানকার আদিবাসীদের 'আদি-অস্ট্রেলীয়' বলা হত।

ভেড্ডাপ্রতিম এই মানুষদের আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য বলতে—মাথার গড়ন একটু বেশিরকম লম্বা, নাক চওড়া, গায়ের রং মিশমিশে কালো, দেখতে বেঁটেখাটো কিংবা মধ্যমকায়। মহেন-জো-দড়োর ভগ্নস্তূপে ভেড্ডিড নরমুণ্ড পাওয়া গেছে।

বাঙালী জাতির সব স্তরেই কমবেশি ভেড্ডিড রক্তের খোঁজ পাওয়া গেছে। সাঁওতাল, ওরাঁও, মুণ্ডা, ভূমিজ, মালপাহাড়ী প্রভৃতি আদিবাসীদের তো কথাই নেই, নমঃশূদ্র, পোদ, বাউড়ি, বাগ্দী, চণ্ডাল প্রভৃতির মধ্যে, এমন কি বাঙালী ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থদের মধ্যেও ভেড্ডিড উপাদান রয়েছে।

শুধু এদেশে নয়, এক সময়ে এদেশের বাইরেও পুবে-পশ্চিমে ভেড্ডিডদের ডালপালা ছড়িয়ে পড়েছিল। আরব, আফগানিস্থান থেকে শুরু ক'রে মালয়, সুমাত্রা, ইন্দোচীন, অস্ট্রেলিয়ায় পর্যন্ত এই রক্তধারার প্রচুর চিহ্ন ছড়িয়ে আছে।

দক্ষিণ ভারতের যাদের দ্রবিড় বলা হয়, তারা ভেড্ডাপ্রতিম মানুষদেরই বংশধর। পরিবেশের প্রভাবে তাদের চেহারা নানা দিক থেকে বদলে গেছে। জীবনের ধরন বদলালে চেহারার মধ্যেও কিভাবে তার ছাপ পড়ে আমাদের ঘরের কাছে মালপাহাড়ীরাই তার বড় প্রমাণ। দু'শো বছর আগেও মালেরা আর মালপাহাড়ীরা ছিল অভিন্ন। পাহাড় থেকে

নেমে সমতলে বাস করার ভেতর দিয়ে তাদের চেহারার আলাদা ধরন দাঁড়িয়ে গেছে।

বাংলাদেশের লোকজনদের মধ্যে আরও একটি রক্তের ধারা বিশেষভাবে নজরে পড়ে। এই ধারাটির উৎস এদেশের বাইরে—মোঙ্গোলীয় বা মোঙ্গোলপ্রতিম জাতির মধ্যে। মোঙ্গোলীয় আকৃতির বৈশিষ্ট্য হল চোখের বিচিত্র গড়ন, বাদামী রঙের লাল্‌চে চোখ আর নেত্রবলী বা চোখের কোণে ভাঁজ। অবশ্য চোখের এই গড়ন সব মোঙ্গোলীয় জাতির মধ্যেই সমান মাত্রায় দেখা যায় না। বাংলাদেশের জনপ্রকৃতিতে যে মোঙ্গোলীয় শাখা সব চেয়ে বেশি ছাপ ফেলেছে, তাদের বলা হয় প্যারোইয়ান। নির্ভেজাল প্যারোইয়ান চেহারা দেখতে পাওয়া যায় হোয়াং-হো অঞ্চলের চীনাদের মধ্যে। আসামের আও-নাগা আর সেমা-নাগাদের মধ্যেও প্যারোইয়ানদের মার্কামারা চওড়া মাথা আর চ্যাটালো মুখ নজরে পড়ে। গোল বা মাঝারি মাথা, বাঁকা চোখ, দেখতে ছোটখাটো, গায়ের রং ময়লা—এই দেখে প্যারোইয়ান উপাদান ধরা যায়। বাংলার উত্তর আর পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলে নিম্নবর্ণ হিন্দু আর মুসলমানদের মধ্যে এই উপাদান খুব বেশি রকম দেখা যায়। বাংলার কোচ আর রাজবংশীদের খাঁটি প্যারোইয়ান চেহারা। পূর্ববঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রামে চাকমা, মগ প্রভৃতি উপজাতির মধ্যে মালয়ী-ইন্দোনেশিয়ান উপাদান বোঝা যায় তাদের অত্যন্ত গোলাকার মাথা, বাদামী গায়ের রং আর ছোটখাটো আকৃতি দেখে। বিশেষত পূর্বাঞ্চলের নানা জায়গায় ভেড্ডাপ্রতিম জনসাধারণের মধ্যে নানা মাত্রায় মোঙ্গোলীয় প্যারোইয়ান রক্তের মিশ্রণ ঘটেছে। সাঁওতাল প্রভৃতি মুণ্ডাভাষী মানুষদের মধ্যে এই মিশ্রণ ধরা পড়ে। নানা রকমের জল-হাওয়ায় জীবনের বিচিত্র ধরনের মধ্যে চেহারার এত বদল হয়েছে যে কোথায় কতটা পরিমাণে এই রক্তধারা মিশে আছে সঠিকভাবে বলা শক্ত।

মোঙ্গোলপ্রতিম জনধারা

ভেড্ডিড এবং দ্রবিড়রা ছাড়াও ভারতীয় জনদেহে আরেকটি দীর্ঘমুণ্ড ধারা নজরে পড়ে। এই ধারাটি 'আর্য' বা 'ইন্দো-আর্য' নামে পরিচিত। সম্ভবত তিন চার হাজার বছর আগে আরল-কাশ্যপ সাগরের কোল থেকে এদের সব চেয়ে বড় দলটা এদেশে এসেছিল। তার আগেও ছোট ছোট দল এসে থাকতে পারে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে 'ইন্দো-আর্য' বা ভারতীয় বৈদিক

ইন্দো-আর্য দীর্ঘমুণ্ড জনধারা

আর্যরা এদেশে ঢোকে। পরে উত্তর ভারত থেকে দক্ষিণ ভারত ও পূর্ব ভারতে ছড়িয়ে প'ড়ে এখানকার আদিবাসীদের সঙ্গে মিশে যায়। এই ইন্দো-আর্য নরগোষ্ঠীর চেহারার বৈশিষ্ট্য হল দেহের বলিষ্ঠ গড়ন, গৌরবর্ণ দীর্ঘ আকৃতি, লম্বা মাথা, লম্বা সরু নাক, কটা চোখ। বাঙালী ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থদের মধ্যে অল্পবিস্তর এই রকমের চেহারা দেখা যায়। রাঢ়ি ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, দক্ষিণ রাঢ়ি ও বঙ্গজ কায়স্থ এবং গোয়ালাদের শতকরা আট দশজনের মধ্যে দীর্ঘকায়, দীর্ঘমুণ্ড, দীর্ঘনাসা গড়ন চোখে পড়ে। তবে বাংলাদেশের জনসংখ্যার তুলনায় বাঙালী জাতির মধ্যে ইন্দো-আর্য উপাদান যে নেহাত কম তাতে সন্দেহ নেই। ভেড্ডিড ও মোঙ্গোলীয় মিশ্র রক্তে এই উপাদান এত অল্প মাত্রায় মিশেছে যে, তা সহজে ধরা পড়ে না।

শক-পামিরীয় মাঝারি মুণ্ড জনধারা

এদেশে ইন্দো-আর্যদের আসবার ঠিক পরে পরেই সম্ভবত পারস্য তুর্কীস্থান এলাকা থেকে এদেশে শক জাতির অভিযান শুরু হয়। ভারত-বর্ষের প্রদেশে প্রদেশে, বিশেষত দক্ষিণ ও পূর্ব ভারতে তারা ছড়িয়ে পড়ে। ক্রমে অন্যান্য জাতির সঙ্গে তারা মিশে যায়। এদের আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য হল—দেহের মাঝারি গড়ন, চওড়া গোল মাথা, মাথার পেছন দিকটা চ্যাপ্টা খাড়াই, লম্বা নাক, ঈষৎ পীতাভ চোখ। উচ্চবর্ণের বাঙালী হিন্দুদের মধ্যে এই রকম চেহারার ধরন কমবেশি দেখা যায়। নিম্নবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে এই উপাদান বিরল। নৃতাত্ত্বিকদের কারো কারো মতে, উচ্চবর্ণের বাঙালীদের গোল মাথার মূলে আছে এই শক জাতীয় উপাদান।

বেশির ভাগ বাঙালীরই মাথার গড়ন মাঝারি। রাঢ়ি ব্রাহ্মণ, দক্ষিণ রাঢ়ি ও বঙ্গজ কায়স্থ এবং বৈদ্যদের মধ্যে যে গোল মাথা দেখা যায়, তাতে গোলত্ব কমের দিকে। কারো কারো মতে, রাঢ়ি ব্রাহ্মণ,. দক্ষিণ রাঢ়ি কায়স্থ এবং অল্প পরিমাণে বৈদ্য, বঙ্গজ কায়স্থ, গোয়ালা ও পোদদের মধ্যে ভেড্ডিড ও অ্যাল্পীয় মিশ্রণ অর্থাৎ, গোল মাথা, সরু নাক ও মাঝারি আকৃতি দেখা যায়। উচ্চবর্ণের মধ্যে ও গোয়ালাদের মধ্যে এর সঙ্গে মিশেছে ইন্দো-আর্যদের দীর্ঘমুণ্ড, দীর্ঘনাসা, গৌরবর্ণ উপাদান। বাঙালীদের মধ্যে আরো একটি আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য দেখা যায় : গোল মাথা, ভারী, লম্বা-চওড়া কাঠামো—অনেকটা 'জন্‌বুল টাইপ'-এর (অ্যাল্পীয়) চেহারা। যাই হোক, গোল মাথা হওয়ার কার্যকারণগুলো আজও যথার্থভাবে সাব্যস্ত হয়নি।

সংক্ষেপে এই হল বাংলাদেশের জনতাত্ত্বিক চেহারা। কিন্তু শেষকথা বলবার সময় এখনও আসেনি। এ ব্যাপারে স্থির সিদ্ধান্তে আসতে গেলে সারা ভারতে ব্যাপকভাবে প্রত্নতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিক গবেষণা ও অনুসন্ধান দরকার। তাছাড়া ভারতবর্ষের জনগঠনের ইতিহাসের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত একদিকে মধ্যপ্রাচ্য ও মধ্য এশিয়ার নানা দেশ, অন্যদিকে দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের নানা দেশ ও দ্বীপপুঞ্জ। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে ভারতের জনজীবনের সঙ্গে এইসব দেশের জনগোষ্ঠীর আনাগোনা, দেওয়া-নেওয়ার যে বিচিত্র সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, তার হারানো সূত্রগুলো খুঁজে পাওয়া দরকার। তাছাড়া বাংলাদেশেও এখনও নৃতাত্ত্বিক মাপজোক ও তথ্যের যথেষ্ট অভাব।

মোটামুটি চেহারা

তবে সাধারণভাবে আজ এইটুকু বলা যায়: হিমযুগেই এদেশে মানুষের আবির্ভাব হয়েছে। প্রত্ন-প্রস্তর ও নব্য-প্রস্তর যুগের সেই আদিম মানুষদের সংস্কৃতির বহু নিদর্শন পাওয়া গেছে বটে, কিন্তু তাদের প্রস্তরীভূত কোন কঙ্কাল আজও পাওয়া যায়নি। তবে নানাদিকের তথ্য-প্রমাণ দেখে মনে হয় এদেশের ভেড্ডাপ্রতিম আদিবাসীরাই তাদের সাক্ষাৎ বংশধর। ভারতের সেই আদি মানবজাতিই এদেশের মাটিতে বিচিত্র ডালপালা ছড়িয়েছে। পরে তাদের রক্তে বহিরাগত বহু রক্তের ধারা এসে মিলেছে।

বাঙালীর জনপ্রকৃতিতে এ পর্যন্ত যেসব উপাদান পাওয়া গেছে, তাতে বলা যায়—ভেড্ডিড উপাদানই বাংলার জনগঠনের মূল ও প্রধান উপাদান; পরে কালক্রমে নানা অবস্থায় তাতে কমবেশি মাত্রায় পশ্চিমে ইন্দো-আর্য ও শক-পামিরীয় উপাদান এবং পূর্বে মোঙ্গোলীয় প্যারোইয়ান ও মালয়-ইন্দোনেশীয় উপাদান এসে মিশেছে।

এই বিচিত্র মেলামেশার ফলে পাঁচমেশালী জাত হয়েও কালক্রমে বাঙালীর একটা নিজস্ব গড়ন দাঁড়িয়ে গেছে। তার ফলে, বেশির ভাগ বাঙালীর চেহারাই দেখা যায় মাঝারি গোছের—মাথার গড়ন লম্বাও নয় গোলও নয়, নাক লম্বাও নয় চ্যাপ্টাও নয়, মাথায় লম্বাও নয় বেঁটেও নয়। এই মাঝারি গোছের চেহারাকেই বলা যায় মার্কামারা বাঙালীর চেহারা।

বাংলাদেশের বুকে বিভিন্ন জাতির রক্তমিশ্রণের এই ধারা প্রাগৈতিহাসিক যুগ পেরিয়ে ঐতিহাসিক কালের প্রাচীন বাংলায়ও সমানে বয়ে চলল। সে ধারা আজও থেমে যায়নি। আজও নানান জনের নানান রক্তধারা মিলেমিশে একাকার হয়ে উঠছে।

অবিচ্ছিন্ন ধারা

বাংলার বাইরের অনেক রাজবংশের পরাক্রান্ত রাজারা লোকলস্কর নিয়ে বারবার বাংলাদেশ আক্রমণ করেছে। তাদের একাংশ হয়ত স্থায়ীভাবে এদেশে থেকে গেছে। এদেশের জনসমুদ্রে কবে কোথায় তারা তলিয়ে গেছে, তার কোন হিসেব নেই। পুরনো পুঁথির পাতায় শুধু নাম হয়ে তারা বেঁচে আছে। মালব, চোড়, খস, হূণ, কুলিক, কর্ণাট, লাট, যবন, কম্বোজ, খর, দেবল বা শাকদ্বীপী—এদের এদেশে আসবার পেছনে যার যে ইতিহাসই থাক না কেন, এরা সংখ্যায় এত অল্প এবং ধারা হিসেবে এত ক্ষীণ যে, নরতত্ত্বের দিক থেকে এদের আজ আলাদা ক'রে চেনবার কোনই উপায় নেই।

রাজারাজড়াদের মধ্যে ভিন্‌প্রদেশী রাজকন্যাদের বিয়ে করার চলন ছিল। পুরুষানুক্রমে অনেক সময় এই ধারা বজায় থেকেছে। কেননা রাজবাড়ির বিয়েতে তো আর জন কিম্বা বর্ণের বালাই নেই—রাজবংশ, প্রভুবংশ হলেই হল। এইভাবে ভিন্ন প্রদেশের যে কয়েকজন নারী বাংলাদেশে এসেছে, তারাও বাংলার বিশাল জনসমুদ্রে জলবিন্দুর মত হারিয়ে গেছে।

এ ছাড়াও ভিন্ন প্রদেশ থেকে কয়েকটি রাজবংশ এসে বাংলার কমবেশি অংশে পুরুষানুক্রমে বসবাস ক'রে রাজত্ব করলেও বাংলার জনপ্রবাহে তারা কোন ছাপ রেখে যেতে পারেনি। তুর্কী বিজয়ের আগে পর্যন্ত বাংলাদেশে এই রকমের তিন-চারটি প্রধান প্রধান রাজবংশের খবর পাওয়া যায়। সপ্তম শতাব্দীর শেষার্ধে খড়্গ নামে একটি রাজবংশ সমতট অঞ্চলে প্রায় তিন-চার পুরুষ ধ'রে রাজত্ব করেছিল। দশম শতকে কম্বোজ নামে এক রাজবংশ গৌড়ে কিছুদিন রাজত্ব করেছিল। একাদশ ও দ্বাদশ শতকে এক বর্মণ রাজবংশ প্রায় পাঁচ-ছ পুরুষ ধ'রে রাজত্ব করেছে। এরপর কর্ণাট দেশ থেকে এল সেন-রাজবংশ। বাংলাদেশে তারা প্রায় দু'শো বছর ধ'রে রাজত্ব করে এবং সে-সময়কার বাংলার সমাজব্যবস্থাকে ঢেলে সেজে স্মৃতি-শাসনের রূপান্তর ঘটিয়ে সমাজের উচ্চস্তরে তারা এক নতুন সমাজবিন্যাস গ'ড়ে তুলেছিল। দু'শো বছর বাংলায় থেকে তারা একেবারে পুরোদস্তুর বাঙালী ব'নে গিয়েছিল

এবং বাংলার জনপ্রবাহে তারা নিজেদের নিঃশেষে মিশিয়ে দিয়েছিল। কর্ণাটদেশের উচ্চবর্ণের লোকেরা তো জন হিসেবে মোটামুটি গোলমুণ্ড উন্নতনাস অ্যাল্‌পাইন গোষ্ঠীভুক্ত ; উচ্চবর্ণের বাঙালীরাও তাই। কাজেই এই রাজবংশ বাংলাদেশে কোন নতুন রক্তধারা বয়ে আনতে পারেনি। আনলেও সে ধারা এত ক্ষীণ ও শীর্ণ যে, আজ তা ধরা পড়বার নয়।

তুর্কী বিজয়ের পরও বাংলাদেশে এই ধরনের শীর্ণ ও ক্ষীণ রক্তধারার কিছু কিছু ছোঁয়াচ লেগেছে। ভারতের বাইরে থেকে যেটুকু এসেছে তার দু-চারটে দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। কিছু কিছু আরবী মুসলমান পরিবার বাণিজ্য উপলক্ষে বাংলাদেশে এসে বসবাস করেছে ; নোয়াখালি-চট্টগ্রাম অঞ্চলে এবং বাংলার অন্যান্য জেলাতেও কিছু কিছু তাদের দেখা পাওয়া যায়। শত শত বছর ধ'রে একত্রে বসবাস করার ফলে বাঙালী মুসলমানদের সঙ্গে তারা এক হয়ে গেছে।

বাংলাদেশে প্রায় পাঁচ-ছ জন হাবসী সুলতান বহুদিন ধ'রে রাজত্ব করেছে। তাছাড়া হাবসী প্রহরী রাখার চলনও এদেশে কিছু কিছু ছিল। এরাও বাঙালীর রক্তেই নিজেদের রক্ত মিশিয়েছে। তাই এমন কি বাঙালী হিন্দু-মুসলমানের উচ্চস্তরেও কখনও কখনও কৃষ্ণবর্ণ, প্রশস্তনাসা, ঊর্ণাবৎ রুক্ষ কেশ, পুরু ওল্‌টানো ঠোঁট দেখতে পাওয়া যায়।

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে মগ জলদস্যুদের উৎপাতে বাংলার সমুদ্রতীরের জেলাগুলি অস্থির হয়ে উঠেছিল। তাদের মারফৎ কিছু কিছু মগ রক্তও বাঙালীর রক্তপ্রবাহে সঞ্চারিত হয়েছে।

এমনি অবিচ্ছিন্ন ধারায় শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে বাংলাদেশে বিভিন্ন জন মিলেমিশে একাকার হয়ে কালক্রমে বাঙালী জাতির সৃষ্টি করেছে।

ভাষা

বাজারে পান কিনতে গেলে আজও আমরা এক কুড়ি, দু' কুড়ি, তিন কুড়ি, এক পণ (চার কুড়িতে অর্থাৎ ৮০টায় এক পণ) হিসেবে দর করি। 'কুড়ি' শব্দটি এবং গণনা করবার এই পদ্ধতিটি আমরা কোথা থেকে পেলাম? পেয়েছি অষ্ট্রিক-ভাষাভাষীদের কাছ থেকে। মানুষের হাত ও

পায়ের কুড়ি আঙুলের সঙ্গে তাদের কুড়ি শব্দটির সম্বন্ধ। কুড়ি পর্যন্তই ছিল তাদের সংখ্যা-গণনার দৌড় এবং কুড়িতেই তাদের এক মান। 'পণ' এবং 'গণ্ডা', 'গুঁড়ি' বা 'গুঁড়া', 'গুঁটি' ('গোণ্ড' বা 'গণ্ড' থেকে) —এ সমস্তই অষ্ট্রিক ভাষার দান।

আসাম, মালয়, তালৈঙ, খাসিয়া, কোল (অথবা মুণ্ডা), সাঁওতাল, নিকোবর, মালাক্কা প্রভৃতি ভূমির বিচিত্র বিভিন্ন অধিবাসীরা যেসব ভাষায় কথা বলে, তালৈঙ ও খ্মের-গোষ্ঠীর প্রাচীন সাহিত্য যেসব ভাষায় রচিত সেই ভাষাগুলি একই পরিবারভুক্ত। এই বিরাট ভাষাপরিবারের নাম 'অষ্ট্রিক'। এইসব অধিবাসীরা জন হিসেবে একই গোষ্ঠীর নয়। ঐসব ভূখণ্ডে আদিমতম স্তরে সর্বত্রই অষ্ট্রিক ভাষার প্রচলন ছিল। নানা জন-বিবর্তনের ভেতর দিয়েও সেই ভাষাপ্রবাহ আজও চলে আসছে। এক সময় এই ভাষা মধ্যভারত থেকে আরম্ভ ক'রে সাঁওতাল ভূমি, আসাম, নিম্নব্রহ্ম, মালয়, আনাম, নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি সমস্ত ভূখণ্ডে বিস্তৃত ছিল। এই ভূখণ্ডের দক্ষিণেই দ্রবিড়ভাষী জনপদ এবং তার ফলে জোরালো দ্রবিড় ভাষা কোল ভাষার ভূখণ্ডে কোথাও কোথাও ঢুকে পড়েছে। অথচ সবাই জানে, দ্রবিড় ভাষার সঙ্গে কোল ভাষার কোন সম্বন্ধই নেই। আবার অন্যদিকে হিমালয়ের ঠিক নিচে এমন সব বুলি এখনও প্রচলিত, যেগুলি ভোট-বর্মী গোষ্ঠীর ভাষা হলেও, তাদের এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে, যা মুণ্ডা ভাষারই বিশেষ লক্ষণ। অষ্ট্রিক ভাষার বিস্তৃতি উত্তর ভারতের অনেক জায়গাতেই ছিল। পরের যুগে দ্রবিড় ও আর্য ভাষা পশ্চিমদিকে এবং ভোট-বর্মী ভাষা পূর্বদিকে অষ্ট্রিক ভাষাকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন ক'রে অধিকাংশ জায়গাতেই তাকে গ্রাস ক'রে একেবারে হজম ক'রে ফেলেছে। যে জায়গায় পারেনি বা নানা প্রাকৃতিক ও ঐতিহাসিক কারণে সম্ভব হয়নি সেখানেই কোন রকমে বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো সামান্য কিছু লোকের বুলির মধ্যে টিঁকে থেকেছে।

অষ্ট্রিক

সারা উত্তর ও পূর্ব ভারতে, কাশ্মীরে, গুজরাটে, মহারাষ্ট্রে, কর্ণাটে, বিহারে, উড়িষ্যায়, বাংলায়, আসামে, হিন্দুস্থানে, রাজপুতনায়, পাঞ্জাবে, সীমান্ত প্রদেশে, বিশেষভাবে গোটা গাঙ্গেয় উপত্যকা জুড়ে আর্যভাষার প্রবল প্রতাপ। এই আর্যভাষাই আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির বাহন। এই আর্যভাষার প্রধান রূপ 'সংস্কৃত' ; প্রাকৃতজনের

চলতি বুলি

মধ্যে 'প্রাকৃত'। প্রাকৃতের অপভ্রংশ থেকে বর্তমান উত্তর, পূর্ব ও পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার উৎপত্তি। বাংলাভাষা তার মধ্যে অন্যতম। প্রাকৃত-সংস্কৃতের মধ্যে কোথাও নিছক অষ্ট্রিক রূপে, কোথাও সংস্কৃত-প্রাকৃতের ছদ্মবেশে, বিশুদ্ধ প্রাকৃত-সংস্কৃত ভাষায় ও প্রাদেশিক বিভিন্ন ভাষায় এমন অসংখ্য শব্দ ঋগ্বেদ থেকে আরম্ভ ক'রে আজ পর্যন্ত প্রচলিত আছে, এমন ব্যাকরণ ও পদরচনারীতি আছে, যা মূলে অষ্ট্রিক ভাষা থেকে গৃহীত। এ থেকে একথাই প্রমাণ হয় যে, আর্যভাষাভাষী লোকদের আদিমতর স্তরে অষ্ট্রিকভাষাভাষী লোকের বাস ছিল এবং অষ্ট্রিকভাষী লোকের যে বিস্তৃতি আগে দেখানো হয়েছে, তার চেয়েও তাদের বিস্তৃতি আরও ব্যাপক, আরও গভীর ছিল। যেসব শব্দের সঙ্গে বাঙালীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং প্রায় অবিচ্ছেদ্য, তার কয়েকটি নমুনা নিচে তুলে দেওয়া হল।

খাঁ খাঁ, খাঁখাঁর, বাঁখারি, বাদুড়, কানি (ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো), জাং (জঙ্ঘা), ঠেঙ্গ, ঠোঁট, পাগল, বাসি, ছাঁচ, ছাঁচতলা, ছোক্রা, কলি (চুন), ছোট, পেট, খোস, ঝোড় বা ঝাড়, ঝোপ, ডোম, চোং, চোঙ্গা, মেড়া, বোয়াল, করাত, দা বা দাও, পগার, গড়, বরজ, লাউ, লেবু-লেম্বু, কলা, কামরাঙ্গা, ডুমুর প্রভৃতি সমস্ত বাংলা শব্দই মূলত অষ্ট্রিক-গোষ্ঠীর ভাষার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ। পুণ্ড্র-পৌণ্ড্র, তাম্রলিপ্তি—তাম্রলিপ্তি—দামলিপ্তি এবং বোধহয় গঙ্গা ও বঙ্গ নাম দুটিও একই অষ্ট্রিক গোষ্ঠীর ভাষার দান। কপোতাক্ষ ও দামোদর নাম দুটিও কোল কব-দাক ও দাম-দাক থেকে গৃহীত। কোল দা বা দাক অর্থে জল এবং দা বা দাক থেকেই সংস্কৃত উদক। মুণ্ডা 'ঢেঙ্কি' বাংলায় 'ঢেঁকি', মুণ্ডা 'মোটো' বাংলায় 'মোটা'। অষ্ট্রিকভাষাভাষী লোকেরা নিজেদের ভাষায় নদনদী, পাহাড়পর্বত, গ্রাম-জনপদের যেসব নামকরণ করেছিল, আজও বাংলা বুলিতে তার কিছু কিছু রেশ আছে। যেমন শিয়ালদহ বা শিয়াল-দা, ঝিনাইদহ বা ঝিনাই-দা (দহ বলতে বোঝায় জলভরা গর্ত, নদীগর্ভের গর্ত)।

অষ্টম শতকের "আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প" বইতে কর্মরঙ্গাখ্য (য়ুয়ান-চোয়াঙের কামলঙ্ক, চীনা গ্রন্থের লংকীয়া, লংকীয়াসু), নাড়িকের (নারিকেল), বারুসক (এখনকার বারোস), নগ্ন (এখনকার নিকোবর), বলি এবং যবদ্বীপের

'র'-কারবহুল অস্পষ্ট ও রূঢ় ভাষার উল্লেখ আছে। এই শ্রুতিকটু অসুর-ভাষাভাষীদেরই ঋগ্বেদে সম্ভবত 'অসুর' বলা হয়েছে। "আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্পে" বঙ্গ, সমতট, হরিকেল, গৌড় ও পুণ্ড্রের লোকদের অর্থাৎ **'অসুর'** পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ বঙ্গের লোকদের 'অসুর'-ভাষাভাষী বলা হয়েছে। কোল-মুণ্ডা গোষ্ঠীর অন্যতম প্রধান বুলির নাম এখনও 'অসুর' বুলি। মধ্যভারতের পূর্বখণ্ডে যারা অসুর বুলিতে কথা বলত, তারা আদি-অস্ট্রেলীয় পরিবারের লোক তাতে সন্দেহ নেই। গৌড়-পুণ্ড্রের আদিমতর স্তরে যে আদি-অস্ট্রেলীয়দের বিস্তৃতি ছিল, ভাষা থেকেও তার প্রমাণ পাওয়া গেল।

বাংলাদেশে আজও লোকে কুকুর ডাকবার সময় চু চু বা তু তু বলে। কুকুরের অষ্ট্রিক প্রতিশব্দ থেকে কথাটা বাংলায় এসেছে। খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে জৈন প্রচারক মহাবীর যখন রাঢ় ও সুহ্মে (দক্ষিণরাঢ) এসেছিলেন তখন সেখানকার লোকেরা 'ছু' 'ছু' ব'লে চীৎকার ক'রে তাঁকে কামড়াবার জন্যে কুকুর লেলিয়ে দেয়। এই ঘটনা থেকে আঁচ করা যায়-যে, খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে রাঢ়ে-সুহ্মে অষ্ট্রিক গোষ্ঠীর ভাষার প্রচলন ছিল। এই দু'জায়গায় আজও অষ্ট্রিক ভাষাভাষী পরিবারভুক্ত সাঁওতাল ও কোলদের বাস দেখতে পাওয়া যায়।

অষ্ট্রিক ভাষার মতই দ্রবিড় ভাষা থেকেও আর্যভাষায় সংস্কৃতে-প্রাকৃতে-অপভ্রংশে অনেক শব্দ, পদরচনা ও ব্যাকরণরীতি ইত্যাদি ঢুকে পড়েছে। এ থেকে প্রমাণ হয় যে, আর্যভাষাভাষী লোকেরা দ্রবিড়ভাষাভাষী **মোঙ্গোলীয়** লোকদের সংস্পর্শে এসেছিল। প্রাচীন ও বর্তমান বাংলার অসংখ্য জায়গার নাম, নামের উপান্ত 'ড়া' (বগুড়া হাওড়া, রিষড়া, বাঁকুড়া), 'গুড়ি' (শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি), জুলি (নয়নজুলি), জোল (নাড়াজোল), জুড় (ডোমজুড়), ভিটা, কুণ্ড প্রভৃতি শব্দ দ্রবিড় ভাষা থেকেই এসেছে।

মোঙ্গোলীয় ভোট-ব্রহ্ম ভাষার প্রভাব বাংলায় খুবই ক্ষীণ ও শীর্ণ। অবশ্য উত্তরতম ও পূর্বতম প্রান্তের লোকদের মধ্যে চলতি বুলিতে কিছু কিছু ভোট-ব্রহ্ম শব্দের খোঁজ পাওয়া যায়। সংস্কৃতে যে নদীকে ত্রিস্রোতা বলা হয়, তা ভোট-ব্রহ্ম দিস্তাং বা তিস্তা শব্দ থেকেই এসেছে।

বাস্তব সভ্যতা

'ভেতো' বাঙালী ব'লে বাঙালীদের একটা দুর্নাম আছে। এই দুর্নামের পেছনে রয়েছে এক গৌরবময় সুপ্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস। সে সভ্যতা হল কৃষি-সভ্যতা। অষ্ট্রিক-ভাষাভাষী আদি-অস্ট্রেলীয় লোকেরাই এদেশে প্রথম চাষ-আবাদের প্রচলন করে। কাঠের লাঙলে তারা প্রধানত ধানের চাষ করত। ধানই ছিল তাদের প্রধান খাদ্য। আর 'লাঙল' শব্দটাও তাদেরই ভাষা থেকে নেওয়া। এ থেকে বোঝা যায়, আর্যভাষীরা চাষের কাজ জানত না। লাঙলের সাহায্যে চাষ করবার কায়দাটা তারা অষ্ট্রিকভাষীদের কাছ থেকেই শেখে। অষ্ট্রিকভাষী লোকেরা ভারতের যেখানে যেখানে ছড়িয়ে ছিল, সব জায়গাতেই ধান চাষের প্রচলন করে। নদনদী আর বৃষ্টির জলে ধানের ফসল বেশি হয় বলেই বাংলা, আসাম, উড়িষ্যা আর দক্ষিণ ভারতের সমুদ্রশায়ী সমতল ভূমিতে ধানের চাষ এত ব্যাপক।

ভারতবর্ষে যব আর গমের চাষের প্রচলন করে দ্রবিড়ভাষী দীর্ঘমুণ্ড লোকেরা। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত থেকে শুরু হয়ে ক্রমে তা বিহার পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। যব আর গম ধানের মতো তত বারিনির্ভর নয়; তাই উত্তর ভারতে যব আর গমের চাষ এত বেশি। উত্তর ভারতের লোকদের যেমন সাধারণভাবে রুটি, বাংলা-আসাম-উড়িষ্যা ও দক্ষিণ ভারতের সমুদ্রশায়ী সমতলভূমির লোকদের তেমনি ভাতই প্রধান খাদ্য। এই প্রসঙ্গে আরও একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। বাংলা, আসাম, উড়িষ্যা আর দক্ষিণ-ভারতের সর্বত্র, গুজরাটে, মহারাষ্ট্রে লোকে সাধারণত রান্নার কাজে সরষে, নারকেল অথবা তিল তেল ব্যবহার করে। সেলাই-না-করা ধুতি-চাদর, উড়ুনি এবং গোড়ালি-খোলা চটি এইসব অঞ্চলের লোকে পরে থাকে। কিন্তু বিহারের প্রান্ত থেকে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত ভূখণ্ডের লোকে ঘি, সেলাই-করা জামাকাপড়, গোড়ালি-বাঁধা চটি ব্যবহার ক'রে থাকে। এ থেকে শুধু জলবায়ু নয়, জনপার্থক্যের ইঙ্গিতও বোঝা যায়।

ভাত-রুটি

ধান ছাড়া অষ্ট্রিকভাষী লোকেরা কলা, বেগুন, লাউ, লেবু, পান, নারকেল,

জাম্বুরা (বাতাবি নেবু), কামরাঙ্গা, ডুমুর, হলুদ, সুপারি, ডালিম ইত্যাদিরও চাষ করত। এই নামগুলোও মূলত অষ্ট্রিক ভাষা থেকেই এসেছে। চাষবাস জানলেও গো-পালন তারা জানত বলে মনে হয় না। অষ্ট্রিকভাষী লোকদের মধ্যে এখনও গো-পালন কম প্রচলিত।

গ্রামকেন্দ্রিক

তুলোর কাপড়ের ব্যবহার অষ্ট্রিকভাষীদেরই দান। কর্পাস (কার্পাস) শব্দটি মূলত অষ্ট্রিক। পট (পট্ট, পাট), কর্পট (পট্টবস্ত্র) এ দুটি শব্দও মূলত অষ্ট্রিক ভাষা থেকেই এসেছে। মেড়া বা ভেড়ার সঙ্গে তাদের পরিচয় ছিল। 'কম্বল' কথাটা মূলত অষ্ট্রিক।

অষ্ট্রিকভাষী আদি-অস্ট্রেলীয়দের কতকগুলি অরণ্যচারী শাখা—যেমন নিষাদ, ভীল, কোল শ্রেণীর শবর, মুণ্ডা, গদব, হো, সাঁওতাল—এরা পশুশিকারজীবী ছিল। বাণ, ধনু বা ধনুক, পিনাক, দা ও করাত—এ সমস্তই মূলত অষ্ট্রিক শব্দ। গজ, মাতঙ্গ, গণ্ডার (হাতী অর্থে), কপোত (শুধু পায়রা নয়, যে কোন পাখী) ইত্যাদি শব্দ মূলত অষ্ট্রিক ভাষা থেকেই এসেছে।

গুঁড়িকাঠের তৈরি লম্বা ডোঙা (অষ্ট্রিক শব্দ), ডিঙি আর ভেলায় চড়ে প্রাচীন অষ্ট্রিকভাষী লোকেরা নদী ও সমুদ্র পথে যাতায়াত করত এবং এইভাবেই তারা একটা বিরাট সামুদ্রিক বাণিজ্যও গড়ে তুলেছিল।

অষ্ট্রিকভাষী আদি-অস্ট্রেলীয়রা যে বাস্তব সভ্যতা গ'ড়ে তুলেছিল, তা একান্তভাবেই গ্রামকেন্দ্রিক। চাষবাস জানত ব'লে তাদের খাদ্যের অভাব ছিল না, লোকবলও কম ছিল না। মুণ্ডাদের মধ্যে কয়েকটি গ্রাম জুড়ে গ্রামসঙ্ঘের মত সমাজ-বন্ধন এখনও দেখা যায়। ভারতে পঞ্চায়েত প্রথার প্রচলন সম্ভবত তারাই প্রথম করে।

দীর্ঘমুণ্ড দ্রবিড়ভাষাভাষী লোকেরাই ভারতবর্ষে নগর-সভ্যতার গোড়া-পত্তন করেছে। আর্যভাষার উর, পুর, কুট প্রভৃতি নগরসূচক শব্দগুলি প্রায় সবই দ্রবিড়ভাষা থেকে এসেছে। এই দীর্ঘমুণ্ড নরগোষ্ঠীর লোকেরা তামা, লোহা, ব্রোঞ্জ, সোনা, কাঠ ইত্যাদির ব্যবহার জানত এবং তারা খুব ভাল কারিগর ছিল। দ্রবিড় ভাষায় 'কর্মার' শব্দ থেকে বাংলার 'কামার' শব্দ এসেছে। মাটির পাত্র যে তৈরি করত, তার নাম 'কুলাল।' চারুশিল্পের সঙ্গে তাদের পরিচয়ের প্রমাণ—'রূপ' ও 'কলা' দুটিই দ্রবিড় শব্দ। বানর, গণ্ডার, ময়ূরের সঙ্গে পরিচয়ের প্রমাণ

নগর সভ্যতা

'কপি', 'মর্কট', 'খড়্গা' (জন্তু অর্থে) ও 'ময়ূর' প্রভৃতি দ্রবিড় শব্দ থেকে গৃহীত ! গরুর গাড়িও এই সভ্যতার দান ব'লেই মনে হয়। রামায়ণে স্বর্ণলঙ্কার বিবরণ, মহাভারতে ময়দানবের গল্প, মহেন-জো-দড়োর নগর-বিন্যাসের উন্নত ও সমৃদ্ধ রূপ, ভারতের বিভিন্ন প্রাগৈতিহাসিক ধ্বংসাবশেষ এই দ্রবিড়-ভাষাভাষী নরগোষ্ঠীর নগরনির্ভর সভ্যতার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

কারু ও চারুশিল্প

বাংলাদেশে সরাসরি দ্রবিড়ভাষীদের মারফৎ তাদের ভাষা ও সভ্যতার প্রভাব যতটা না এসেছে, তার চেয়েও বেশি এসেছে আর্যভাষীদের মারফৎ। আর্যভাষীরা দ্রবিড়ভাষীদের ভাষা ও বাস্তব সভ্যতা যতটা আত্মসাৎ ক'রে নিয়েছিল, আর্যীকরণের সঙ্গে সঙ্গে তার অনেকখানি তারা বাংলায় সঞ্চারিত করেছিল। আজ আমরা তাকে আর্যভাষীদের দান ব'লেই ভুল ক'রে থাকি। তবু মনে হয়, বাঙালীদের টাট্‌কা ও শুঁট্‌কি মাছে অনুরাগ, মৃৎশিল্প ও অন্যান্য কারুশিল্পে দক্ষতা, চারুশিল্পের অনেক জ্যামিতিক নক্সা ও পরিকল্পনা, নগর সভ্যতার যতটুকু সে পেয়েছে তার অভ্যাস ও বিকাশ, বিলাস-সামগ্রীর অনেক কিছু, জলসেচনে উন্নততর চাষের অভ্যাস প্রভৃতি সব কিছুই দ্রবিড়-ভাষাভাষী নরগোষ্ঠীপ্রবাহেরই ফল।

নতুন সভ্যতা

অ্যাল্‌পো-দীনারীয় অবৈদিক আর্যভাষীদের বাস্তব সভ্যতার রূপ কী ছিল, আজ আর তা অনুমান করবার উপায় নেই। বৈদিক আর্যভাষীদের বাস্তব সভ্যতা ছিল নিতান্ত প্রাথমিক স্তরের। খড়, বাঁশ, লতাপাতার কুঁড়ে ঘরে কিংবা পশুর চামড়ায় তৈরি তাঁবুতে তারা বাস করত, গো-পালন জানত, পশুমাংস পুড়িয়ে খেত এবং দল বেঁধে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঘুরে বেড়াত। যাযাবর স্বভাব ত্যাগ ক'রে এদেশে এসে স্থিতি লাভ করবার পর পূর্ববর্তী অস্ট্রিক ও দ্রবিড়-ভাষাভাষীদের সংস্পর্শে এসে তারা প্রথমে কৃষি বা গ্রাম্য সভ্যতা ও পরে নগর-সভ্যতার সঙ্গে পরিচিত হল। ক্রমে এই দুই সভ্যতাকেই নিজের ক'রে নিয়ে তারা এক নতুন সভ্যতা গ'ড়ে তুলল। আর্যভাষা হল তার বাহন।

মানস-সংস্কৃতি

অষ্ট্রিক-ভাষাভাষী আদি-অস্ট্রেলীয়রা খুব সরল ও নিরীহ প্রকৃতির লোক ছিল। এদের মধ্যে দৃঢ়তা ও সংহতির কিছুটা অভাব ছিল; সহজেই তারা পরের কাছে বশ্যতা স্বীকার করত এবং আত্মসমর্পণ ক'রে নিজেদের টিঁকিয়ে রাখত। বর্তমান শবর বা সাঁওতাল, ভূমিজ বা মুণ্ডা প্রভৃতির প্রকৃতি কিছুটা কল্পনাপ্রবণ, দায়িত্ববিহীন, অলস ও ভাবুক।

অষ্ট্রিকভাষী আদি-অস্ট্রেলীয়রা মানুষের একাধিক জীবনে বিশ্বাস করত। কেউ মারা গেলে তার আত্মা কোন পাহাড় বা গাছ অথবা জন্তু বা পাখী বা অন্য কোন জীবকে আশ্রয় ক'রে বেঁচে থাকে—এই ছিল তাদের ধারণা। পরে এই ধারণাই হিন্দু পুনর্জন্মবাদ ও পরলোকবাদে রূপান্তরিত হয়। কাপড় অথবা গাছের ছালে জড়িয়ে এরা মৃতদেহ গাছে ঝুলিয়ে দিত অথবা মাটির নিচে কবর দিয়ে তার ওপর বড় বড় পাথর সোজা ক'রে পুঁতে দিত। অথবা স্ত্রীলোক হলে কবরের ওপর লম্বালম্বি ক'রে পাথর শুইয়ে দিত (গন্দ, কোরক, খাসিয়া প্রভৃতিরা এখনও যেমন করে), মৃতব্যক্তির উদ্দেশে মাঝে মাঝে খাবার জিনিস রেখে দিত। এইসব বিশ্বাস ও প্রথাই হিন্দুসমাজে গৃহীত হয়ে শ্রাদ্ধাদি কাজে মৃতের উদ্দেশে পিণ্ডদান প্রভৃতি ব্যাপারে রূপান্তরিত হয়েছে। লিঙ্গ-পূজাও এদের মধ্যে প্রচলিত ছিল ব'লে মনে হয়। 'লিঙ্গ' শব্দটি তো অষ্ট্রিক ভাষারই দান।

পুনর্জন্মবাদ

অষ্ট্রিকভাষী আদি-অস্ট্রেলীয়রা বিশেষ বিশেষ গাছ, পাথর, ফলমূল, ফুল, কোন বিশেষ জায়গা, বিশেষ বিশেষ পত্র, পক্ষী ইত্যাদির ওপর দেবত্ব আরোপ ক'রে তার পুজো করত। বাংলাদেশের পাড়াগাঁয়ে, গাছ-পুজো তো এখনও চলে—বিশেষ ক'রে সেওড়া গাছ ও বটগাছ। পাথর ও পাহাড় পুজোও একেবারে অজ্ঞাত নয়। আদিম-অষ্ট্রিকভাষী লোকদের ধর্মবিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠানের অনেক কিছুই আজও আমাদের মধ্যে নানাভাবে টিঁকে আছে। যেমন, বিশেষ বিশেষ ফল-ফুল-মূল সম্বন্ধে বিধিনিষেধ; বিশেষ বিশেষ ফলমূল পূজার্চনায় উৎসর্গ করা হয়; নবান্ন উৎসব, নানা রকমের মেয়েদের ব্রত ইত্যাদি। আমাদের দেশে ধর্ম, সমাজ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আজও ধান, ধানের গুচ্ছ, দূর্বা,

পুজো-আর্চা

কলা, হলুদ, সুপারি, পান, সিঁদুর, কলাগাছ প্রভৃতি বড় একটা জায়গা জুড়ে আছে। আসলে এসবই সেই প্রাচীন কৃষি-সভ্যতা ও কৃষি-সংস্কৃতির স্মৃতি বহন করছে। বাংলাদেশে হোলি বা হোলাক উৎসব এবং নিম্নশ্রেণীর মধ্যে চড়ক-ধর্মপূজা বিশ্লেষণ করলে এমন অনেক উপাদান ধরা পড়ে, যা মূলত আর্যপূর্ব আদিম নরগোষ্ঠীগুলির মধ্যে এখনও প্রচলিত।

দ্রবিড়ভাষী লোকেদের প্রকৃতি ছিল খুব কর্মঠ ও উদ্যমশীল, সংঘশক্তিতে দৃঢ়, শিল্প-সুনিপুণ এবং কতকটা অধ্যাত্মরহস্যসম্পন্ন। এদের মধ্যে যেমন ভাবুকতা ছিল, তেমনি ছিল তীক্ষ্ণ বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি।

অধ্যাত্মরহস্য

এদের মধ্যে সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণীবিভাগ বৃদ্ধি পেয়েছিল। এদের ছুঁৎমার্গ ও শ্রেণীপার্থক্য পরে আর্যভাষী সমাজে খানিকটা সঞ্চারিত হয়েছিল। যোগধর্ম ও সাধন-পদ্ধতি এদের কারো কারো মধ্যে প্রচলিত ছিল।

আর্য এবং পরবর্তী পৌরাণিক হিন্দুধর্মে মূর্তিপূজা, মন্দির, পশুবলি, অনেক দেবদেবী, যেমন শিব, উমা, শিবলিঙ্গ, বিষ্ণু ও শ্রী প্রভৃতি যে জায়গা জুড়ে আছে, তার মূলে দ্রবিড়ভাষী লোকেদের প্রভাব। যাগযজ্ঞও দ্রবিড়ভাষী ভূমধ্য নরগোষ্ঠীর মধ্যেই বেশি প্রচলিত ছিল। যজ্ঞের দুটি প্রধান উপাদান 'অরণি' ও 'ব্রীহি'—এ দুটি শব্দেরই সম্পর্ক মূলত দ্রবিড়ভাষার সঙ্গে। শ্মশান-প্রান্তর-পর্বতের রক্ত-দেবতা একান্তই দ্রবিড়ভাষীদের শিবন্, যার অর্থ লাল বা রক্ত, এবং শেম্বু, যার অর্থ তাম্র; এই শিবন্ বা শিব এবং শেম্বু বা শম্ভুই পরে আর্য দেবতা রুদ্রের সঙ্গে এক হয়ে গিয়ে রুদ্রশিব এবং মহাদেবে রূপান্তর লাভ করে।

কবর

মহেন্-জো-দড়োর ধ্বংসাবশেষ দেখে মনে হয় সেখানকার লোকেরা মৃতদেহ কবর দিত, কেউ কেউ আবার খানিকটা পুড়িয়ে শুধু হাড়গুলো কবর দিত। স্ত্রীলোক ও পুরুষদের ভিন্ন ভিন্ন ভঙ্গিতে কবর দেওয়া হত।

আর্যভাষী অ্যাল্পো-দীনারীয়দের মানস-সংস্কৃতি সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই বলবার উপায় নেই। আর্যভাষী নর্ডিকেরা তাদের সুনজরে দেখত না এবং "ব্রাত্য" বা পতিত ব'লে ঘৃণা করত। এই "ব্রাত্য"রাও আবার বৈদিক আর্যভাষীদের যাগযজ্ঞ, আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতিকে ভাল চোখে দেখত না। এরা মৃতদেহ পুড়িয়ে তার ছাইটুকু কবরস্থ করত।

বাংলাদেশের মানস-সংস্কৃতিতে মোঙ্গোলীয় ভোটব্রহ্ম বা চৈনিক বা অন্য কোনও নরগোষ্ঠীর ছোঁয়াচ বিশেষ কিছু লাগেনি। লাগলেও তা এত ক্ষীণ যে আজ আর তা ধরবার উপায় নেই।

আর্যভাষীরা ছিল প্রচণ্ড শক্তিশালী, একান্তভাবে কর্মী, কল্পনাশীল, শৃঙ্খলাসম্পন্ন, দৃঢ়ভাবে সংঘবদ্ধ, গুণগ্রাহী কিন্তু আত্মসমাহিত, বাস্তব সভ্যতায় কিছুটা পশ্চাৎপদ অথচ উপযুক্ত নতুন জিনিস গ্রহণ করতে তাদের উৎসাহ ছিল। তারা এসে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারতকে ধর্মরাজ্যপাশে, এক ভাষা ও এক সংস্কৃতির গ্রন্থিতে বেঁধে দিল। ভারতবর্ষে তারা বৈদিক ধর্ম, দেবতাবাদ এবং বেদের কিছু কিছু মন্ত্র ও সূক্ত নিয়ে এল। তারা নিজেদের যে সংস্কৃতি আনল, তাতে বাবিল ও আসুরীয় এবং ভূমধ্য নরগোষ্ঠীর প্রভাব যথেষ্ট ছিল।

সমন্বয়

শতাব্দীর বিরোধ আর মিলনের ভেতর দিয়ে আর্যভাষী নর্ডিকেরা এক সমন্বিত জন, ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়ে তুলল। এই সমন্বিত জনের নাম ভারতীয় জন। বেদ-ব্রাহ্মণের ধর্মের সঙ্গে পূর্বতন বিচিত্র বিভিন্ন ধর্মের আদর্শ, আচার, অনুষ্ঠান সব মিলেমিশে এক নতুন ধর্ম গ'ড়ে উঠল—পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম। বিচিত্র পূর্বতন সভ্যতার উপাদান-উপকরণ অঙ্গীভূত ক'রে নতুন সমন্বিত সভ্যতা গ'ড়ে উঠল—ভারতীয় সভ্যতা। পূর্বতন জন সংস্কৃতির সৃষ্টি-পুরাণ, দেবতাবাদ, ভয়-বিশ্বাস, ভাব-কল্পনা, স্বভাব-প্রকৃতি, ইতিকথা, ধ্যানধারণার সঙ্গে বেদ-ব্রাহ্মণের সংস্কৃতি মিলে মিশে গ'ড়ে উঠল ভারতীয় সংস্কৃতি। এই সমন্বিত জন, ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতির জন্মনীড় হল উত্তর ভারতের গাঙ্গেয় প্রদেশ। আর্যভাষা আশ্রয় ক'রে গাঙ্গেয় প্রদেশের ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতির ঢেউ বাংলাদেশে প্রথম বইতে শুরু করল খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ-সপ্তম শতক থেকে। আদিম বাঙালীর আদি-অস্ট্রেলীয় ও দ্রবিড় মন ও প্রকৃতি ক্রমে এক নতুন রূপ পেল। কিন্তু এই বদল আনতে হাজার বছরেরও বেশি সময় লেগেছিল।

আসমুদ্রহিমাচল

আসমুদ্রহিমাচল আমাদের এই দেশের নাম বঙ্গদেশ বা বাংলাদেশ। বাংলা বা বাঙ্গালা নামটা এল কোথা থেকে? আবুল ফজল তাঁর আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। বঙ্গ শব্দের সঙ্গে আল্ যুক্ত হয়ে বাঙ্গাল বা বাঙ্গালা হয়েছে। আল্ বলতে শুধু ক্ষেতের আল নয়, ছোটবড় বাঁধও বোঝায়। বাংলাদেশ জল-বৃষ্টির দেশ; ছোটবড় বাঁধ না দিলে বৃষ্টি, বন্যা আর জোয়ারের হাত থেকে ভিটে-মাটি-ক্ষেত-খামার রক্ষা করা যায় না। যে অঞ্চলে জল কম হয়, সে অঞ্চলের বর্ষার জল ধরবার জন্যে বাঁধের দরকার। তাই আল্ বেশি ব'লেই এদেশের নাম হয়েছে বাঙ্গালা বা বাংলাদেশ।

বাংলাদেশ

বাংলা বলতেই আমাদের চোখের সামনে বিরাট এক দেশের ছবি ভেসে ওঠে, যার শিয়রে উত্তুঙ্গ পাহাড়, দু'পাশে কঠিন শিলাকীর্ণ ভূমি, পায়ের নিচে বিস্তীর্ণ সমুদ্র। প্রাচীন কালে কিন্তু বঙ্গ বা বঙ্গাল বলতে যে জায়গা বোঝাত তা আজকের বাংলার একটা অংশমাত্র। সে সময় বাংলাদেশ নানা জনপদে বিভক্ত ছিল। একেকটি কোমের মানুষ নিয়ে গ'ড়ে উঠেছিল একেকটি জনপদ। প্রায় ক্ষেত্রেই কোমের নামে জনপদের নাম হয়েছে—বঙ্গ, গৌড়, পুণ্ড্র, রাঢ় নামের কোমেরা যে অঞ্চলে বাস করত পরে সেই অঞ্চলের নাম হয়েছে যথাক্রমে বঙ্গ, গৌড়, পুণ্ড্র, রাঢ়। এদের ছিল আলাদা আলাদা রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের দাপট যেমন-যেমন বেড়েছে এবং কমেছে সঙ্গে সঙ্গে জনপদের সীমানাও তেমনি বেড়েছে এবং কমেছে। এই সব জনপদ ঠিক কোথায় কতখানি জায়গা জুড়ে ছিল, তা বলা যায় না। তবে বিভিন্ন প্রাচীন পুঁথিতে যে সব উল্লেখ পাওয়া যায়, তা থেকে তাদের বিস্তার সম্বন্ধে মোটামুটি কিছু আঁচ পাওয়া যায়।

জনপদ

বঙ্গ খুব প্রাচীন দেশ। খুব পুরনো দুটি পুঁথিতে বঙ্গকে মগধ ও কলিঙ্গ জনপদের প্রতিবেশী বলা হয়েছে। মহাভারতের উল্লেখ থেকে বোঝা যায়

বঙ্গ, পুণ্ড্র, তাম্রলিপ্ত ও সুহ্মের সংলগ্ন দেশ। পরবর্তী অনেক সাক্ষ্য-প্রমাণ থেকে মনে হয় গঙ্গা-ভাগীরথীই ছিল বঙ্গের পশ্চিম সীমা। **বঙ্গ** বৃহৎসংহিতায় উপবঙ্গ নামে একটি জনপদের কথা পাওয়া যায়। ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে উপবঙ্গ বলতে যশোর ও তার আশপাশের জঙ্গলময় কয়েকটি অঞ্চলকে বোঝানো হয়েছে। প্রবঙ্গ নামে যে জনপদের উল্লেখ পাওয়া যায়, তা বঙ্গেরই একটি অংশ—কিন্তু ঠিক কোথায়, তা সঠিক-ভাবে জানা যায় না। একাদশ শতকের শেষাশেষি বঙ্গের দুটি বিভাগ কল্পিত হয়েছিল। একটি বঙ্গের উত্তরাঞ্চল ও আরেকটি অনুত্তর বা বঙ্গের দক্ষিণাঞ্চল। উত্তরাঞ্চলের উত্তর সীমা ছিল পদ্মা এবং সমুদ্রতীরবর্তী খাল-নালা-সমাকীর্ণ দক্ষিণাঞ্চল ছিল অনুত্তর বঙ্গ। কেশবসেন ও বিশ্বরূপসেনের আমলে বঙ্গের দুটি বিভাগ ছিল; একটি বিক্রমপুর ভাগ ও অন্যটি নাব্যমণ্ডল। বর্তমান বিক্রমপুর পরগণা ও সেই সঙ্গে ইদিলপুর পরগণার কিছুটা অংশ নিয়ে ছিল বিক্রমপুর ভাগ; বাখরগঞ্জ জেলা এবং আরও পূর্বদিকে সমুদ্র পর্যন্ত গোটা অঞ্চল নিয়ে ছিল নাব্যমণ্ডল।

হরিকেল ছিল প্রাচ্য দেশের পূর্ব সীমায়। এই জনপদটি চন্দ্রদ্বীপ বা বাখরগঞ্জ অঞ্চলের সংলগ্ন ছিল। সপ্তম-অষ্টম শতক থেকে দশম-একাদশ **হরিকেল** শতক পর্যন্ত হরিকেল বঙ্গ সমতটের সংলগ্ন স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল, কিন্তু ত্রৈলোক্যচন্দ্রের চন্দ্রদ্বীপ অধিকারের পর থেকেই হরিকেলকে মোটামুটি বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত ব'লে ধরা হয়। হরিকেল শ্রীহট্ট পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

চন্দ্রদ্বীপ মধ্যযুগের একটি নামকরা জায়গা। আইন-ই-আকবরী গ্রন্থের **চন্দ্রদ্বীপ** বাকলা পরগণার বাকলা (বর্তমান বাখরগঞ্জ জেলায়) আর চন্দ্রদ্বীপ একই জায়গা ব'লে অনেক দিন আগেই সাব্যস্ত হয়েছে।

চতুর্থ ও ষষ্ঠ শতকের পুঁথিতে সমতট নামে একটি জনপদের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। সমতট ছিল কামরূপের দক্ষিণে। সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত বর্তমান ত্রিপুরা সমতটেরই অংশ ছিল। এক **সমতট** সময় সমতটের পশ্চিম সীমা চব্বিশ পরগণার খাড়ি পরগণা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। গঙ্গা-ভাগীরথীর পূর্বতীর থেকে আরম্ভ ক'রে একেবারে মেঘনা-মোহানা পর্যন্ত সমুদ্রশায়ী ভূখণ্ডকেই সম্ভবত বলা হত সমতট।

একাদশ শতকে বঙ্গাল নামে একটি পৃথক জনপদ ছিল। দক্ষিণ-রাঢ়ের পরই ছিল এই বঙ্গাল দেশ এবং দুই দেশের মাঝখানে সীমানা

বঙ্গাল

ছিল গঙ্গা-ভাগীরথী। সেই সময় বঙ্গাল দেশ বলতে প্রায় সমস্ত পূর্ব-বঙ্গ এবং দক্ষিণ-বঙ্গের সমুদ্রতটশায়ী সমস্ত ভূখণ্ডকেই বোঝাত।

পুণ্ড্র জনপদ ছিল মুদ্গগিরি বা মুঙ্গেরের পূর্বদিকে এবং কোশী নদীর তীরে। এই জনপদ ছিল অঙ্গ, বঙ্গ এবং সুহ্ম কোমদের জনপদের ঠিক গায়ে। খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় দশকের কাছাকাছি যে পুন্দনগলের উল্লেখ পাওয়া

পুণ্ড্র

যায়, তা ছিল সে সময়কার পুণ্ড্রের রাজধানী বর্তমান বগুড়া জেলার মহাস্থান, যার পাশ দিয়ে এখনও করতোয়ার ক্ষীণ ধারা বয়ে চলেছে। সমৃদ্ধি বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে পুণ্ড্র পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকে পুণ্ড্রবর্ধনে রূপান্তরিত হয়েছে এবং গুপ্ত রাষ্ট্রের একটি প্রধান ভুক্তিতে পরিণত হয়েছে। সে সময়কার পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি অন্তত বগুড়া, দিনাজপুর এবং রাজসাহী জেলা জুড়ে বিস্তৃত ছিল। একেবারে রাজমহল-গঙ্গা-ভাগীরথী থেকে আরম্ভ ক'রে করতোয়া পর্যন্ত মোটামুটি গোটা উত্তর বঙ্গই বোধহয় সে সময় পুণ্ড্রবর্ধনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কজঙ্গল ও করতোয়ার মধ্যবর্তী ভূভাগই পুণ্ড্রবর্ধন। পরে এই রাষ্ট্রসীমা ক্রমে আরও বেড়েছে। সেন আমলে পুণ্ড্রবর্ধনের দক্ষিণতম সীমা এক দিকে খাড়িবিষয় (বর্তমান ২৪ পরগণার খাড়ি পরগণা) এবং অন্যদিকে ঢাকা-বাখরগঞ্জের সমুদ্রতীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

পুণ্ড্রবর্ধনের কেন্দ্রস্থল বরেন্দ্র বা বরেন্দ্রী ছিল বর্তমান বগুড়া দিনাজপুর ও রাজসাহী জেলা এবং সম্ভবত পাবনা জেলার বুক জুড়ে।

বরেন্দ্রী

মধ্যযুগের মুসলমান ঐতিহাসিকেরা বরেন্দ্রীকে বলতেন বরিন্দ্—অবশ্য বরিন্দ্ বলতে প্রাচীন বরেন্দ্রীর মত অত বড় এলাকা বোঝাত না।

রাঢ়া জনপদের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় আচারাঙ্গ সূত্র নামে এক প্রাচীন জৈন পুঁথিতে। এই জনপদের উত্তরতম সীমায় গঙ্গা-ভাগীরথী। খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে মহাবীর তাঁর কয়েকজন শিষ্যের সঙ্গে ধর্ম প্রচারের

রাঢ়া

জন্যে রাঢ়া জনপদে এসেছিলেন। এই জনপদে তখন রাস্তাঘাট ছিল না, আচারেরও বালাই ছিল না; এখানকার লোকজন ছিল কিছুটা নিষ্ঠুর ও রূঢ় প্রকৃতির। তারা এইসব জৈন সন্ন্যাসীদের পেছনে কুকুর লেলিয়ে দিয়েছিল। রাঢ়া জনপদের দুটি বিভাগ বজ্রভূমি ও সুহ্মভূমি। কোটীবর্ষ ছিল রাঢ়ের রাজধানী।

গঙ্গা-ভাগীরথীর পশ্চিম তীরবর্তী দক্ষিণতম ভূখণ্ড, অর্থাৎ বর্তমান বর্ধমানের দক্ষিণাংশ, হুগলীর বহুলাংশ এবং হাওড়া জেলাই প্রাচীন সুহ্ম জনপদ। পরে এই অঞ্চল দক্ষিণ রাঢ় ব'লে পরিচিত হয়েছিল।

সুহ্ম

রাঢ়ের উত্তরাংশ বজ্রভূমি। পরে এই অঞ্চলকে বলা হয়েছে উত্তর-রাঢ়। বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার পশ্চিমাংশ, অর্থাৎ কান্দি মহকুমা, সমগ্র বীরভূম জেলা (সাঁওতালভূমি সহ) এবং বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমা—এই নিয়ে উত্তর-রাঢ়। মোটামুটি অজয় নদী উত্তর-রাঢ়ের দক্ষিণ সীমা এবং দক্ষিণ-রাঢ়ের উত্তর সীমা। উত্তর-রাঢ়ের উত্তর সীমা বোধহয় কোন সময় গঙ্গা পার হয়ে আরও উত্তরে বিস্তৃত ছিল।

বজ্রভূমি

রাঢ়দেশের দুটি রাষ্ট্র-বিভাগ ছিল: বর্ধমানভুক্তি ও কঙ্কগ্রামভুক্তি। বর্ধমান-ভুক্তির তিনটি বিভাগ ছিল: উত্তর-রাঢ়, দক্ষিণ-রাঢ়, পশ্চিম-খাটিকা। পাল ও সেন আমলে দণ্ডভুক্তিমণ্ডল, অর্থাৎ দাঁতন পর্যন্ত বর্ধমান-ভুক্তির সীমা বিস্তৃত ছিল। পশ্চিম-খাটিকা গঙ্গার পশ্চিম তীরের মোটামুটি বর্তমান হাওড়া জেলা। বর্তমান মুর্শিদাবাদ এবং বীরভূম জেলার অধিকাংশ এবং সাঁওতাল পরগণারও কিছুটা কঙ্কগ্রামভুক্তির অন্তর্গত ছিল। কঙ্কগ্রাম কারও মতে রাজমহলের কাছাকাছি কাঁকজোল, কারও মতে মুর্শিদাবাদ জেলার ভরতপুর থানার কাগ্রাম।

বর্ধমান-কঙ্কগ্রাম

মহাভারতে ভীমের দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে তাম্রলিপ্তির প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। জাতকের গল্পে, বৌদ্ধ পুঁথিতে সুবৃহৎ নৌ-বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসেবে বারবার তাম্রলিপ্তির উল্লেখ আছে। পেরিপ্লাস গ্রন্থে, টলেমি, ফাহিয়ান, যুয়ান-চোয়াং ও ইৎসিঙের বিবরণে তাম্রলিপ্তি বন্দরের বর্ণনা আছে। অষ্টম শতকের পর থেকেই তাম্রলিপ্তি বন্দরের সমৃদ্ধির পতন ঘটে। সপ্তম শতক থেকেই দণ্ডভুক্তি জনপদের নামেই তাম্রলিপ্তি জনপদের পরিচয়।

তাম্রলিপ্তি

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে গৌড়দেশে উৎপন্ন অনেক শিল্প ও কৃষিজাত জিনিসের খবরাখবর পাওয়া যায়। বাৎস্যায়নের লেখায় তৃতীয়-চতুর্থ শতকে গৌড়ের নাগরিকদের বিলাসব্যসনের পরিচয় পাওয়া যায়। মুর্শিদাবাদ বীরভূমই

গৌড়ের আদি কেন্দ্র; পরে মালদহ এবং সম্ভবত বর্ধমানও এই জনপদের সঙ্গে যুক্ত হয়। বর্তমানের এই ক'টি জেলা নিয়েই প্রাচীন গৌড়। গৌড়ের রাষ্ট্রীয় আধিপত্য কখনও কলিঙ্গ, কখনও ভুবনেশ্বর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। সপ্তম শতকে শশাঙ্ক যখন আসমুদ্রবিস্তৃত গৌড় রাষ্ট্রের রাজা, তখন তাঁর রাজধানী ছিল কর্ণস্থবর্ণ; কর্ণস্থবর্ণ বর্তমান কানসোনা, মুর্শিদাবাদ জেলার রাঙামাটি অঞ্চল। আমরা মোটামুটি পশ্চিম-বঙ্গ বলতে যা বুঝি, অর্থাৎ মালদহ-মুর্শিদাবাদ-বীরভূম-বর্ধমানের কিছু অংশ—তাই ছিল প্রাচীন গৌড় জনপদ। গৌড়ের রাষ্ট্রসীমানা কখনও কখনও উৎকল-দণ্ডভুক্তি পর্যন্ত বিস্তৃত হলেও দক্ষিণ-রাঢ়মণ্ডল বা তাম্রলিপ্তি-দণ্ডভুক্তি বোধহয় গৌড় জনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না; গৌড় বলতে কখন কখন সমগ্র বাংলাদেশকেও বোঝাত।

গৌড়

প্রাচীনতম ঐতিহাসিক কাল থেকে আরম্ভ ক'রে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ-সপ্তম শতক পর্যন্ত প্রাচীন বাংলাদেশ এইভাবে বিভিন্ন স্বতন্ত্র জনপদে বিভক্ত ছিল। সপ্তম শতকের গোড়ায় শশাঙ্ক যখন গৌড়ের রাজা হলেন, তখন বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ (মুর্শিদাবাদ থেকে শুরু করে উৎকল পর্যন্ত) সর্বপ্রথম এক রাষ্ট্রীয় ঐক্য লাভ করে। শশাঙ্কের পর থেকে বাংলা-দেশের তিনটি জনপদই যেন গোটা বাংলাদেশের জায়গা জুড়ে বসল—পুণ্ড্র বা পুণ্ড্রবর্ধন, গৌড় ও বঙ্গ। বিভিন্ন নামের অন্যান্য জনপদ, বিভাগ, উপবিভাগ থাকলেও এই তিনটি জনপদের কাছে তারা ম্লান ব'লে বোধ হয়। এই তিনটি জনপদের মধ্যে অন্যান্যদের সত্তা বিলীন হয়ে যাচ্ছিল। শশাঙ্ক এবং পাল রাজারা সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের মালিক হয়েও রাঢ়াধিপতি বা রাঢ়েশ্বর না বলে নিজেদের পরিচয় দিলেন গৌড়াধিপতি বা গৌড়েশ্বর ব'লে। শশাঙ্কের আমল থেকেই একটিমাত্র নাম নিয়ে প্রাচীন বাংলার বিভিন্ন জনপদকে একসূত্রে গাঁথবার যে সজ্ঞান সূচনা দেখা গিয়েছিল, পাল ও সেন রাজাদের আমলে তা পূর্ণ পরিণতি লাভ করল। অবশ্য বঙ্গ তখনও স্বতন্ত্র জনপদ হিসেবে নিজের প্রতিষ্ঠা বজায় রেখেছে। এক গৌড় নাম, লক্ষ্য ও আদর্শ হওয়া সত্ত্বেও বঙ্গ নাম তখনও তার প্রতিদ্বন্দ্বী। পুণ্ড্র-পুণ্ড্রবর্ধন রাষ্ট্র হিসেবে টিঁকে থাকলেও তার আর তখন স্বতন্ত্র জনপদসত্তা নেই। পরবর্তী কালেও গৌড় নামে বাংলা-দেশের কিছু অংশের জনপদসত্তা বোঝাবার চেষ্টা হয়েছে। এমনও প্রমাণ আছে যে, বাংলার বাইরে বাঙালী মাত্রই গৌড়বাসী বা গৌড়ীয় ব'লে পরিচিত

বাংলা

হয়েছে। ঔরংজীবের আমলে সুবা বাংলার যে অংশ নবাব শায়েস্তা খাঁ'র শাসনাধীন ছিল, তাকে বলা হত গৌড়মণ্ডল।

গৌড় নামে বাংলার সমস্ত জনপদকে ঐক্যবদ্ধ করার যে চেষ্টা শশাঙ্ক, পাল ও সেন রাজারা করেছিলেন, তাতে কাজ হল না। যে বঙ্গ ছিল আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক থেকে ঘৃণিত ও অবজ্ঞাত, যা ছিল পাল ও সেনদের আমলে কম গৌরবের ও আদরের—সেই বঙ্গ নামেই শেষ পর্যন্ত তথাকথিত পাঠান আমলে বাংলার সমস্ত জনপদ ঐক্যবদ্ধ হল। আকবরের আমলে গোটা বাংলাদেশ সুবা বাংলা ব'লে পরিচিত হল। ইংরেজের আমলে বাংলা নাম পূর্ণতর পরিচয় ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে; অবশ্য আকবরের আমলে সুবা বাংলার চেয়ে আজকের বাংলা আয়তনে অনেক ছোট।

সীমানা

বাংলার বিভিন্ন জনপদরাষ্ট্র নিজেদের স্বাতন্ত্র্য ঘুচিয়ে এক অখণ্ড ভৌগোলিক রাষ্ট্রীয় ঐক্যসম্বন্ধে আবদ্ধ হল। বাংলা ভাষা প্রাচ্যদেশীয় প্রাকৃত ও মাগধী প্রাকৃত থেকে স্বতন্ত্র হয়ে, অপভ্রংশ পর্যায় থেকে মুক্তি পেয়ে তার যথার্থ আদিম রূপ প্রকাশ করল। এক জন ও এক ভাষার বৈশিষ্ট্য নিয়ে আজকের যে বাংলাদেশ, তার চারিদিকে রয়েছে সুস্পষ্ট প্রাকৃতিক সীমানা। রাষ্ট্রের সীমারেখা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকমের হলেও প্রাকৃতিক সীমানা ঠিকই থাকে। এক ভাষাভাষী বাঙালী জাতির অখণ্ড বাসভূমি বাংলাদেশে রাষ্ট্রবিধাতাদের হাতে খণ্ডবিখণ্ড হলেও তার প্রাকৃতিক সীমানা-রেখার বদল হয়নি।

বাংলার উত্তর সীমায় সিকিম এবং হিমালয়-কিরীট কাঞ্চনজঙ্ঘার তুষারময় শিখর; তার নিম্ন উপত্যকায় বাংলার উত্তর প্রান্তের দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলা। এই দুই জেলার পশ্চিমে নেপাল, পূর্বে ভূটান রাজ্যসীমা। দার্জিলিং-জলপাইগুড়ি-কোচবিহারে প্রধানত ভোট-ব্রহ্ম জনের বিভিন্ন শাখা-উপশাখা কোচ, রাজবংশী, ভোটিয়া প্রভৃতি পার্বত্য কোমের বাস। উত্তর-পূর্বের প্রাকৃতিক সীমা একেবারে ব্রহ্মপুত্র নদ পর্যন্ত বিস্তৃত। বর্তমান গোয়ালপাড়া জেলার অধিকাংশই পুণ্ড্রবর্ধনের

উত্তরে

সীমানাভুক্ত ছিল ; মধ্যযুগে উত্তর ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার পশ্চিমতম প্রান্ত বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভুত্বের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

বাংলার পূর্ব সীমার উত্তরে ব্রহ্মপুত্র নদ, মধ্যে গারো, খাসিয়া ও জৈন্তিয়া পাহাড়, দক্ষিণে লুসাই, চট্টগ্রাম ও আরাকান শৈলমালা। গোয়ালপাড়া জেলার মত শ্রীহট্ট এবং অংশত কাছাড়ের লোকও বাংলা-ভাষাভাষী ; সামাজিক স্মৃতিশাসন, আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি এবং সেই সঙ্গে জন ও জাতের দিক থেকেও বাঙালী ও বাংলার সঙ্গে তাদের পুরোপুরি মিল। এখনও শ্রীহট্ট-কাছাড়ের হিন্দু-মুসলমানের সমাজ ও সংস্কৃতি লৌকিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে বাংলার পূর্বতম জেলাগুলির সঙ্গে একসূত্রে গাঁথা। পূর্ব-দক্ষিণে ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম শৈলশ্রেণী বাংলাদেশকে লুসাই জেলা ও ব্রহ্মদেশ থেকে পৃথক করেছে।

পূর্বে

বাংলার পশ্চিম সীমানা প্রাচীন ও মধ্য যুগে দক্ষিণে গঙ্গার তীর বরাবর একেবারে বর্তমান দ্বারভাঙ্গা (দ্বারবঙ্গ) জেলার পশ্চিম সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কি ভূমি-প্রকৃতিতে, কি প্রাচীন ভাষায় উত্তর-বিহার ও মিথিলার সঙ্গে উত্তর-বঙ্গ বা গৌড়-পুণ্ড্র-বরেন্দ্রীর খুব সামান্যই তফাৎ ছিল। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে বিদ্যা ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসেবে মিথিলা ছিল বাংলার পণ্ডিতদের কাছে পরমতীর্থ। মৈথিল কবি বিদ্যাপতি বাঙালীর পরম প্রিয় কবি। উত্তর-বঙ্গ ও উত্তর-বিহারের মধ্যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবধান গ'ড়ে উঠেছে মাত্র মধ্যযুগে। রাজমহল এবং গঙ্গার দক্ষিণে বর্তমান সাঁওতাল পরগণা প্রাচীন উত্তর-রাঢ়ের উত্তর-পশ্চিমতম অংশ। ভাষায়, ভূ-প্রকৃতিতে, সমাজ ও কৌমবিন্যাসে সাঁওতাল পরগণার সঙ্গে যেমন উত্তর-বীরভূমের, তেমনি মানভূমের সঙ্গে বাঁকুড়ার ঘনিষ্ঠ মিল আছে। এই মানভূম প্রাচীন মল্লভূমির (মাল্লভূম) অন্তর্গত। বাঁকুড়া ও মানভূমের মধ্যে কোন প্রাকৃতিক সীমা নেই ; সেই সীমানা মানভূম পেরিয়ে একেবারে ছোট নাগপুরের শৈলশ্রেণী পর্যন্ত বিস্তৃত এবং এই শৈলশ্রেণীই এদিকে প্রাচীন বাংলার প্রান্তসীমা। দক্ষিণে মেদিনীপুরের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমায় বালেশ্বর উড়িষ্যার ও সিংভূম বিহারের অন্তর্গত। ভাষায়, ভূ-প্রকৃতিতে ও কৌমবিন্যাসে এই দুটি জেলারই কতকাংশের সঙ্গে মেদিনীপুর জেলার কাঁথি, সদর ও ঝাড়গ্রাম মহকুমার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রয়েছে। সপ্তম শতকে উৎকল দেশও দণ্ডভুক্তির (বর্তমান দাঁতন) অন্তর্গত ছিল। রাজমহল থেকে যে অনুচ্চ

পশ্চিমে

শৈলশ্রেণী এবং যে অরণ্যময় গৈরিক মালভূমি দক্ষিণে সোজা প্রসারিত হয়ে একেবারে ময়ূরভঞ্জ-কেওঞ্ঝর-বালেশ্বর স্পর্শ ক'রে সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে, তাই বাংলার স্বাভাবিক প্রাকৃতিক পশ্চিম-সীমা। বাংলার ভাষা, সমাজবিন্যাস, জন ও কৌমবিন্যাস এবং উত্তর-রাঢ় ও পশ্চিম-দক্ষিণ মেদিনীপুরের ভূ-প্রকৃতি এই সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত।

বাংলার দক্ষিণ সীমায় বঙ্গোপসাগর এবং তার কূল-বরাবর সমতট ভূমির ধানপান গাছগাছালি দিয়ে ঘেরা সবুজ আস্তরণ আর অসংখ্য ছোটবড় নদনদী, খাটিখাড়ি, খালনালা, বিলজলা আর হাওড়। এইসব নদনদীর পলিমাটিতে মেদিনীপুর, চব্বিশ পরগণা, খুলনা, বরিশাল, ফরিদপুর, ঢাকা, ত্রিপুরা, নোয়াখালি আর চট্টগ্রামের বেশির ভাগ নিম্নভূমি গড়ে উঠেছে।

দক্ষিণে

সংক্ষেপে বলতে গেলে, বাংলার প্রাকৃতিক সীমা : উত্তরে হিমালয় এবং তার গায়ে নেপাল, সিকিম ও ভোটান রাজ্য ; উত্তর-পূর্বদিকে ব্রহ্মপুত্র নদ ও উপত্যকা ; উত্তর-পশ্চিমদিকে দ্বারবঙ্গ পর্যন্ত ভাগীরথীর উত্তর-সমান্তরালবর্তী সমভূমি ; পূর্বদিকে গারো-খাসিয়া-জৈন্তিয়া-ত্রিপুরা-চট্টগ্রাম শৈলশ্রেণী বেয়ে দক্ষিণে সমুদ্র পর্যন্ত ; পশ্চিমে রাজমহল, সাঁওতাল পরগণা, ছোটনাগপুর, মানভূম, ধলভূম, কেওঞ্ঝর, ময়ূরভঞ্জের অরণ্যময় মালভূমি, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। এই সীমারেখার মধ্যেই প্রাচীন বাংলার গৌড়, পুণ্ড্র, বরেন্দ্রী, রাঢ়া, সুহ্ম, তাম্রলিপ্ত, সমতট, বঙ্গ, বঙ্গাল, হরিকেল প্রভৃতি জনপদ ; এরই মাঝখানে ভাগীরথী, করতোয়া, ব্রহ্মপুত্র, পদ্মা, মেঘনা এবং অসংখ্য নদনদীতে ঘেরা বাংলার গ্রাম, নগর, প্রান্তর, পাহাড় আর অরণ্য। এই ভূখণ্ডই ঐতিহাসিক কালের বাঙালীর কর্মকৃতির উৎস এবং ধর্ম-কর্ম-নর্মভূমি।

নদনদী

'বাংলা' এই নামের সঙ্গে বাংলার নদনদী জড়িয়ে আছে—'আল' শব্দের মধ্যে তার ইঙ্গিত স্পষ্ট। এইসব নদনদীই বাংলার প্রাণ। এইসব নদনদীই বাংলাকে গড়ে তুলেছে। যুগে যুগে বাংলার আকৃতি-প্রকৃতি নির্ণয় করেছে, আজও করছে।

উঁচু জায়গা থেকে নদীর স্রোতে যে অজস্র পলি অবিরাম ভেসে এসেছে তাই দিয়ে গড়ে উঠেছে বাংলার ব-দ্বীপের নিম্নভূমি। পশ্চিম, উত্তর এবং পূর্ব বাংলার কিছু কিছু অংশ বাদ দিলে ভূতত্ত্বের দিক থেকে বাংলার প্রায় সবটাই নতুন পলি-পড়া মাটি। এই নতুন জমির ওপর দিয়ে বাংলার বিভিন্ন নদনদী কতবার যে খাত বদলেছে তার ইয়ত্তা নেই। শুধু প্রকৃতির খামখেয়ালে নয়, লোভের ঠুলি-পরা মানুষের হাতে নদনদীর জলনিকাশের স্বাভাবিক পথ রুদ্ধ হওয়ায় বন্যায় মহামারীতে কতবার গাঁয়ের পর গাঁ উজাড় হয়ে গেছে। অথচ এই নদীই বাংলাদেশকে সুজলা সুফলা করেছে ; তার দুই তীরে মানুষের বসতি, কৃষির পত্তন, গ্রাম, নগর, বাজার, বন্দর, সম্পদ, সমৃদ্ধি, শিল্প, সাহিত্য, ধর্মকর্ম সব কিছুরই বিকাশ। বাঙালী তাই এইসব নদীকে যেমন ভয়ভক্তি করেছে, তেমনি আদর ক'রে তাদের নাম রেখেছে ইচ্ছামতী, ময়ূরাক্ষী, কপোতাক্ষ, চূর্নী, রূপনারায়ণ, মহানন্দা, মেঘনা, সুরমা, লৌহিত্য। প্রাচীন বাংলার নদনদী সম্পর্কে আজও খুব বেশি কিছু আমরা জানতে পারিনি ; তবু যেটুকু জানা গেছে, তা থেকে বলা যায় যে, নদী যে শুধু খাত বদলেছে, তাই নয়,—যেমন অনেক পুরনো নদী মরে গেছে, তেমনি অনেক নতুন নদীর জন্ম হয়েছে।

ভাঙা-গড়া

বাংলার এই নদীগুলিকে গোটা পূর্ব ভারতের বোঝা বইতে হয়। উত্তর-ভারতের দুটি প্রধান নদী গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের বিপুল জলধারা, পলিপ্রবাহ এবং পূর্ব-যুক্তপ্রদেশ, বিহার ও আসামের বৃষ্টির জল সমুদ্রে নিয়ে যাবার যে দায়িত্ব বাংলার নরম মাটিকে বহন করতে হয়, বাংলার মাটি সব জায়গায় তার উপযুক্ত নয়। নদীর দু'পাড় জুড়ে তাই যুগ যুগ ধ'রে অনবরত চলেছে ভাঙা আর গড়া। বাংলার নদনদীর খাত এমন কি গত একশো বছরেও যা বদলেছে তাতে অবাক হয়ে যেতে হয়।

তেলিগড় ও সিক্রিগলির সরু গিরিপথ পেরিয়ে রাজমহল স্পর্শ ক'রে গঙ্গা বাংলার সমতল ভূমিতে এসে প্রবেশ করেছে। এখন গঙ্গা বলতে আমরা যা বুঝি, প্রায় সাড়ে পাঁচ শো বছর আগে কৃত্তিবাসের আমলে গঙ্গার সেই দক্ষিণ-বাহিনী প্রবাহকে বলা হত ছোট গঙ্গা; আর পূর্ব-দক্ষিণ-বাহিনী প্রবাহকে বলা হত বড় গঙ্গা—যাকে আমরা পদ্মা বলি। পদ্মা অনেক বেশি প্রশস্ত ও দুর্দান্ত। তাহলেও ঐতিহ্যের মহিমায় এবং লোকের শ্রদ্ধাভক্তিতে ছোট গঙ্গা বরাবরই বড় গঙ্গার ওপরে স্থান

গঙ্গা

পেয়েছে। ছোট গঙ্গার বরাতেই শুধু জুটেছে ভাগীরথী-জাহ্নবী নাম। পঞ্চদশ শতকে ভাগীরথী আজকের মত এত সংকীর্ণতোয়া ছিল না; সাগরমুখ থেকে আরম্ভ ক'রে একেবারে চম্পা-ভাগলপুর পর্যন্ত তখনও বড় বড় বাণিজ্যতরী চলাচল করত।

গঙ্গা-ভাগীরথীর প্রবাহপথ বহুবার বদলেছে। যতদূর জানা যায়, খুব প্রাচীন যুগে পূর্ণিয়ার দক্ষিণে রাজমহল পার হয়ে রাজমহল-সাঁওতালভূমি ছোট নাগপুর-মানভূম-ধলভূমের কোল ঘেঁষে গঙ্গা সোজা দক্ষিণবাহিনী হয়ে সমুদ্রে পড়ত; এই প্রবাহেই ছিল অজয়, দামোদর এবং রূপনারায়ণের সঙ্গম। এই তিনটি নদী তখন তেমন বড় ছিল না। এই প্রবাহের দক্ষিণতম সীমায় তাম্রলিপ্তি বন্দর। তারপর অষ্টম শতকের আগেই গঙ্গা পূর্ববর্তী খাতের পূর্বদিকে স'রে এসে রাজমহল থেকে বর্তমান কালিন্দী ও মহানন্দার খাতে গৌড়কে ডানদিকে রেখে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম-বাহিনী হয়ে সমুদ্রে পড়েছে। তখনও দামোদর ও রূপনারায়ণ-পত্রঘাটার জল ভাগীরথীতে এসে পড়ছে এবং তাম্রলিপ্তি বন্দর তখনও বেশ জমজমাট। তৃতীয় পর্যায়েও গৌড় গঙ্গার পশ্চিম তীরে; কিন্তু তাম্রলিপ্তি বন্দর পরিত্যক্ত। দামোদর-রূপনারায়ণ-পত্রঘাটার এবং কিছুদিনের জন্যে সরস্বতীরও জল নিয়ে গঙ্গার যে পশ্চিমতর প্রবাহ আগে ছিল, তার বদলে তখন কলকাতা বেতড় পর্যন্ত ভাগীরথীর বর্তমান প্রবাহপথের এবং বেতড়ের দক্ষিণে আদিগঙ্গা পথের প্রবর্তন হয়েছিল। পরে আদিগঙ্গার মুখ বুঁজে যাওয়ায় অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি নবাব আলীবর্দীর আমলে বেতড়ের দক্ষিণে পুরনো সরস্বতীর খাতে ভাগীরথীকে প্রবাহিত করা হয়। এর প্রায় ত্রিশ বছর পর কর্নেল টালি সাহেব আদিগঙ্গার খানিকটা অংশ পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেছিলেন। সেই থেকে এই খাতের নাম টালির নালা এবং তার বাঁদিকের পল্লীর নাম টালিগঞ্জ।

পদ্মা

পদ্মার প্রাচীনতম ঐতিহাসিক উল্লেখ পাওয়া যায় দশম-একাদশ শতকে। তখনও পদ্মা বোধহয় এত বড় নদী হয়ে ওঠেনি, দেখতে খালের মতনই ছিল। পদ্মা অবশ্য দশম-একাদশ শতকের চেয়েও প্রাচীন। কারো মতে, দ্বিতীয় শতকের মাঝামাঝি অন্তত ঢাকা-ফরিদপুর অঞ্চল পর্যন্ত গঙ্গার পূর্ব-দক্ষিণবাহী প্রবাহপথ অর্থাৎ পদ্মার প্রবাহপথের অস্তিত্ব ছিল। চতুর্দশ শতকে এই প্রবাহপথ চট্টগ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং তার কাছেই সেই প্রবাহ ব্রহ্মপুত্র-প্রবাহের সঙ্গে মিলিত হত। তটভূমি বেড়ে

যাবার সঙ্গে সঙ্গে চট্টগ্রাম এখন অনেক পূর্ব-দক্ষিণে স'রে গেছে, ঢাকাও এখন গঙ্গা-পদ্মার ওপরে নয়; পদ্মা এখন অনেক দক্ষিণে নেমে গেছে; ঢাকা এখন পুরনো গঙ্গা-পদ্মার খাত বুড়িগঙ্গার তীরের ওপর। পদ্মা-ব্রহ্মপুত্রের (যমুনা) সঙ্গম এখন গোয়ালন্দের কাছে। এই মিলিত প্রবাহ চাঁদপুরের কাছে মেঘনার সঙ্গে মিলিত হয়ে সন্দ্বীপের কাছে সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে। ষোড়শ শতাব্দীর একেবারে শেষের দিকে প্রথম পদ্মা নাম পাওয়া যায়। তখন পদ্মাকে বলা হত পদ্মাবতী।

পদ্মার একটি প্রাচীনতর পথ রাজসাহীর রামপুর বোয়ালিয়া হ'য়ে চলন বিলের ভেতর দিয়ে ধলেশ্বরীর খাত দিয়ে ঢাকাকে পাশে রেখে মেঘনা খাড়িতে গিয়ে সমুদ্রে মিশত। তাই ঢাকার পাশের এই নদীটির নাম বুড়িগঙ্গা। বুড়িগঙ্গাই প্রাচীন গঙ্গা-পদ্মার খাত।

পদ্মা থেকে উৎসারিত আরও কয়েকটি নদীপথে ভাগীরথী-পদ্মার জল নিকাশ হয়। এর মধ্যে জলাঙ্গী ও চন্দনা পদ্মা থেকে ভাগীরথীতে গিয়ে পড়েছে, পদ্মার যে কয়েকটি প্রাচীন শাখা-নদী সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে তার মধ্যে প্রাচীনতম হচ্ছে কুমার; মধ্যযুগে ভৈরবও ছিল এদের অন্যতম। এ দুটি নদীই এখন মজে যেতে বসেছে। মধুমতী ও আড়িয়ল খাঁ-ই এখন পদ্মার প্রধান শাখানদী।

ব্রহ্মপুত্র

পদ্মার পূর্ব-দক্ষিণতম প্রবাহে উত্তর থেকে লৌহিত্য বা ব্রহ্মপুত্র এসে মিলিত হয়েছে। সপ্তদশ শতকের আগে ব্রহ্মপুত্র গারো পাহাড়ের পশ্চিম-দক্ষিণে মোড় ঘুরে ঐ পাহাড়ের পূর্ব-দক্ষিণ তলভূমি ঘেঁষে দেওয়ানগঞ্জের পাশ দিয়ে, শেরপুর জামালপুরের ভেতর দিয়ে, মধুপুর গড়ের পাশ দিয়ে মৈমনসিংহ জেলাকে দু'ভাগে ভাগ ক'রে বর্তমান ঢাকা জেলার পূর্বাঞ্চল ভেদ ক'রে সোনার গাঁ'র দক্ষিণ-পশ্চিমে লাঙ্গলবন্দের পাশ দিয়ে ধলেশ্বরীতে প্রবাহিত হত। এই প্রাচীন খাত এখন বর্ষাকাল ছাড়া অন্য সময়ে মৃত বললেই চলে। এর পর ব্রহ্মপুত্রের খাত বদলায়। ধলেশ্বরীতে প্রবাহিত না হয়ে ঢাকা জেলার সীমানায় পা দেবার ঠিক আগে মৈমনসিংহের ভেতর দিয়ে এসে পূর্ব-দক্ষিণতম কোণে ভৈরবাজারের বন্দরের কাছে সুরমা-মেঘনার সঙ্গে মিশে গিয়ে চাঁদপুরের দক্ষিণে সন্দ্বীপের উত্তরে গিয়ে ব্রহ্মপুত্র সমুদ্রে পড়েছে। উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি ব্রহ্মপুত্র এই খাতও বদলায়; এই সময় ব্রহ্মপুত্রের অন্যতম শাখা যমুনা প্রবলতর হয়ে ওঠে এবং এখন

যমুনাই ব্রহ্মপুত্রের বিপুল জলরাশি বয়ে এনে গোয়ালন্দের কাছে পদ্মার প্রবাহে ঢেলে দিচ্ছে।

ভৈরব বাজার থেকে সমুদ্র পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্রের যে ধারা, তার নাম মেঘনা। মেঘনার উদ্ভব খাসিয়া-জৈন্তিয়া শৈলমালা থেকে; উত্তর-প্রবাহে মেঘনার প্রাচীন নাম সুরমা। সুরমা শ্রীহট্ট জেলার ভেতর দিয়ে মৈমনসিংহ জেলার নেত্রকোণা ও কিশোরগঞ্জ মহকুমার পূর্বসীমা স্পর্শ ক'রে আজমিরিগঞ্জ বন্দর ও অদূরবর্তী বানিয়াচঙ্গ গ্রাম বাঁ তীরে রেখে ভৈরববাজারে এক সময় ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে এসে মিলত।

ঢাকা জেলার উত্তরে ব্রহ্মপুত্রের একটি শাখানদী, লক্ষ্যা বা শীতললক্ষ্যা। ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিমদিক দিয়ে ব্রহ্মপুত্রেরই সমান্তরালে প্রবাহিত হয়ে লক্ষ্যা বর্তমান ঢাকার দক্ষিণে নারায়ণগঞ্জের কাছে এসে ধলেশ্বরীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। আজ তার ধারা ক্ষীণ হলেও উনবিংশ শতকের গোড়াতেও লক্ষ্যা প্রশস্ত বেগবতী নদী ছিল।

উত্তরবঙ্গের সবচেয়ে প্রধান ও প্রাচীন নদী করতোয়া। পুণ্ড্রবর্ধনের রাজধানী প্রাচীন পুন্দনগল, বগুড়ার অদূরে বর্তমান মহাস্থানগড়, করতোয়ার তীরবর্তী ছিল। সপ্তম শতকে বরেন্দ্রীর পূর্বদিক ঘিরে, প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধনের পূর্ব-সীমা বরাবর করতোয়া প্রবাহিত হত। করতোয়া ভোটান-সীমান্তেরও উত্তরে হিমালয় থেকে উৎসারিত হয়ে দার্জিলিং-জলপাইগুড়ির ভেতর দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। এই উত্তরতম প্রবাহে এর নাম করতোয়া নয়, দিস্তাং বা তিস্তা; সংস্কৃতে যার নাম ত্রিস্রোতা। জলপাইগুড়ি থেকে তিস্তার তিনটি স্রোত তিনদিকে প্রবাহিত হয়েছে। দক্ষিণবাহী পূর্বতম স্রোতের নাম করতোয়া; দক্ষিণবাহী মধ্যবর্তী স্রোতের নাম আত্রাই; দক্ষিণবাহী পশ্চিমতম স্রোতের নাম পূর্ণভবা বা পুনর্ভবা। ষোড়শ শতকের শেষাশেষি পর্যন্ত করতোয়া ছিল প্রখর বেগবতী প্রশস্ত নদী। আজ করতোয়া মৃতপ্রায়; আত্রাই-পুনর্ভবারও একই দশা।

করতোয়া

উত্তর-বঙ্গের আরেকটি প্রসিদ্ধ ও সুপ্রাচীন নদী কৌশিকী বা কোশী। এই নদী উত্তর বিহারের পূর্ণিয়া জেলার ভেতর দিয়ে সোজা দক্ষিণবাহী হয়ে গঙ্গায় প্রবাহিত হয় অথচ কোশী আগে পূর্ববাহী ব্রহ্মপুত্রে গিয়ে মিশত। শত শত বছর ধ'রে সারা উত্তর-বঙ্গ জুড়ে খাত বদলাতে বদলাতে কোশী নদী পুব থেকে

একেবারে পশ্চিমে সরে গেছে। এর ফলে গৌড়-লক্ষণাবতী-পাণ্ডুয়া অঞ্চল নিম্ন জলাভূমিতে পরিণত হয়ে অস্বাস্থ্যকর এবং বাসের অযোগ্য হয়ে পড়ে এবং বন্যাবিধ্বস্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত পরিত্যক্ত হয়। আজও সমস্ত উত্তরবঙ্গ জুড়ে যে অসংখ্য মরা নদীর খাত ও নিম্ন জলাভূমি দেখা যায়, লোকে তাকে বলে বুড়ী কোশী বা মরা কোশী।

কোশী

প্রাচীন বাংলায় গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, এক নগর থেকে অন্য নগরে যাবার অসংখ্য রাস্তাঘাট ছিল। দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে এমন কি ভিন্‌দেশে পাড়ি দেবারও পথঘাট ছিল। তীর্থযাত্রা, দেশভ্রমণ, ব্যবসাবাণিজ্য সব কিছুর জন্যেই লোকে এই সব রাস্তাঘাট ব্যবহার করত। আজ আমরা যত রেলপথ দেখি, তার সমস্তই এই প্রাচীন পথের নিশানা ধরে চলেছে। পুরনো পুঁথিতে এর কিছু কিছু উল্লেখ আমরা পাই।

রাস্তাঘাট

য়ুয়ান চোয়াং সপ্তম শতকের দ্বিতীয় পাদে বারাণসী, পাটলিপুত্র, বুদ্ধগয়া, রাজগৃহ, নালন্দা, অঙ্গ-চম্পা ঘুরে কজঙ্গলে বা উত্তররাঢ় অঞ্চলে এসেছিলেন। কজঙ্গল থেকে তিনি গিয়েছিলেন পুণ্ড্রবর্ধনে বা উত্তরবঙ্গে। পুণ্ড্রবর্ধন থেকে পথে একটি বড় নদী পার হয়ে কামরূপ, কামরূপ থেকে সমতট, সমতট থেকে তাম্রলিপ্তি, তাম্রলিপ্তি থেকে কর্ণসুবর্ণ, কর্ণসুবর্ণ থেকে ওড্র, কঙ্গোদ, কলিঙ্গ। প্রাচীন বাংলার বিভিন্ন জনপদ এইসব রাস্তাঘাট মারফত পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখত। য়ুয়ান চোয়াং এদেশে আসবার অনেক আগে থেকেই এইসব পথের অস্তিত্ব ছিল।

এ ছাড়া দেশ থেকে দেশান্তরে যাবারও বহু পথ ছিল। বাংলা থেকে পশ্চিম দিকে বিস্তৃত তিনটি পথে উত্তর-ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যিক, সামরিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ বজায় রাখা হত। একটি পথ পুণ্ড্রবর্ধন (উত্তর-বঙ্গ) থেকে মিথিলা (উত্তর-বিহার) ভেদ ক'রে চম্পা (বর্তমান ভাগলপুর জেলা) হয়ে পাটলিপুত্রের ভেতর দিয়ে বুদ্ধগয়া স্পর্শ ক'রে বারাণসী-অযোধ্যা পর্যন্ত বিস্তৃত ; সেখান থেকে একেবারে সিন্ধু-সৌরাষ্ট্র-গুজরাটের বন্দর পর্যন্ত। দ্বিতীয় পথটি তাম্রলিপ্তি (দক্ষিণ-পূর্ব মেদিনীপুর) থেকে উত্তরমুখী হয়ে কর্ণসুবর্ণের (মুর্শিদাবাদ জেলার কানসোনা) ভেতর দিয়ে রাজমহল চম্পা স্পর্শ করে পাটলিপুত্রের দিকে চলে গেছে। তৃতীয় পথটি তাম্রলিপ্তি থেকে সোজা উত্তর পশ্চিমমুখী হয়ে বুদ্ধগয়ার ভেতর দিয়ে অযোধ্যা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

উত্তর-বঙ্গ ও কামরূপের ভেতর দিয়ে বাংলাদেশ উত্তর-পূর্বমুখী পথে চীন ও তিব্বতের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করত। খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের একটি তথ্য থেকে জানতে পারা যায় যে, সে সময়ে দক্ষিণ-চীন থেকে আরম্ভ ক'রে উত্তর-ব্রহ্ম ও মণিপুরের ভেতর দিয়ে কামরূপ হয়ে আফগানিস্থান পর্যন্ত একটি সুদীর্ঘ পথ ছিল। নবম শতাব্দীর গোড়ায় টঙ্কিন থেকে কামরূপ পর্যন্ত আরেকটি পথের খবর পাওয়া যায়। কামরূপ থেকে তিব্বত পর্যন্ত বিস্তৃত দুর্গম গিরিপথ দিয়ে বৌদ্ধ পণ্ডিত ও পরিব্রাজকেরা এবং তিব্বতী দূতেরা মগধ ও বঙ্গদেশ থেকে তিব্বতে যাতায়াত করতেন। তিব্বতের সঙ্গে যোগাযোগের আরেকটি পথ উত্তর-বঙ্গের জলপাইগুড়ি-দার্জিলিং অঞ্চল থেকে সিকিম, ভোটান পার হয়ে হিমালয় গিরিপথের ভেতর দিয়ে তিব্বতের ভেতর দিয়ে চীনদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

পূর্ববাংলার ত্রিপুরা জেলার লালমাই—ময়নামতী (প্রাচীন পট্টিকেরা রাজ্য) অঞ্চল থেকে আরম্ভ ক'রে সুরমা ও কাছাড় উপত্যকার (বর্তমান শ্রীহট্ট-শিলচর) ভেতর দিয়ে লুসাই পাহাড়ের ওপর দিয়ে মণিপুরের ভেতর দিয়ে উত্তর-ব্রহ্মদেশ পার হয়ে মধ্য-ব্রহ্মদেশের পাগান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পট্টিকেরা রাজ্যের সঙ্গে একাদশ ও দ্বাদশ শতকে পাগান রাষ্ট্রের খুব ঘনিষ্ঠ বৈবাহিক ও রাজনৈতিক সম্বন্ধ ছিল।

দক্ষিণশায়ী চট্টগ্রাম থেকে আরাকানের ভেতর দিয়ে নিম্নব্রহ্মের প্রোম বা প্রাচীন শ্রীক্ষেত্র পর্যন্ত একটি পথ বিস্তৃত।

তাম্রলিপ্তি-তমলুক থেকে, কর্ণসুবর্ণ থেকে একটি পথ সোজা দক্ষিণে চলে গিয়ে বাংলাদেশকে দক্ষিণ-ভারতের সঙ্গে যুক্ত করেছে। য়ুয়ান-চোয়াং এই পথ দিয়েই কর্ণসুবর্ণ থেকে ওড্র, কঙ্গোদ, কলিঙ্গ, দক্ষিণ-কোশল, অন্ধ্র হয়ে দ্রাবিড়, চোল, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে গিয়েছিলেন।

প্রাচীন কালে নদীপথে যেমন দেশের মধ্যে, তেমনি সমুদ্রপথে দেশের বাইরেও যাতায়াত ছিল। জাতকের গল্প থেকে জানা যায় যে, মধ্যপ্রদেশের বণিকেরা বারাণসী বা চম্পা থেকে জাহাজে ক'রে গঙ্গা-ভাগীরথীর জলপথে তাম্রলিপ্তে আসত এবং সেখান থেকে বঙ্গোপসাগরের কূল ধ'রে সিংহলে যেত, কিংবা উত্তাল সমুদ্র পাড়ি দিয়ে সুবর্ণভূমিতে (নিম্ন-ব্রহ্মদেশে) যেত। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে আরম্ভ ক'রে রেলপথের সূত্রপাত হবার আগে পর্যন্ত গঙ্গা-ভাগীরথীই ছিল বাংলাদেশের সঙ্গে উত্তর-ভারতের প্রধান যোগসূত্র।

উত্তর-আসামের রেশমজাতীয় জিনিসপত্র, পান, সুপারি, চন্দনকাঠ, কাঠ, বাঁশ, তেজপাতা ইত্যাদি ব্রহ্মপুত্র-সুরমা-মেঘনা নদীর জলপথ দিয়েই বাংলাদেশে আসত। বিশেষত পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জায়গায়, আসাম ও সুরমা উপত্যকা অঞ্চলে পাট এবং ধানচাল আজও নৌকাপথেই বেশি আমদানি-রপ্তানি হয়। উত্তর-বঙ্গে ও দক্ষিণ-বঙ্গে যোগাযোগ ছিল করতোয়া নদীপথেই।

প্রাচীন বাংলার সামুদ্রিক বাণিজ্য ও বাণিজ্য-পথের যথেষ্ট সাক্ষ্য-প্রমাণ আছে। প্রথম শতকের একটি পুঁথি থেকে জানা যায়, দক্ষিণ-ভারত ও সিংহলের সঙ্গে বাংলাদেশের ঘনিষ্ঠ বাণিজ্য-সম্বন্ধ ছিল। সপ্তম শতকে অসংখ্য চীনদেশীয় বৌদ্ধ শ্রমণ সিংহল থেকে বাংলায়, বাংলা থেকে সিংহলে যাতায়াত করেন। সিংহল থেকে মালয়, নিম্নব্রহ্ম, সুবর্ণদ্বীপ, যবদ্বীপ, চম্পা, কম্বোজের সমুদ্রপথ ছিল।

তাম্রলিপ্তি থেকে চট্টগ্রাম আরাকানের কূল বরাবর সুবর্ণদ্বীপ বা নিম্নব্রহ্মদেশ পর্যন্ত দ্বিতীয় একটি সমুদ্রপথ বিস্তৃত ছিল।

তৃতীয় আরেকটি পথ ছিল। তাম্রলিপ্তি থেকে যাত্রা করে জাহাজগুলি সোজা এসে ভিড়ত উড়িষ্যাদেশের পলৌরা বন্দরে এবং সেখান থেকে কোণাকুণি বঙ্গোপসাগর পাড়ি দিয়ে যেত মালয়, যবদ্বীপ, সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপ-উপদ্বীপে।

ভূপ্রকৃতি, জলহাওয়া

বাংলার মাটিতে যুগ যুগ ধ'রে অনেক ভাঙাগড়া হয়েছে। নানান প্রাকৃতিক ওলটপালটের ফলে পুরনো মাটি বা পুরাভূমি বাতিল হয়ে নতুন মাটি বা নবভূমি জেগে উঠেছে। কিন্তু তাতে ভূ-প্রকৃতির কোন মৌলিক বদল হয়নি।

পশ্চিমে বাংলার একটা বেশ বড় অংশ পুরাভূমি—রাজমহলের দক্ষিণ থেকে আরম্ভ ক'রে প্রায় সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত। রাজমহল, সাঁওতালভূম, মানভূম, সিংভূম, ধলভূমের পূর্বদিকের মালভূমি এই পুরাভূমির মধ্যে। এই অংশটি একান্তই পার্বত্য, বনময়, অজলা ও অফলা। এখানে গভীর শালবন, পার্বত্য আকর ও কয়লার খনি আছে। তারই পূর্বদিক ঘেঁষে পুরাভূমির অন্তর্গত মুর্শিদাবাদ-বীরভূম-বর্ধমান-বাঁকুড়া-মেদিনীপুর জেলার পশ্চিমাংশের উচ্চতর গৈরিকভূমি। দক্ষিণ রাঢ়ের রানীগঞ্জ-আসানসোলের পার্বত্য অঞ্চল, বাঁকুড়ার শুশুনিয়া পাহাড় অঞ্চল, বন-বিষ্ণুপুর রাজ্য, মেদিনীপুরের শালবনী-

ঝাড়গ্রাম-গোপীবল্লভপুর অঞ্চল সমস্তই এই পুরাভূমির নিম্ন অংশ। এইসব পার্বত্য ও গৈরিক অঞ্চল ভেদ ক'রেই ময়ূরাক্ষী, অজয়, দামোদর, রূপনারায়ণ, দ্বারকেশ্বর, শিলাবতী (শিলাই), কপিশা (কসাই), সুবর্ণরেখা প্রভৃতি নদনদী সমতলভূমিতে নেমে এসেছে। সমতলভূমি এদের বয়ে আনা জল ও পলিতে উর্বর। এই উর্বর সমতলভূমি নবগঠিত ভূমি। মুর্শিদাবাদের বহুলাংশ, বর্ধমানের পূর্বাংশ, বাঁকুড়ার কিছুটা অংশ, হাওড়া-হুগলী এবং মেদিনীপুরের পূর্বাংশ—বৃক্ষশ্যামল, শস্যবহুল এই নবসৃষ্ট ভূমি পূর্বত্রিপুরা, পার্বত্য চট্টগ্রাম হয়ে সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত।

পশ্চিমের পুরাভূমির একটি রেখা রাজমহলের উত্তরে গঙ্গা পার হয়ে মালদহ-রাজসাহী-দিনাজপুর-রংপুরের ভেতর দিয়ে, ব্রহ্মপুত্র পার হয়ে তার দুই তীরে ছড়িয়ে পড়ে আসামের শৈলশ্রেণী স্পর্শ করেছে। এই পুরাভূমিরেখার মাটি পার্বত্য গৈরিক স্থূল বালুময়। রংপুর, গোয়ালপাড়া, কামরূপেই এই রেখার বিস্তৃতি বেশি। বগুড়া, রাজসাহীর উত্তর, দিনাজপুরের পূর্ব এবং রংপুরের পশ্চিম স্পর্শ ক'রে এই রেখার উচ্চ গৈরিক ভূমিময় একটি স্ফীতি দেখতে পাওয়া যায়; একেই বলে বরিন্দ্—বরেন্দ্রভূমির কেন্দ্রবিন্দু। বরিন্দের গৈরিক ভূমি অনুর্বর পুরাভূমি। এর পূর্ব-পশ্চিম-দক্ষিণ ঘিরে তঙ্গন-আত্রাই, মহানন্দা-কোশী, পদ্মা-করতোয়ার জল ও পলিমাটি দিয়ে তৈরি সমতল, সুজলা, সুফলা নবভূমি। বরেন্দ্রী পুণ্ড্রবর্ধনের একটা বড় অংশ; অনেক সময়ে বরেন্দ্রী বলতে পুণ্ড্রবর্ধনকেই বোঝায়। এক সময়ে পুণ্ড্র-বরেন্দ্রভূমির সঙ্গে রাঢ়ভূমির, বিশেষত মুর্শিদাবাদ, বীরভূম বর্ধমানের, ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সম্বন্ধের একটি ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ প্রাচীন এই দুই ভূখণ্ডের মধ্যে বরাবরই ছিল। দিনাজপুর, রাজসাহী, মালদহের লোক-ভাষার প্রকৃতিও রাঢ়ের পূর্বাঞ্চলের লোক-ভাষার প্রকৃতির সঙ্গে আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ। আজ অবশ্য উত্তর বাংলার সঙ্গে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক যোগ পূর্ব-বাংলার বেশি—কিন্তু প্রাচীনকালে তা ছিল না বললেই চলে।

পার্বত্য-চট্টগ্রাম, পার্বত্য-ত্রিপুরা অঞ্চল, কাছাড় জেলার উত্তরাংশ ও দক্ষিণাংশে কালিয়াকান্দি অঞ্চল, শ্রীহট্টের পূর্বাঞ্চল, মৈমনসিংহের মধুপুর গড় ও ঢাকার ভাওয়ালের গড়—এই কয়েক খণ্ড পুরাভূমি বাদ দিলে পূর্ব-বাংলার আর সমস্ত ভূমিই নবভূমি; এখানে সর্বত্র খালবিল আর বিরাট বিরাট জলাভূমি। এই নবভূমির মধ্যে আবার মৈমনসিং, ঢাকা, ফরিদপুর, সমতল-ত্রিপুরা ও

শ্রীহট্টের বহুলাংশের গঠন পুরনো। প্রাচীন সভ্যতা, সংস্কৃতির অনেক নিদর্শন এইসব জায়গায় পাওয়া গেছে। আর খুলনা, বাখরগঞ্জ, সমতল-নোয়াখালি ও সমতল-চট্টগ্রামের গঠন নতুন। বাংলার প্রাচীন সভ্যতা-সংস্কৃতির চিহ্ন এসব জায়গায় বড় একটা পাওয়া যায়নি।

মধ্য বা দক্ষিণ বঙ্গে পুরাভূমির অস্তিত্ব কোথাও নেই। এই ভূমি একেবারে পদ্মা-ভাগীরথী-মধুমতীর সৃষ্টি এবং বাংলার নবভূমির মধ্যে পড়ে। শত শত বছর ধ'রে পলিমাটি জমে ওঠার ফলে এই ভূমি এত উঁচু হয়ে উঠেছে যে, বন্যা কিংবা সমুদ্রের জোয়ার-ভাঁটায় এই ভূখণ্ড কিছুতেই কাবু হয় না। নদীয়া জেলার কিছু অংশ, যশোর, খুলনা, এবং চব্বিশ পরগণা এই ভূখণ্ডের অন্তর্গত। এর মধ্যে নদীয়া-যশোর ও সেই সঙ্গে বোধ হয় চব্বিশ পরগণার গঠন পুরনো এবং খুলনা-বাখরগঞ্জের গঠন নতুন। ঐতিহাসিক কালে বাংলাদেশে সব থেকে বেশি ভাঙা-গড়া হয়েছে এই দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব অঞ্চলে। পদ্মা, ভাগীরথী ও তাদের অসংখ্য শাখা-প্রশাখায় যে বিপুল পলিমাটি ভেসে আসে, তার দরুন এই দুই নদীর মধ্যবর্তী খাড়িময় নিম্নভূমি বার বার তছনছ হয়ে কখনও সেখানে সমৃদ্ধ জনপদ কখনও গভীর অরণ্যের সৃষ্টি হয়েছে, কখনও তা অনাবাদী জলাভূমিতে পরিণত হয়েছে কিংবা নদীগর্ভে বিলীন হয়েছে। ষষ্ঠ শতকে জল স'রে গিয়ে ফরিদপুরের কোটালিপাড়া অঞ্চল সবেমাত্র মাথা তুলেছে, তাই তাকে বলা হত নতুন জেগে ওঠা চর বা নব্যাবশিকা। এই জনপদ ছিল প্রায় সমুদ্রের তীরে। আজ যে সুন্দরবন অঞ্চল জনহীন অরণ্য, পঞ্চ-ষষ্ঠ শতক থেকে দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত সেখানে ছিল মানুষের ঘনবসতিপূর্ণ সমৃদ্ধ জনপদ। নিম্নভূমির এই ভাঙাগড়া আজও একটানা চলেছে।

জলবায়ু

বাংলার জলবায়ু বরাবরই নাতিশীতোষ্ণ। তবে পশ্চিমাঞ্চলে, বিশেষত বীরভূম-বর্ধমানের পশ্চিমাংশে, এবং কতকটা মেদিনীপুরেও গ্রীষ্মের তাপ প্রখরতর ; অন্যত্র গ্রীষ্মের হাওয়া উষ্ণ, জলীয়। পূর্ব ও উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি বেশি হয়। ভারত মহাসাগরের মৌসুমীবায়ু হিমালয়, গারো, খাসিয়া ও জৈন্তিয়া পাহাড়ে প্রতিহত হয়ে সমগ্র উত্তর-পূর্ব বাংলাকে বৃষ্টিতে ভাসিয়ে দেয়। বসন্তকালে আরেকটি বায়ুপ্রবাহ দেখা যায় ; এই বায়ুপ্রবাহ উত্তর-পূর্ববাহী। যেহেতু এই বাতাস মলয় পর্বত স্পর্শ ক'রে আসে সেই জন্য কাব্য-সাহিত্যে বসন্তের বাতাসকে বলে মলয় পবন। বর্ষায় অবিরল বৃষ্টিপাত পূর্ব ও দক্ষিণ বাংলার জলবায়ুর প্রধান বৈশিষ্ট্য।

প্রাচীনকালে বাংলাদেশের লোকদের প্রকৃতি কেমন ছিল? এ সম্বন্ধে বাইরের বিভিন্ন পর্যটক তাঁদের মতামত দিয়েছেন। কিন্তু সে সব মতামত নির্ভরযোগ্য নয়। কারণ, তার মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে ভালো-লাগা না-লাগার প্রশ্ন জড়িত আছে। তাছাড়া বিশেষ প্রকৃতির দু'চারজনকে দেখে তাঁরা হয়ত সকলের সম্বন্ধেই ভুল ধারণা করে বসেছেন। যাইহোক, তাঁরা কী বলেছেন দেখা যাক।

লোকপ্রকৃতি

সপ্তম শতকে য়ুয়ান চোয়াং এদেশে এসেছিলেন। তাঁর মতে, কজঙ্গলের লোকেরা স্পষ্টাচারী, গুণবান এবং শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাবান। পুণ্ড্রবর্ধনের লোকেরাও জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধাবান; কামরূপের লোকেরা সদাচারী হওয়া সত্ত্বেও হিংস্র প্রকৃতির; তাম্রলিপ্তির লোকদের ব্যবহার রূঢ় হলেও তারা জ্ঞান-বিজ্ঞানে অনুরাগী, কর্মঠ ও সাহসী; সমতটের লোকেরা কর্মঠ; কর্ণসুবর্ণের লোকেরা ভদ্র, সচ্চরিত্র এবং তারা জ্ঞান-বিজ্ঞানের পোষকতা করে।

বিদ্যার্চ্চায় বাঙালীর অনুরাগের খবর অনেক প্রাচীন পুঁথিতেই পাওয়া যায়। বাঙালীরা ছাত্র ও শিক্ষক হিসেবে ভারতবর্ষের নানা জায়গায় এবং ভারতবর্ষের বাইরেও যাতায়াত করত। বাঙালীর বদমেজাজ এবং কুঁদুলে স্বভাবের কথা কোন কোন প্রাচীন লেখক উল্লেখ করেছেন।

ধনদৌলত

ধনদৌলত বলতে শুধু টাকাকড়ি বোঝায় না। খাওয়া, পরা, থাকা এবং তাছাড়া আরও অজস্র চাহিদা মেটানোর জন্যে মানুষের যা কিছু দরকার হয়, তার সব কিছুই হল ধনদৌলত। শুধু একার চেষ্টায় এর সব কিছু জোটানো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। তার জন্যে পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করে থাকার নামই সমাজ। চাহিদা মেটানোর এই উপায়ের ওপর যেমন মানুষের সমাজ, তেমনি রাষ্ট্র, ধর্ম, শিক্ষাদীক্ষা, শিল্পসংস্কৃতি, ধ্যানধারণা সব কিছুই নির্ভর করে। কাজেই প্রাচীন বাংলার ইতিহাস জানতে গেলে তখনকার ধনদৌলত কী ছিল এবং তা কোথা থেকে আসত তার হিসেব নেওয়া দরকার।

প্রাচীন বাংলার একেবারে গোড়ার যুগে সামাজিক ধনদৌলতের প্রধান উৎস ছিল শীকার, কৌম কৃষি এবং ছোটখাটো গৃহশিল্প। দ্বিতীয় পর্বে অর্থাৎ মোটামুটি খৃষ্টীয় প্রথম-দ্বিতীয় শতক থেকে ষষ্ঠ-সপ্তম শতক পর্যন্ত কিছুটা উন্নত ধরনের চাষবাস এবং গৃহশিল্প ধন-উৎপাদনের বড় উপায় হলেও প্রধানতম উপায় ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য। কিন্তু শেষ পর্যায়ে অর্থাৎ অষ্টম শতক থেকে আদিপর্বের শেষ পর্যন্ত বাঙালী জীবন ছিল একান্তই ভূমি ও কৃষিনির্ভর।

এ থেকে বোঝা যায়, প্রাচীন বাংলায় ধন-উৎপাদনের উপায় ছিল তিনটি : কৃষি, শিল্প এবং ব্যবসাবাণিজ্য।

কৃষি

প্রাচীন বাংলার ধনদৌলত আসত প্রথমত এবং প্রধানত কৃষি থেকে। অষ্টম শতক থেকে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত বিভিন্ন লেখার মধ্যে 'ক্ষেত্রকর', 'কর্ষক', 'কৃষক' ইত্যাদি কথার বারবার উল্লেখ পাওয়া যায়। জনসাধারণ যে সব শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল, তার মধ্যে ক্ষেত্রকর বা কৃষকেরা ছিল বিশেষ একটি শ্রেণী। কোথাও কোন জমি দানবিক্রি করতে হলে অন্যান্য গণ্যমান্য লোকদের সঙ্গে কৃষকদেরও সেই দানবিক্রির কথা জানাতে হত। সমাজে কৃষকের রীতিমত খাতির ছিল। পঞ্চম থেকে

বিষয়ে অন্তত ২৮৮৲ টাকা এবং ফরিদপুর অঞ্চলে কমপক্ষে ৩৮৪৲ টাকার কম ছিল না। তখনকার আমলে এর পরিমাণ কম নয়।

লোকসংখ্যা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই প্রাচীন বাংলায় জমির চাহিদা বাড়ছিল। জমির চাহিদা বাড়বার আরেকটি কারণ ছিল ; বিভিন্ন ধর্মপ্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তিবিশেষ প্রচুর ভূসম্পত্তির মালিক হয়ে বসেছিল। ত্রয়োদশ শতকের এক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত হলায়ুধ শর্মা নিজে কেনা ছাড়াও রাজার কাছ থেকে ব্রহ্মত্র দানস্বরূপ বিস্তর জমি পান। রাষ্ট্রকে তাঁর কোন কর দিতে হত না, কিন্তু প্রজাদের কাছ থেকে এই জমিদার ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতটি ষোল আনা করই আদায় করতেন। পাল ও সেন রাজারা তো অনেক ব্রাহ্মণকেই এইভাবে গ্রামকে-গ্রাম দান করেছিলেন। নিজের প্রয়োজনের চেয়েও বেশি জমির মালিক হবার লোভ বাড়ছে এবং ব্যক্তিবিশেষের হাতে যে একসঙ্গে প্রচুর পরিমাণ জমির মালিকানা চলে যাচ্ছে—এ থেকে তার আভাস পাওয়া যায়। চাহিদা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে একদিকে যেমন জমির মাপজোখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি পড়ছে, তেমনি 'জমির সূক্ষ্ম সীমানা সম্পর্কেও সবাই খুব সজাগ হচ্ছে। খুব সম্ভব, চারদিকে লাইন বরাবর মাটি খুঁড়ে তুষের ছাই ইত্যাদি দিয়ে গর্ত ভরাট করা হত। ঘাস বা গাছ গজিয়ে যাতে জমির দাগ মুছে দিতে না পারে, তারই জন্যে ছিল এই ব্যবস্থা। জমির চাহিদা বাড়বার দরুন জমি নিয়ে বাদ-বিসম্বাদ হত বলেই হয়ত জমির সীমানা সুস্পষ্টভাবে বেঁধে দেওয়া হত।

যতদূর মনে হয়, রাষ্ট্রের দিক থেকে জমি মাপার, জমি জরিপ এবং জমির বার্ষিক আয়, জমির দাম ঠিক করা ইত্যাদি ব্যবস্থা ছিল। পুস্তপালের দপ্তরে এ-সংক্রান্ত কাগজপত্র রাখা হত ; পঞ্চম শতকেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। পরে এই ব্যবস্থা যে আরও পাকাপোক্ত হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই।

যারা দান হিসেবে রাজার কাছ থেকে জমি পেত, তারা ছাড়া আর সবাই প্রাচীন বাংলায় রাজাকে কর দিত। একমাত্র চাষের অযোগ্য জমিরই কোন কর ছিল না। উৎপন্ন দ্রব্যের ছ'ভাগের এক ভাগ রাষ্ট্রের প্রধান প্রাপ্য ছিল। অন্যান্য যেসব কর ছিল, তার মধ্যে দু'একটির কথা জানা যায়। লবণ, অরণ্য ইত্যাদিতে রাষ্ট্রের একচেটিয়া অধিকার ছিল ; তা থেকে রাষ্ট্রের নিয়মিত আয় ছিল। এইসব যারা ভোগ করত, রাজসরকারে

তাদের কর দিতে হত। খেয়াঘাট, হাটবাজার থেকেও একভাবে রাজস্ব আদায় হত। জনসাধারণই সেই রাজস্ব যোগাত।

যাঁকে বা যে প্রতিষ্ঠানকে রাজা সমস্ত রকমের কর বাদ দিয়ে জমি দান করতেন, তিনি বা সেই প্রতিষ্ঠান সেই জমির সমস্ত রকম উপস্বত্ব ভোগ করতেন। এই উপস্বত্বের মধ্যে কয়েকটি হচ্ছে ভাগ, ভোগ, কর, হিরণ্য।

ভাগ বলতে রাজার বা রাষ্ট্রের প্রাপ্য উৎপন্ন ফসলের ভাগ বোঝায়। উৎপন্ন ফসলের ছ'ভাগের এক ভাগ রাজাকে দিতে হত। ফল, ফুল, কাঠ ইত্যাদি যেসব জিনিস মাঝে মাঝে রাজাকে তাঁর ব্যক্তিগত ভোগের জন্যে দিতে হত, তারই নাম ছিল ভোগ। এইসব ফল, ফুল, কাঠ, বাঁশ থেকে একটা নিয়মিত আয়ের অংশ রাজা ভোগ করতেন। মুদ্রায় দেওয়া রাজস্বের নাম কর। তিন রকম করের উল্লেখ পাওয়া যায়: (১) রাজার পাওনা শস্যভাগ ছাড়া নির্ধারিত সময়ে নিয়মিত দেয় মুদ্রা-কর; (২) আপৎকালে দেয় মুদ্রা-কর; (৩) বণিক ব্যবসায়ীদের লাভের ওপর দেয় কর। হিরণ্যের অর্থ স্বর্ণ; সম্ভবত রাজা তাঁর পাওনার সবটা ফসলে না নিয়ে মুদ্রায় নিতেন।

এ ছাড়াও আরও অন্যান্য কর ছিল। যেমন চোর-ডাকাতের হাত থেকে রক্ষণাবেক্ষণ করার দায়িত্ব রাজার, কিন্তু তার জন্যে জনসাধারণকে একটা কর দিতে হত। দশ রকমের অপরাধের জন্যে প্রজাদের জরিমানা করা হত। সেটাও এক রকমের রাজস্ব। এ ছাড়াও ছিল উপরিকর। খেয়াঘাটের রাজস্ব যেসব রাজকর্মচারী সংগ্রহ করত, তাদের বলা হত তারক বা তরপতি। হাটের রাজস্ব আদায়কারীর নাম হট্টপতি। উপরিকর সংগ্রহকারীকে বলা হত উপরিকারক। সময় সময় কোন বিশেষ উপলক্ষেও রাজা বা রাষ্ট্রকে কর দিতে হত। প্রাচীন লিপিতে একে বলা হয়েছে 'পীড়া'। ছোটবড় রাজপুরুষেরা নানা কাজে গ্রামে এসে অস্থায়ী ছাউনি ফেলতেন। তাদের পানাহারের ব্যবস্থা গ্রামবাসীদেরই করতে হত। তাছাড়া চাট-ভাটেরা গ্রামে ঢুকে নানা অত্যাচার করত।

অতি প্রাচীনকালে কিন্তু জমি নিয়ে এত ঝকমারি ছিল না। লোক ছিল কম, জমি ছিল দেদার। যার যখন দরকার, সে জঙ্গল হাসিল করে, মাটি ভরাট করে, দরকারমত জমি তৈরি করে নিত। জমির মালিকানা নিয়ে ভাবতে হত না, জমির চুলচেরা ভাগ নিয়ে লাঠালাঠির দরকার হত না। জমি নিয়ে কোন বাদবিসম্বাদ হলে গ্রামবাসীরাই তার মীমাংসা করে দিত। কিন্তু লোক

সপ্তম শতক পর্যন্ত সমস্ত তাম্রপট্টোলিতেই দেখা যায় লোকে বেশি জমি চাইছে চাষের জন্য। প্রাচীন বাংলার অর্থনৈতিক জীবনে কৃষির এই প্রাধান্য আরও একটি ঘটনা থেকে বোঝা যায়। সে সময় যেভাবে জমি মাপা হত তাও কৃষিব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত। কতখানি জমিতে কত বীজধান লাগে, কত লাঙল লাগে, সেই অনুপাতে জমির মাপ সাব্যস্ত হত। ডাক আর খনার বচন থেকেও প্রাচীন বাংলার কৃষিপ্রধান সমাজের প্রমাণ পাওয়া যায়।

য়ুয়ান চোয়াঙের বিবরণে প্রাচীন বাংলার শস্যসম্ভারের কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়। কজঙ্গলে ভাল ফসল হত। পুণ্ড্রবর্ধন ছিল জনবহুল; শস্যসম্ভার ফুলফলের প্রাচুর্য ছিল। তাম্রলিপ্তির কৃষিকর্ম ভাল ছিল, ফলফুলও যথেষ্ট পাওয়া যেত, স্থলপথ ও জলপথের কেন্দ্র হওয়ায় নানা দুষ্প্রাপ্য জিনিস মজুত হত এবং তার ফলে এখানকার লোকেরা প্রায় সকলেই বেশ শাঁসালো ছিল। কর্ণসুবর্ণের লোকেরাও ছিল খুবই ধনী এবং জনসংখ্যাও ছিল প্রচুর; কৃষিকর্ম ছিল নিয়মিত ঋতু অনুযায়ী, ফলফুলও যথেষ্ট পাওয়া যেত। য়ুয়ান চোয়াঙের এই বিবরণ থেকে প্রাচীন বাংলার কৃষি-প্রাধান্যের স্পষ্ট রূপ ধরা পড়ে।

কৃষির সাহায্যে কোন্ কোন্ ফসল এবং ফলমূল হত, তার পুরো বিবরণ পাওয়া যায় না। যেটুকু খবর আমরা পাই, তা পুরনো লেখার মধ্যে ইতস্তত ছড়ানো উল্লেখ থেকে। যেসব জিনিসের উল্লেখ নেই, প্রাচীন বাংলায় তা ছিল না—এ কথা জোর করে বলা যায় না।

বগুড়া জেলার মহাস্থানে পাওয়া একটি শিলালিপিতে ধানের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই শিলালিপি খোদাই করা হয়েছিল খৃষ্টের জন্মের দুই থেকে তিনশো বছর আগে। এক রাজা পুণ্ড্রনগর ও তার আশপাশের দুঃস্থ সংবঙ্গীয় বা ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদের কিছু অর্থ ও ধান কর্জ দেবার জন্যে মহামাত্রকে হুকুম দিয়েছিলেন। এই শিলালিপি তারই হুকুমনামা। তাতে একথাও আছে যে, এই ঋণের সাহায্যে ভিক্ষুরা বিপদ কাটিয়ে উঠবে এবং জনসাধারণের মধ্যে আবার শস্যসমৃদ্ধি ফিরে আসবে। তখন তারা গণ্ডক মুদ্রা দিয়ে রাজকোষ এবং ধান দিয়ে রাজকোঠাগার ভরে দেবে। এ থেকে বোঝা যায়, সাধারণ মানুষের প্রধান উপজীব্যই ছিল ধান। এদেশে অসংখ্য নদীনালা থাকা সত্ত্বেও ধানের জন্য বৃষ্টির ওপর একান্তভাবে নির্ভর করতে হয়। তাই এদেশের ছড়ায়, গানে, পল্লীবচনে, লোকায়ত ব্রত আর পুজানুষ্ঠানে

মেঘ আর আকাশের কাছে বৃষ্টি প্রার্থনা করা হয়। আজও আমরা সুর করে বলি : আয় বৃষ্টি ঝেঁপে, ধান দেবো মেপে। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকে ব্রাহ্মণদের যেসব গ্রাম দান করা হত, তাতে থাকত চাষের ক্ষেত এবং বাগান; ক্ষেতে প্রচুর শালিধান হত। কালিদাস রঘুবংশ কাব্যে এক উপমার ভেতর দিয়ে বাংলায় ধানচাষের বিশিষ্ট পদ্ধতির কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, ধানের চারাগাছ যেমন করে একবার উপড়ে ফেলে আবার রোয়া হয়, তেমনি করে রঘু বঙ্গজনদের একবার উৎখাত করে আবার প্রতিরোপিত করেছিলেন। সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত কাব্যের কবি-প্রশস্তিতে প্রাচীন বাংলায় ধান মাড়াইয়ের বর্ণনা পাওয়া যায়। গোলাকারে সাজানো কাটা ধানের ওপর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বলদ হাঁটিয়ে ধান মাড়াই করা হত।

ত্রয়োদশ শতকের এক অজ্ঞাতনামা কবির কবিতায় শুধু ধান নয়, আখ চাষের খবরও পাওয়া যায়। বাংলার গ্রামের তিনি ছবি এঁকেছেন—

> …চাষীর ঘরে নতুন কাটা শালিধানের কী বাহার। গাঁয়ের শেষে ক্ষেত জুড়ে প্রচুর যব; নীল পদ্মের মত স্নিগ্ধ সবুজ তাদের শীষগুলো। ঘরে ফিরে নতুন খড় পেয়ে গরু, বলদ, ছাগলদের আনন্দ ধরে না। আখমাড়াই কলের ঘর্ঘর শব্দে গ্রামগুলো দিনভর মুখর; গুড়ের গন্ধ সারা গাঁয়ে ভুর ভুর করছে।…

সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতে দেখা যায়, বরেন্দ্রীর সৌন্দর্য বাড়িয়েছিল সেখানকার আখের ক্ষেত। বরেন্দ্রীর প্রাচীনতর ও বৃহত্তর সংজ্ঞা হচ্ছে পুণ্ড্র। পুণ্ড্র বা পুঁড় কোম বোধ হয় আখের চাষে খুব দক্ষ ছিল বলেই আখের অন্য নাম পুঁড়। গৌড় নাম 'গুড়' থেকে এসেছে। এর মধ্যেও আখের চাষের ইঙ্গিত রয়েছে। সুশ্রুত-গ্রন্থে পৌণ্ড্রক নামে এক রকম আখের উল্লেখ আছে। পুণ্ড্র দেশে যে আখ জন্মাত তাকেই বলা হত পৌণ্ড্রক।

সপ্তম শতকের কর্ণসুবর্ণ রাষ্ট্রে একটি গ্রামের তাম্রলিপিতে 'সর্ষপ-যানক' কথাটি পাওয়া যায়। সর্ষপ-যানক বলতে বোঝায় সর্ষেক্ষেতের পাশ-বরাবর রাস্তা। এ থেকে জানা যায় যে, বাংলার গ্রামে সে সময় সর্ষের চাষ ছিল।

পঞ্চম থেকে সপ্তম শতকের মধ্যে যেসব লিপি পাওয়া যায়, তাতে ভূমিজাত জিনিসপত্রের উল্লেখ নেই বললেই চলে। কিন্তু অষ্টম শতকে পাল-রাজত্বের আরম্ভের গোড়া থেকেই এই উল্লেখ পাওয়া যায়।

এসব থেকে জানা যায় যে, প্রাচীন বাংলায় ধান এবং অন্যান্য শস্য ছাড়াও

অনেক রকম ফলমূল ও গাছগাছড়া হত। আম বাংলাদেশের সব জায়গাতেই জন্মাত। মহুয়া হত প্রধানত উত্তরবঙ্গে; তাছাড়া মেদিনীপুরের দাঁতনের দিকেও হত। মহুয়ার ফল খাওয়া ছাড়াও, মহুয়া থেকে মদ হত। কাঁটালেরও উল্লেখ পাওয়া যায় বিশেষভাবে পূর্ববাংলায়, ঢাকা অঞ্চলে; উত্তরবঙ্গেও যে হত, য়ুয়ান চোয়াঙের বিবরণ থেকে তা জানা যায়। সুপারি আর নারকেল প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেত গঙ্গা-পদ্মা-ভাগীরথী-করতোয়া আর সমুদ্রের আশপাশের অঞ্চলগুলিতে। দ্বাদশ শতকে হাওড়া জেলার বেতর গ্রামের কাছে গঙ্গার কাছাকাছি ডালিমের ক্ষেত ছিল। পর্কটি, বীজফল, খেজুরের উল্লেখ বহু লিপিতে পেলেও কলাগাছের কোন উল্লেখ বড় একটা পাওয়া যায় না। অবশ্য পাহাড়পুরের পোড়ামাটির ফলকে এবং অন্যান্য পাথরে আঁকা ছবিতে কলাগাছ দেখতে পাওয়া যায়। অষ্ট্রিক এবং আদি-অস্ট্রেলীয় আমল থেকেই কলা বাঙালীর প্রিয় খাদ্য। বাংলার সব জায়গাতেই, বিশেষ করে বিক্রমপুর-ভাগে, সুন্দরবনের খাড়িমণ্ডলে, নিম্ন জলাভূমি অঞ্চলে, ঢাকা জেলার পদ্মার ধারের অঞ্চলে সুপারি ও নারকেলের চাষ ছিল।

মাছের বিশেষ কোন উল্লেখ না পেলেও বাংলার অসংখ্য নদনদী আর খালবিলে যে মাছের অভাব ছিল না তা বুঝতে কষ্ট হয় না।

বাঁশ আর কাঠ ছিল প্রাচীন বাঙালীর অর্থাগমের একটা বড় উপায়। সাধারণ লোকে বাঁশের চাঁচের বেড়া দিয়ে ঘরবাড়ি বাঁধত। খুব ভাল বাঁশের ঝাড় ছিল বরেন্দ্রীতে।

কৃষিজাত অথবা ভূমিজাত না হলেও এখানে লবণের উল্লেখ করা যেতে পারে। বাংলার সমুদ্রতীরের নিম্নভূমিতে কিংবা পদ্মার তীরে যেখানে জোয়ারের সঙ্গে সমুদ্রের লোনা জল ভেসে আসে, সেই সমস্ত জায়গায়, নুন তৈরি করার প্রাচীন প্রথা আজও দেখতে পাওয়া যায়। লোকে বড় বড় গর্ত করে লোনা জল ধরে রেখে পরে রোদ্দুরের তাপে অথবা জাল দিয়ে শুকিয়ে নিয়ে লবণ তৈরি করে। ঢাকা জেলার মুন্সীগঞ্জ-নারায়ণগঞ্জের পদ্মাতীরে, মেদিনীপুর জেলার দাঁতনে, চট্টগ্রামে প্রাচীন যুগে লবণের উল্লেখ পাওয়া যায়।

বরেন্দ্রভূমিতে এলাচের সুবিস্তৃত চাষ ছিল। এ ছাড়া বাংলাদেশে লঙ্কা, লবঙ্গ, তেজপাতা, লাক্ষা হত। কামরূপে অগুরু জন্মাত।

বিদ্যাপতির মতে, বাংলাদেশের সেরা জিনিস ছিল ঘি। তাই বাংলাকে তিনি বলেছিলেন 'আজ্যসার গৌড়'। আজ্য মানে ঘি। চতুর্দশ শতকের একটি গ্রন্থে প্রাচীন বাঙালীর খাবারের এই বর্ণনাটি দেওয়া হয়েছে : কলাপাতায় ওগরা ভাত আর নাল্‌তে শাক, মৌরলা মাছ, গাওয়া ঘি আর দুধ। এই বর্ণনা পড়লে আজকের দিনেও যেকোন বাঙালীর জিভে জল আসবে।

খনিজ

বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থের মতে, পৌণ্ড্রদেশ একসময় হীরার জন্য বিখ্যাত ছিল। কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রে বাংলার দু জায়গায় হীরার খনির উল্লেখ করেছেন : পৌণ্ড্রক এবং ত্রিপুর বা ত্রিপুরা। বজ্রভূমিতে খুব সম্ভব হীরার খনি ছিল ; তা থেকেই বজ্রভূমি নামের উৎপত্তি। আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে গড় মন্দারণে একটি হীরার খনির উল্লেখ পাওয়া যায়।

আসাম আর উত্তর-ব্রহ্মের নদী বেয়ে কিছু সোনা ত্রিপুরা জেলার ভিতর দিয়ে বাংলায় আসত। এই সোনার পরিমাণ যথেষ্ট ছিল, যদিও খুব উঁচুদরের ছিল না। নিম্নবঙ্গের দক্ষিণ-পশ্চিমে সুবর্ণরেখা নদী, ঢাকা আর ফরিদপুরের সোনারং, সোনারগাঁ, সুবর্ণবীথি, সোনাপুর প্রভৃতি নামের সঙ্গে সোনার ইতিহাস সম্ভবত জড়িত। এইসব জনপদের নদীগুলিতে প্রাচীন কালে বোধহয় গুঁড়ো গুঁড়ো সোনা পাওয়া যেত।

ত্রিপুরার যেসব বণিক ঢাকায় বাণিজ্য করতে আসত, তারা টুকরো টুকরো সোনার বদলে নিয়ে যেত প্রবাল, অয়স্কান্ত মণি, কচ্ছপের পিঠের ছালের এবং সামুদ্রিক শঙ্খের মালা। রাঢ়ের দক্ষিণ-সমুদ্রে প্রচুর মুক্তা পাওয়া যেত।

গৌড়িক নামে এক খনিজ রুপার নাম কৌটিল্য করেছেন এবং তা যে গৌড়দেশে পাওয়া যায় তাও বলেছেন। এই রুপার রং অগুরু ফুলের মতন।

আরেকটি পরবর্তী পুঁথিতে রাঢ়দেশের জাঙ্গলখণ্ডে লৌহখনির উল্লেখ আছে। বাঁকুড়া, বীরভূম, সাঁওতালভূমে এখনও জায়গায় জায়গায় লোহা সংগ্রহ এবং তা দিয়ে তৈজসপত্র, ঘরোয়া ছোটখাটো অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদি তৈরি করে অনেকে সংসার চালায়।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র থেকে একথা অনুমান করা যায় যে, বাংলাদেশে

বিশেষ করে উত্তর-বঙ্গ কামরূপের পার্বত্য অঞ্চলের হাতীই ছিল সব চেয়ে সেরা হাতী। আজও গারো পাহাড় অঞ্চল হাতীর জায়গা। এই বাংলাদেশেই পরের যুগে হাতী ধরার এবং হস্তী-আয়ুর্বেদ নামে এক বিশেষ বিদ্যা ও শাস্ত্রের উদ্ভব হয়েছিল। মেগাস্থিনিসের বিবরণে পাওয়া যায়, প্রাচ্য ও গঙ্গারাষ্ট্র হাতীর জন্য বিখ্যাত ছিল। য়ুয়ান-চোয়াঙের বিবরণ থেকে জানা যায়, কামরূপের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে হাতীর দল ঘুরে বেড়াত।

পশুপক্ষী

সপ্তম শতকের একটি তাম্রলিপিতে বাংলাদেশের যেসব জন্তুজানোয়ারের উল্লেখ পাওয়া যায়, তার মধ্যে হরিণ, শূয়র, বাঘ, আর সাপ অন্যতম।

পাহাড়পুরের পোড়ামাটির ফলকে এবং পাথরের ওপর ছবিতে গরু, বানর, ঘোড়া, উট ইত্যাদির পরিচয় পাওয়া যায়। যুদ্ধ ও বাণিজ্যের প্রয়োজনে ঘোড়া আর উট বিদেশ থেকে এসেছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই।

পাখীর উল্লেখ কমই পাওয়া যায়। তবে হাঁস, বন্য ও পোষা মুরগী, পায়রা, নানা জাতের জলচর পাখী, কাক আর কোকিলের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়।

খৃষ্টের জন্মের আগে থেকেই বাংলার বস্ত্রশিল্পের খ্যাতি দেশ বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। কার্পাসের চাষ, গুটিপোকার চাষ, কার্পাস ও অন্যান্য বস্ত্রশিল্পই ছিল প্রাচীন বাংলার সব চেয়ে বড় শিল্প এবং অর্থাগমের অন্যতম প্রধান উপায়। বঙ্গে ও পুণ্ড্রে প্রাচীনকালে চার রকমের বস্ত্রশিল্প ছিল—দুকূল, পত্রোর্ণ (এণ্ডি ও মুগা-জাতীয়), ক্ষৌম ও কার্পাসিক। কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রে বলেছেন, বঙ্গের দুকূল যেমন নরম, তেমনি শাদা; পুণ্ড্রের দুকূল শ্যামবর্ণ, দেখতে মণির মত পেলব; কামরূপের দুকূল দেখতে ভোরের সূর্যের মত। প্রাচীন গ্রীক ঐতিহাসিকেরাও বার বার বাংলার এই সম্পদের কথা তাঁদের গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। পেরিপ্লাস গ্রন্থে বলা হয়েছে, এদেশ থেকে সব চেয়ে মূল্যবান রপ্তানির জিনিস ছিল বাংলার মস্‌লিন। ত্রয়োদশ শতকের শেষের দিকে মার্কো পোলো বাংলাদেশ সম্বন্ধে বলেছেন, এখানকার লোকে প্রচুর কার্পাস উৎপাদন করে এবং কার্পাসের ব্যবসা খুব সমৃদ্ধ। এক চীনা পরিব্রাজক পঞ্চদশ শতকের গোড়ায় বাংলাদেশে এসেছিলেন। তিনি বলেছেন, এদেশে ছ'রকমের মিহি কার্পাসবস্ত্র তৈরি হয়; সাধারণত তা

শিল্প

চওড়ায় দুই এবং লম্বায় উনিশ হাত। এদেশে গুটিপোকার চাষ হয় এবং রেশমের তৈরি কাপড় বোনা হয়।

চর্যাগীতির মধ্যেও কার্পাসের কথা পাওয়া যায়। এক জায়গায় আছে : বাড়ির বাগানে কাপাসফুল ফুটেছে, কী আনন্দ—যেন ঘরের চারপাশ উজ্জ্বল হল, আকাশের অন্ধকার ঘুচে গেল। এ থেকেই বোঝা যায় কার্পাসের কী কদর ছিল। তুলো ধুনবার ছবিও আছে : তুলো ধুনে ধুনে আঁশ তৈরি হচ্ছে, আঁশ ধুনে ধুনে আর কিছু বাকি নেই ; তুলো ধুনে ধুনে শূন্যে ওড়াচ্ছি, আবার তা ছড়িয়ে দিচ্ছি।

প্রাচীন বাংলায় পাটের কাপড়ের শিল্পও ছিল। পূজাপার্বণ, ব্রত, বিবাহ ইত্যাদি উপলক্ষে পট্টবস্ত্র ব্যবহারের রীতি ছিল।

চিনি মারফৎ দেশে প্রচুর অর্থাগম হত বলে মনে হয়। পৌণ্ড্রক আখ থেকে চিনি হত, একথা সুশ্রুত অনেকদিন আগেই বলেছেন। ত্রয়োদশ শতকে বাংলাদেশ থেকে প্রধান রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে মার্কো পোলো চিনির নাম করেছেন। পর্তুগীজ পর্যটক বারবোসার বিবরণ থেকে জানা যায়, ষোড়শ শতকের গোড়াতেও ভারতের বিভিন্ন দেশে, সিংহলে, আরবে, পারস্যে চিনি রপ্তানির ব্যাপারে দক্ষিণ-ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশ পাল্লা দিচ্ছে।

এ ছাড়া কারুশিল্পও কম ছিল না। বড়লোকদের মধ্যে সোনারুপার এবং মণিমুক্তা-বসানো গয়না-গাঁটির খুবই চলন ছিল। রাজারাজড়া ছাড়াও বণিক, সাধু-সওদাগরদের সোনারুপার থালাবাসন ছিল। রামচরিত কাব্যে মণিময় ঘুঙুর, মুক্তা, হীরা ও নানা বিচিত্রবর্ণের পাথর-বসানো অলঙ্কারের উল্লেখ আছে।

লৌহশিল্পের যে খুব প্রচলন ছিল, তাতে সন্দেহ নেই। কারণ কৃষিকর্মে ও কৃষি-সমাজে পদে পদে লোহার দরকার। দা, কুড়াল, খুরপী, খন্তা, লাঙল ছাড়াও লোহার জল-পাত্র, তীর, বর্শা, তরোয়াল ইত্যাদি তৈরি হত। ধারালো এবং মজবুত বলে বাংলাদেশের তরোয়ালের নামডাক অনেক দিন থেকে। ত্রয়োদশ শতকের গোড়ার দিকে একজন চীনা পরিব্রাজক বাংলাদেশে এসে এখানকার দুমুখো ধারালো তরোয়ালের খুব তারিফ করেছেন।

মৃৎশিল্পের যথেষ্ট প্রচলন ছিল। কুম্ভকার-বৃত্তির কেন্দ্র ছিল গ্রাম।

পাহাড়পুরের ধ্বংসাবশেষে, বজ্রযোগিনীর কাছে রামপালে, ত্রিপুরায় ময়নামতীর ভগ্নস্তূপে পোড়ামাটির নানা রকমের থালা, বাটি, জলের পাত্র, রান্নার পাত্র, দোয়াত, প্রদীপ ইত্যাদি পাওয়া গেছে।

হাতীর দাঁতের শিল্পও প্রচলিত ছিল। শ্রীহট্ট জেলার ভাটেরা গ্রামের তাম্রশাসনে রাজবিগা নামে এক দন্তকারের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাছাড়া অন্য একটি লিপিতে হাতীর দাঁতের ডাণ্ডাওয়ালা পাল্কির উল্লেখ আছে।

সূত্রধর বা ছুতোর বলতে প্রাচীন বাংলায় শুধু কাঠমিস্ত্রীকেই বোঝাত না— আমাদের প্রাচীন বাস্তুশাস্ত্রে সূত্রধর বলতে স্থপতি, তক্ষণকার, খোদাইকর, কাঠমিস্ত্রী সবাইকেই বোঝাত।

প্রাচীন বাংলায় গৃহস্থালির জিনিসপত্র, ঘরবাড়ি, মন্দির, পাল্কি, রথ, গরুর গাড়ি, নানা রকমের নদীগামী নৌকো এবং সমুদ্রগামী বড় বড় নৌকো ও জাহাজ ইত্যাদি সমস্তই কাঠ দিয়ে তৈরি হত। আজও যেসব প্রাচীনকালের কাঠের স্তম্ভ, খিলান, খুঁটির স্মৃতিচিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়, তার কারুকার্য ও শিল্পনৈপুণ্য দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়।

সমাজে এইসব কারুশিল্পীদের বিশেষ রকমের খাতির ছিল। দ্বাদশ শতকে রাণক শূলপাণি নামে এক খোদাইকরকে সম্মান করে বলা হয়েছে "বারেন্দ্রক শিল্পীগোষ্ঠীচূড়ামণি।" কুলিক মানে শিল্পী বা কারিগর। শিল্পীগোষ্ঠী বা নিগমের প্রধান প্রতিনিধিকে বলা হত প্রথম-কুলিক। পঞ্চম থেকে অষ্টম শতকের তাম্রশাসনগুলিতে দেখা যায়, জমির দানবিক্রি ব্যাপারে বিষয়পতি বা রাজপ্রতিনিধি রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে যে কয়েকজন গণ্যমান্য লোকের মতামত গ্রহণ করতেন তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন প্রথম কুলিক।

ভাটেরা গ্রামের তাম্রশাসনে গোবিন্দ নামে এক কাংস্যকার বা কাঁসারীর উল্লেখ থেকে কাঁসাশিল্পের আভাস পাওয়া যায়।

নানা রকমের মিশ্র ধাতুশিল্পের প্রমাণ ও পরিচয় পাওয়া যায় অসংখ্য ব্রোঞ্জ ও অষ্টধাতুর তৈরি মূর্তির মধ্যে।

অন্যান্য শিল্পের মত নৌ-শিল্পেরও একটা স্থান ছিল। সাধারণ লোকের যাতায়াত এবং ব্যবসাবাণিজ্য ছাড়াও নৌবহরের ওপর সামরিক শক্তি রীতিমত নির্ভর করত। বিভিন্ন লিপিতে নৌকোর ঘাট এবং জাহাজঘাটার

উল্লেখ পাওয়া যায়। এসব থেকে নদীগামী ছোট বড় নৌকো এবং সমুদ্রগামী পোত ইত্যাদি নির্মাণ-সংক্রান্ত সমৃদ্ধ শিল্প ও ব্যবসার কথা সহজেই আঁচ করা যায়।

যাকে আগে গুবাক বা গুয়া বলা হত, পরে তার নাম সুপারি কেমন করে হল—তার ইতিহাসের মধ্যে প্রাচীন বাংলার ব্যবসাবাণিজ্যের

ব্যবসা-বাণিজ্য

ইতিহাস লুকানো আছে। গৌহাটি শহরের নাম এসেছে গুয়া থেকে। গুয়া কেনাবেচার হাটের নামই গুয়াহাটি বা গৌহাটি। পশ্চিম ভারতের বন্দর শূর্পারক বা সুপ্পারক বা সোপারা থেকে জাহাজ বোঝাই হয়ে গুবাক বা গুয়া আরব-পারস্য প্রভৃতি দেশে যেত। এই সমস্ত দেশের বণিকেরা গুয়াকে সোপারার ফল বলেই জানত এবং তাই থেকে পরে সুপারি নামের উৎপত্তি। কিন্তু পূর্ববাংলার গ্রামের লোকে এখনও সুপারিকে গুয়া বলে থাকে।

এ থেকে বোঝা যায়, প্রাচীন বাংলায় শুধু যে দেশের ভেতরে ব্যবসা-বাণিজ্য হত তা নয়, বিদেশের হাটে-বাজারেও জিনিসপত্র রপ্তানি হত। ব্যবসাবাণিজ্যের মারফত রাষ্ট্রের যথেষ্ট আয় হত। হাটবাজার, বাণিজ্য শুল্ক এবং পারঘাট-খেয়াঘাটের কর ইত্যাদি আদায়ের ভার ছিল একদল রাজকর্মচারীর ওপর। ষষ্ঠ শতকে ব্যবসাবাণিজ্য তদারকের জন্যে এক ধরনের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর উল্লেখ পাওয়া যায়। শহর ছাড়াও গ্রামাঞ্চলের হাটে স্থানীয় উৎপন্ন ও নিত্যব্যবহার্য জিনিসের কেনাবেচা চলত।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে দেখা যায়, বাঙালী বণিকরা দক্ষিণ-ভারতের সমুদ্রোপকূল ধরে গুজরাট পর্যন্ত যে সব বাণিজ্যসম্ভার নিয়ে যেতেন, তার মধ্যে ছিল পান, সুপারি, নারকেল। সুপারির বদলে মাণিক্য, পানের বদলে মরকত এবং নারকেলের বদলে তাঁরা শঙ্খ আনতেন।

মধ্যযুগীয় সাহিত্যে লবণেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। বাঙালী বণিকরা সামুদ্রিক লবণের বিনিময়ে পাথুরে লবণ নিয়ে আসতেন। লবণের ব্যবসাতে যে মোটা লাভ হত, পরে লবণের ব্যবসা নিয়ে কাড়াকাড়ি থেকেই তা বোঝা যায়।

তেজপাতা, পিপুল এবং বস্ত্রের ব্যবসাতেও মোটা লাভ হত। খৃষ্টীয় প্রথম শতকের এক গ্রন্থে পাওয়া যায়, রোম সাম্রাজ্যে আধসের পিপুলের দাম ছিল ১৫ দিনার বা পনেরোটি স্বর্ণমুদ্রা। এই সময় পশ্চিমের বণিকরা

ভারতবর্ষ থেকে বছরে প্রায় এক লক্ষ মুদ্রার রেশম ও কার্পাসের কাপড় নিয়ে যেত। এই অর্থের একটা মোটা অংশ বাংলায় আসত।

গুজরাট থেকে গৌড়ে কিংবা বারাণসী থেকে পুণ্ড্রবর্ধনে স্থলপথেই বাণিজ্য হত। একদিকে উত্তর রাঢ় ও পুণ্ড্রবর্ধন এবং অন্যদিকে সমতট ও তাম্রলিপ্তির সঙ্গে কামরূপের যোগাযোগের যে রাস্তা ছিল, সেই রাস্তা দিয়েই বণিকের দল আনাগোনা করত। তবে স্থলপথের চেয়ে বাংলাদেশে নৌ-বাণিজ্যই প্রধান ও প্রশস্ততর ছিল। সেই কারণেই বাংলার প্রাচীন লিপি ও সাহিত্যে নৌকোর ঘাট এবং নদ-নদী-নৌকোর স্মৃতি এত প্রবল।

সামুদ্রিক বাণিজ্যের প্রধান বন্দর ছিল গঙ্গাবন্দর ও তাম্রলিপ্তি। চতুর্থ শতকে সিংহলের সঙ্গে তাম্রলিপ্তির বাণিজ্যপথের আভাস পাওয়া যায়। তারও তিন চারশো বছর আগে ভারতের দক্ষিণ-সমুদ্রতীর ধরে গঙ্গাবন্দর ও তাম্রলিপ্তির সঙ্গে সুদূর রোম সাম্রাজ্যের বাণিজ্য-সম্বন্ধের আভাস পাওয়া যায়।

ব্রহ্মদেশ ও যবদ্বীপ, সুবর্ণদ্বীপ ও পূর্বদক্ষিণে বৃহত্তর ভারতের দ্বীপগুলির সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্য-সম্বন্ধ যে ছিল, অর অন্তত একটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়। মালয়ের একটি প্রাচীন বৌদ্ধ মন্দিরের ধ্বংসস্তূপে পঞ্চম শতকের একটি লিপিতে রক্তমৃত্তিকাবাসী মহানাবিক বুদ্ধগুপ্তের নাম পাওয়া যায়। লিপিটির ভাষা শুদ্ধ সংস্কৃত; তার মধ্যে ভারতীয় ধর্ম-প্রেরণার পরিচয় পাওয়া যায়। বুদ্ধগুপ্ত নামটি বিশেষ করে ভারতীয়। রক্তমৃত্তিকা বা রাঙামাটি হয় কর্ণসুবর্ণে, না হয় চট্টগ্রামে। কাজেই বুদ্ধগুপ্ত নিশ্চয়ই বাঙালী ছিলেন এবং যতদূর মনে হয় তিনি তাম্রলিপ্তি বন্দর থেকে যাত্রা করেছিলেন।

এই দেশবিদেশজোড়া বাণিজ্য থেকে প্রচুর অর্থাগম হত, তাতে সন্দেহ নেই। বিদেশের বাজারে জিনিসপত্র বেচে প্রচুর স্বর্ণমুদ্রা দিনার এবং রৌপ্য-মুদ্রা দ্রম্ম এদেশে আসত। দাম কথাটা 'দ্রম্ম' থেকেই এসেছে।

এ ছাড়া জিনিস দিয়ে জিনিস নেওয়ার ব্যবস্থাও প্রচলিত ছিল। তবে এই বিনিময় বাণিজ্য যে সাধারণ নিয়ম ছিল না তা খৃষ্টজন্মের আগে থেকেই প্রমাণিত হয়।

ব্যবসাবাণিজ্য করে বণিক, ব্যাপারী আর শ্রেষ্ঠীদের হাতে প্রচুর অর্থাগম হত, তাতে সন্দেহ নেই। বণিকদের মধ্যে ধনপতি, হীরামাণিক, দুলালধন

ইত্যাদি নাম থেকেও তা বোঝা যায়। অর্থের জোরেই এই বণিক ও শ্রেষ্ঠীর দল রাষ্ট্রে ও সমাজে নিজেদের প্রভাব-প্রতিপত্তি খাটাত। বর্তমান হুগলী জেলার ভুরশুট গ্রামে প্রাচীন বাংলার শ্রেষ্ঠীদের খুব বড় একটা ঘাঁটি ছিল। ভূরশুটের প্রাচীন নাম ভূরিশ্রেষ্ঠিক।

মুদ্রা

সমাজের গোড়ার অবস্থায় সোজাসুজি জিনিসের বদলে জিনিস দিয়ে লেনদেন হত। এটা খুব পিছিয়ে-পড়া সমাজের লক্ষণ। সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ লেনদেনের সুবিধার জন্যে মুদ্রার ব্যবহার শিখেছে। বাংলাদেশে মুদ্রার ব্যবহার দেখা যায় খৃষ্টজন্মের আগে থেকেই। খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় থেকে দ্বিতীয় শতকের মধ্যে বাংলাদেশে 'গণ্ডক' নামে এক রকম মুদ্রার প্রচলন ছিল। এই মুদ্রা সোনার কি রুপার তা জানা যায় না। 'কাকনিক' নামে আরেক রকম মুদ্রারও উল্লেখ পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় প্রথম শতকে গঙ্গা-বন্দরে 'ক্যাল্‌টিস্‌' নামে এক রকম মুদ্রার প্রচলন ছিল। অনেকে মনে করেন সংস্কৃত 'কলিত'কে গ্রীক ঐতিহাসিকরা ক্যাল্‌টিস নাম দিয়েছেন। বোধহয় এরও আগে এক ধরনের নানা চিহ্ন আঁকা রুপার ও তামার মুদ্রা ব্যাপকভাবে বাংলাদেশে চলত। চব্বিশ পরগণার জাক্রা এবং বেড়াচাঁপা, রাজসাহীর ফেট্‌গ্রাম, মৈমনসিংহের ভৈরববাজার, মেদিনীপুরের তমলুক, ঢাকার উয়াড়ি প্রভৃতি জায়গায় ঐ ধরনের বিস্তর মুদ্রা পাওয়া গেছে। এইসব মুদ্রার সঙ্গে ভারতবর্ষের নানা জায়গায় পাওয়া এই জাতীয় মুদ্রার ঘনিষ্ঠ মিল খুঁজে পাওয়া যায়। খুব সম্ভবত তার কারণ এই যে, বাংলার সঙ্গে সারা ভারতের সাধারণ অর্থনৈতিক জীবনের একটা যোগ ছিল। তখনও কুষাণ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত না হলেও বাংলাদেশে কুষাণ আমলের দুচারটি স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গেছে। ক্বচিৎ কখনও ব্যবসায়ী বণিকদের হাতে হাতে কিংবা অন্য কোন উপায়ে এইসব মুদ্রা বাংলায় এসেছে।

গুপ্ত আমলে বাংলাদেশে যেমন সোনার, তেমনি রুপার মুদ্রাও প্রচলিত ছিল। পঞ্চম থেকে সপ্তম শতক পর্যন্ত দিনার ছিল স্বর্ণমুদ্রা ও রুপক ছিল রৌপ্যমুদ্রা। তাছাড়া তামার মুদ্রাও ছিল। মুদ্রার নিম্নতম নাম ছিল কড়ি। রাজরাজড়ারা কড়ি দান করতেন। লক্ষ্মণ সেনের নিম্নতম দান ছিল এক লক্ষ কড়ি। অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে কলকাতা শহরে কড়ি দিয়ে কর আদায় হত। উনবিংশ শতক পর্যন্ত কড়ির প্রচলন দেখা যায়।

সপ্তম শতকের পর থেকেই স্বর্ণমুদ্রা একেবারে উধাও হয়ে যায়। অষ্টম

শতকের মাঝামাঝি পাল রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবার পর নতুন করে রুপার মুদ্রার প্রচলন দেখা গেল ; কিন্তু স্বর্ণমুদ্রা আর ফিরে এল না। রুপার যে দ্রম্ম মুদ্রার প্রচলন হল, তা আসল দাম ও বাইরের চেহারা দুদিক থেকেই খুব খেলো।

তারপর সেন আমলে রুপার মুদ্রাও উধাও হয়ে গেল। এমন কি তামার মুদ্রাও আর দেখা গেল না। সেন আমলে মুদ্রা হিসেবে কড়িই হল সর্বেসর্বা।

প্রথম স্তরে স্বর্ণমুদ্রার ওজন ও নিকষমূল্য ক্রমশ কমেছে ; দ্বিতীয় স্তরে স্বর্ণমুদ্রা নকল ও জাল হয়েছে ; তৃতীয় স্তরে রুপার মুদ্রা স্বর্ণমুদ্রাকে হটিয়ে দিয়েছে ; চতুর্থ স্তরে রুপার মূদ্রা ক্রমেই খেলো হয়েছে ; শেষ পর্যন্ত রুপার মুদ্রাও একেবারে উধাও হয়েছে।

এইভাবে সোনা ও রুপার মুদ্রা খেলো হতে হতে পরে একেবারে উধাও হয়ে যাবার কারণ আজও সঠিকভাবে জানা যায়নি। তবে গুপ্ত আমলের পর থেকেই বাংলাদেশে একটা টালমাটাল অবস্থার সৃষ্টি হয়। শশাঙ্কের আমলেই প্রতিবেশী রাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহ চলছিল। তারপর তো পুরো একশো বছর ধরে বাংলাদেশে একটানা অরাজক অবস্থা। এর ফলে দেশের ভেতরে ও বাইরে ব্যবসাবাণিজ্য বড় রকমের ঘা খায়। দেশের অর্থ নৈতিক জীবনের ভিৎ পর্যন্ত নড়ে যায়।

পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকে দেখা যায়, উত্তর ও দক্ষিণ বঙ্গের গ্রামের সাধারণ গৃহস্থেরা স্বর্ণমুদ্রার সাহায্যে জমি কেনাবেচা করছে। এ থেকে বোঝা যায় যে, বৈদেশিক ব্যবসা-বাণিজ্যের ফলে শুধু যে বণিক-ব্যবসাদাররাই ধনদৌলতের অধিকারী হয়েছিল তা নয়, বিদেশের বাজারে চাহিদা ছিল বলে বস্ত্র ও গন্ধশিল্প, দন্ত ও কাষ্ঠশিল্প এবং কোন কোন কৃষিজাত জিনিসের উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত সাধারণ লোকও তার কিছুটা ভাগ পেয়েছিল। কিন্তু অষ্টম শতকের গোড়া থেকেই পূর্ব-ভূমধ্যসাগর থেকে আরম্ভ করে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত বৈদেশিক সামুদ্রিক ব্যবসাবাণিজ্য আরব ও পারসিক বণিকদের হাতে চলে যেতে আরম্ভ করে। পশ্চিম-ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের অন্যতম আশ্রয় সিন্ধুদেশ আরব বণিকের দখলে চলে গেল। রোম সাম্রাজ্যের ধ্বংসের ফলে ভূমধ্যসাগরীয় ভূখণ্ডে ভারতীয় শিল্প ও গন্ধদ্রব্যের চাহিদাও গেল কমে। পূর্ব-ভারতে তাম্রলিপ্তি বন্দরও একাধিক কারণে বন্ধ হয়ে গেল।

এরপর পাঁচ ছশো বছর ধরে সামুদ্রিক বাণিজ্যে বাংলাদেশের তেমন

কোন স্থান নেই। কাজেই বাইরে থেকে সোনারুপার আমদানিও কম। স্বর্ণমুদ্রার অবনতির ভেতর দিয়ে এই দৈন্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

ব্যবসা-বাণিজ্যের অবনতির ফলে শিল্পপ্রচেষ্টারও কিছুটা অবনতি ঘটল। পালরাজাদের আমলে স্থলপথে কাশ্মীর, তিব্বত, নেপাল, সিকিম, ভুটানের সঙ্গে বাণিজ্য-সম্বন্ধ গড়ে তোলার চেষ্টা হল; এমন কি ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, চম্পা, কম্বোজ, যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ সুবর্ণদ্বীপের সঙ্গেও ব্যবসাবাণিজ্য করার চেষ্টা হল। কিন্তু তা যথেষ্ট সার্থক হতে পারেনি। ফলে, কৃষির ওপর নির্ভরতা বাড়তে বাড়তে পাল আমলের শেষের দিকে এবং সেন আমলে বাংলাদেশ পুরোপুরি কৃষিনির্ভর ও ভূমিনির্ভর অচল অনড় গ্রাম্যসমাজে পরিণত হল।

এই ঐকান্তিক ভূমি ও কৃষিনির্ভরতার ফলে গ্রাম্যজীবন সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে বাঁধা পড়ল। রোজকার জীবনে যা নেহাৎ দরকার, তা গ্রামের মধ্যেই পাওয়া যায়; তার জন্যে বাইরে যাবার দরকার হয় না। ফলে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত হল না; নিচু স্তরেই থেকে গেল। শিল্প ও ব্যবসাবাণিজ্যের মারফৎ বাইরের মানুষের সংস্পর্শে এসে সংগ্রামময় বহুমুখী অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে দুর্বার গতিতে সমৃদ্ধির পথে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবার সুযোগ ছিল; কিন্তু অষ্টম শতকের পর বাংলাদেশের সে সুযোগ আর থাকল না। সমাজের এই পিছিয়ে পড়ার জের আজও আমরা টেনে চলেছি।

মাটির টান

মাঝের কয়েকশো বছর বাদ দিলে প্রাচীন বাঙালীর জীবন বরাবরই মাটির টানে বাঁধা। চাষবাসই ছিল মানুষের খেয়ে পরে বাঁচবার প্রধান উপায়; ছোটখাট শিল্প যাদের পেশা ছিল, তাদেরও কতকটা চাষবাসের ওপরই নির্ভর করতে হত। চাষের জমিকে ঘিরেই গ্রাম গড়ে উঠেছে; এককে টুকরো অনড়, অচল জমি নিয়ে স্থির, দৃঢ়বদ্ধ একেকটি গোষ্ঠী ও পরিবারের পত্তন হয়েছে। তীর্থভ্রমণ, শিক্ষা-দীক্ষা, ধর্মপ্রচার এবং ব্যবসাবাণিজ্য ছাড়া আর কিছুর জন্যেই গ্রামের মাটি ছেড়ে যাবার দরকার নেই।

জমি

কৃষিনির্ভর প্রাচীন সমাজের ইতিহাস জানতে গেলে তাই আগে ভূমি-ব্যবস্থার ইতিহাস জানা দরকার। কারণ, শ্রেণীবিন্যাস, সমাজ ও রাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক, জমির দায় ও অধিকার—এ সব কিছুই ভূমি-ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করে।

অষ্টম শতকের আগে পর্যন্ত প্রধানত তিন রকমের জমির কথা জানা যায়—বাস্তু, ক্ষেত্র ও খিলক্ষেত্র। যেখানে লোকে ঘরবাড়ি তুলে বাস করে, তা বাস্তুজমি। যে জমিতে চাষ করা যায় এবং চাষ কবা হচ্ছে, তাকে বলা হত ক্ষেত্রভূমি। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকে ক্ষেত্রভূমির অন্য নাম ছিল 'নালভূ'। এখনও এই অর্থে আমরা নালজমি কথাটা ব্যবহার করে থাকি। যে জমিতে চাষ করা যায়, কিন্তু চাষ না করে ফেলে রাখা হয়েছে, তাকে বলা হত খিলক্ষেত্র। যে জমি চাষের অযোগ্য, প্রাচীন লিপিতে তাকে শুধুমাত্র খিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ ছাড়া আরও অনেক রকমের জমির উল্লেখ আছে। যে নালা বা নিচু জমির ওপর দিয়ে জল নিকাশ হত তাকে বলা হত তল। বাটক বলতে চলাচলের রাস্তা বোঝানো হত। উদ্দেশ বলতে বোঝাত বাঁধ, ঢিপি, জমির আল ইত্যাদি উঁচু জায়গা। জোলা, জোলক, জোটিকা বলতে বোঝাত সরু খাল, যার ভেতর দিয়ে বিল, পুকুর, গ্রাম ইত্যাদির জল চলাচল করে। খাট,

খাটো, খাটিকা, খাড়ি, খাড়িকার অর্থ খাল। যানিকা, স্রোতিকা, গঙ্গিনিকাও ঐ অর্থে ব্যবহৃত হত। হজ্জিকার অর্থ নিম্ন জলাভূমি। হট্ট, হট্টিকার অর্থ হাটবাজার, ঘট্ট অর্থে ঘাট; পারঘাটকে বলা হত তর। এঁদো ডোবাকে বলা হত গর্ত। চাষের অযোগ্য অনুর্বর উঁচু জমিকে বলা হত উষর। যে জমিতে গরুমোষ চরে বেড়ায়, তা গোমার্গ, গোবাট, গোপথ, গোচর। গোচরভূমি থাকত গ্রামের ঠিক বাইরে; বহুকাল থেকেই এটা ছিল গ্রামবাসীদের সাধারণ সম্পত্তি। বন, অরণ্য ছিল গ্রামের বাইরে। জনপদের লোক চলাচল ও যানবাহন চলাচলের পথকে বলা হত মার্গ, বাট। আবর্জনা-স্থান ছিল আঁস্তাকুড়।

গোড়ার যুগে সহজেই জমি পাওয়া যেত বলে জমির মাপের তেমন চুলচেরা বিচার ছিল না। কতখানি জমিতে মোটামুটি কতখানি বীজধান লাগে, তাই দিয়েই জমির মোটামুটি মাপ ঠিক করা হত। যে জমিতে বীজ বোনা হয় তাকে বলা হত বাপক্ষেত্র। একটি কুলায় যত ধান বা শস্য ধরে, তার বীজ যতটা পরিমাণ জমিতে বোনা হত, তাকে বলা হত এক কুল্যবাপ জমি। কুল্যবাপ, দ্রোণবাপ, আঢ়বাপ—এ সমস্তই ধান রাখবার বিভিন্ন পাত্রের মাপের সঙ্গে জড়িত। কিন্তু সে যাই হোক, জমি মাপবার মাপকাঠি ছিল নল। এই নলের দৈর্ঘ্য হত কোন ব্যক্তিবিশেষের হাতের মাপের সমান। অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত এই কায়দায় জমি মাপা হত। রাজসাহীর নাটোর অঞ্চলে সেদিন পর্যন্ত রামজীবনী হাতের মাপ প্রচলিত ছিল। ষষ্ঠ ও অষ্টম শতকে পাটক নামে একটি নতুন মানের উল্লেখ পাওয়া যায়। পাটক বলতে গ্রাম বা গ্রামাংশও বোঝাত। বাংলা পাড়া শব্দটি পাটক থেকেই এসেছে বলে মনে হয়। সেন আমলেই প্রথম ভূমিমান ও শস্যমানের সঙ্গে মুদ্রামান ও তুলামান জুড়ে দিতে দেখা যায়। কারণ, জমির চাহিদা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে মাপজোখ ভাল করে বেঁধে দেওয়া দরকার; ঢিলেঢালা মাপে আর চলছিল না। সেইসঙ্গে মুদ্রামান ও তুলামানের সাহায্যে ক্রমে আরও নিচের দিকের মাপ ঠিক করারও দরকার হল।

জমির দাম সব অঞ্চলে সমান ছিল না। জমির ফলন, চাহিদা এবং লোকের আর্থিক সামর্থ্য অনুযায়ী দামের বেশকম হত। এখনকার টাকায় এক কুল্যবাপ জমির দাম পঞ্চনগরী বিষয়ে অন্তত ১৯২৲ টাকা, কোটিবর্ষ

সংখ্যা যেমন যেমন বাড়তে লাগল, কৃষিবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে জমির চাহিদাও সমানে বাড়তে লাগল, জমি নিয়ে ঝগড়াদ্বন্দ্বও বেড়ে গেল। এদিকে রাজা আর রাষ্ট্রযন্ত্রের সঙ্গে সমাজযন্ত্রের একটা ঘনিষ্ঠ যোগ প্রতিষ্ঠিত হল। সমাজের রক্ষক এবং পালক হলেন রাজা। শান্তিরক্ষার মূল দায়িত্ব তাঁর, সমস্ত বিবাদ-বিসম্বাদের মূল মীমাংসাকর্তা তিনি, সমস্ত ক্ষমতা, দায়িত্ব ও অধিকারের মূল উৎস তিনি। একথা মেনে নেবার সঙ্গে সঙ্গে রাজা হলেন জমির ওপর অধিকারের মূল উৎস; জমি সম্পর্কিত বাদবিসম্বাদের চূড়ান্ত মীমাংসা তাঁরই হাতে। তখনও কিন্তু জমির মূল অধিকারী কে এ নিয়ে প্রশ্ন ওঠেনি। কিন্তু তার পর থেকেই লোকের মধ্যে এই ধারণা গড়ে উঠতে লাগল যে, রাজা ও রাষ্ট্র শুধু ভূমিব্যবস্থার নিয়ামক নয়, দেশের ভূসম্পত্তির মালিকও।

লোকের এই ধারণার পেছনে একটি কারণ ছিল এই যে, সেচ-ব্যবস্থায় রাজা বা রাষ্ট্রের দায়িত্ব ছিল। আমাদের দেশে প্রচুর নদনদী থাকলেও বৃষ্টির ওপর কৃষিকাজ অনেকখানি নির্ভর করে। তার জন্যে রাষ্ট্রের চেষ্টায় দেশের নানা জায়গায় খালনালা, বড় বড় পুকুর কাটতে হয়েছে, বন্যা ঠেকাতে বাঁধ বাঁধতে হয়েছে। এইসব বড় বড় দীঘি বা বাঁধের সঙ্গে রাজারাজড়াদের নাম জুড়ে আছে। মৌর্য যুগে ও তার পরে অর্থশাস্ত্র ও স্মৃতিশাস্ত্রের লেখকেরা দেখাতে চেষ্টা করলেন—রাজা ও রাষ্ট্রই হল ভূসম্পত্তির আসল মালিক। গুপ্ত আমলে দেখা যায়, রাজা ও রাষ্ট্র শুধু ভূমিস্বত্বেরই অধিকারী নয়, জমির আসল অধিকারীও বটে। ভূসম্পত্তির ওপর ব্যক্তিগত মালিকানাও ছিল। কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পত্তি হলেও কোন লোক যে-কোন শর্তে যে-কোন ক্রেতার কাছে জমি বিক্রি করতে পারত না। দানও করতে পারত না। যে জমি কিনতে চাইত বা দান হিসেবে পেতে চাইত, তাকে রাষ্ট্রের কাছে ও স্থানীয় প্রধান প্রধান লোকদের কাছে আবেদন করতে হত। তাঁরাই বিক্রি ও দানের ব্যবস্থা করতেন। জমিতে অধিকার নেই এমন চাষী-প্রজাও যে ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

এছাড়াও প্রাচীন সাক্ষ্যপ্রমাণ থেকে জমি-সম্পর্কিত কয়েকটি খুব দরকারী খবর পাওয়া যায়।

(১) রাজা তার ইচ্ছামত বা প্রয়োজনমত যে-কোন ব্যক্তিগত সম্পত্তি কেড়ে নিতে পারতেন। (২) মেয়েরাও ব্যক্তিগত সম্পত্তি ভোগ করতে

পারত। (৩) মধ্য স্বত্বাধিকারীর নিচে নিম্নাধিকারী প্রজার একটি স্তর ছিল। (৪) ব্যক্তিগত অধিকারের জমি হস্তান্তরিত হত—দান হিসেবেই হোক আর বিক্রির দরুনই হোক। (৫) একাধিক ব্যক্তি ব্যক্তিগতভাবে একই ভূখণ্ডের অধিকারী হতে পারত।

বর্ণ

উত্তর-ভারতীয় আর্যভাষাভাষীরা অষ্ট্রিক ও দ্রবিড়ভাষাভাষী কৃষি ও শিকারজীবী গৃহ ও অরণ্যচারী আদিবাসী কোমদের বলত 'ম্লেচ্ছ', 'দস্যু', 'পাপ'; তাদের ভাষাকে বলত 'অসুর' ভাষা। কিন্তু এই ঘৃণার ভাব বেশিদিন টেঁকেনি; নানা বিরোধ ও সংঘাতের ভেতর দিয়ে এইসব কোমের লোকদের সঙ্গে আর্যভাষাভাষী লোকদের মেলামেশা হচ্ছিল। শত শত বছর ধরে এই বিরোধ ও সংঘর্ষ চলেছে। বাংলাদেশে আর্য-ব্রাহ্মণ্য সংস্কার ও সংস্কৃতির ছোঁয়াচ লেগেছে সকলের পরে; তাছাড়া, এখনকার আর্যপূর্ব কোমদের নিজস্ব সংস্কার ও সংস্কৃতিবোধ গভীর ও ব্যাপক ছিল। ফলে, গুপ্ত আমলে আর্য-ব্রাহ্মণ্য রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে ব্রাহ্মণ্য বর্ণ-বিন্যাস, ধর্ম, সংস্কার ও সংস্কৃতি এদেশে তেমন স্বীকৃতি পায়নি। একাদশ-দ্বাদশ শতক নাগাদ বর্ণ-সমাজের উচ্চ স্তরে আর্যপূর্ব লোক-সংস্কৃতির পরাজয় সম্পূর্ণ হলেও আজ বাঙালী সমাজের অন্দরমহলে এবং একান্ত নিম্নস্তরে তার প্রভাব টিঁকে আছে; দৈনন্দিন জীবনে, ধর্মে, লোকাচারে, ব্যবহারিক আদর্শে, ভাবনা-কল্পনায় আজও সেই আর্যপূর্ব সমাজের বিচিত্র স্মৃতি ও অভ্যাস সুস্পষ্ট।

বহু শতাব্দীর বিরোধ ও সংঘর্ষের ভেতর দিয়ে আস্তে আস্তে এইসব 'দস্যু' ও 'ম্লেচ্ছ' কোম আর্য-সমাজ ব্যবস্থায় কিছুটা ঠাঁই পেতে আরম্ভ করে। এইসব কোমের মধ্যে বিবাহ, আহার-বিহারগত, ধর্ম ও আচারগত যেসব বিধিনিষেধ ছিল, অনেকাংশে সেই সব বিধিনিষেধকে আশ্রয় করেই পরে আর্য-ব্রাহ্মণ্য বর্ণ-বিন্যাসের ভিৎ গড়ে উঠেছে। ভারতীয় বর্ণ-বিন্যাস আর্য-পূর্ব ও আর্য-ব্রাহ্মণ্য সংস্কার ও সংস্কৃতির সমন্বিত প্রকাশ।

বাংলাদেশের অধিকাংশ জনপদ গুপ্ত-সাম্রাজ্যের দখলে আসার সঙ্গে সঙ্গে বাঙালী সমাজ উত্তর-ভারতীয় আর্য-ব্রাহ্মণ্য বর্ণ-ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হতে আরম্ভ করে। পঞ্চম শতকে দেখা যায়, উত্তরবঙ্গে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম স্বীকৃতি লাভ করেছে। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের দেবদেবীর পুজো করা হচ্ছে, ব্রাহ্মণদের বসবাস ক্রমেই বাড়ছে, অব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণদের জমি দিচ্ছে,

অযোধ্যাবাসী ভিন্‌-প্রদেশী এসেও এদেশে মন্দির-সংস্কারের জন্যে জমি কিনছে। উত্তর-পূর্ব বাংলায় ষষ্ঠ শতকের গোড়াতেই পুরোদস্তর ব্রাহ্মণ-সমাজ গড়ে ওঠে। প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণদের পদবী ছিল শর্মা বা স্বামী ; তাছাড়া বন্দ্য, চট্ট, ভট্ট, প্রভৃতি 'গাঞি' পরিচয়ও ছিল। পঞ্চম থেকে অষ্টম শতকের মধ্যে, ব্যক্তি ও জায়গার সংস্কৃত নাম যে পাওয়া যায়, তাতে দেখা যায় আর্যীকরণ দ্রুত এগিয়ে চলেছে।

এই যুগে কায়স্থ নামে এক শ্রেণীর রাজকর্মচারীর খবর পাওয়া যায়। করণ বলতেও কায়স্থদের মতই এক শ্রেণীর রাজকর্মচারীদের বোঝাত। করণ কথার মূল অর্থ খোদাইযন্ত্র, কাটবার যন্ত্র। এই অর্থে আজও 'করণি' কথাটির ব্যবহার হয়। ইতিহাসের গোড়ার দিকে খুব সম্ভব নরুণ জাতীয় কোন খোদাইযন্ত্র দিয়ে লেখার কাজ হত। তা থেকেই পরে হয়ত লেখকমাত্রেই 'করণ' নামেই পরিচিত হতেন। যাই হোক, করণ বা কায়স্থ পঞ্চম থেকে অষ্টম শতকের মধ্যে কোন বর্ণ বা উপবর্ণ নয় ; এই দুটি শব্দই ছিল মোটামুটি বৃত্তিবাচক।

বাংলার বর্ণবিন্যাস ব্রাহ্মণ এবং শূদ্রবর্ণ ও অন্ত্যজ-ম্লেচ্ছদের নিয়ে গঠিত। করণ-কায়স্থ, অম্বষ্ঠ-বৈদ্য এবং অন্যান্য সংকর বর্ণ সমস্তই শূদ্র-পর্যায়ে ; সবার নিচে অন্ত্যজ বর্ণের লোকেরা। দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে খুব সুস্পষ্টভাবে দেখা না দিলেও তার মোটামুটি কাঠামো এই যুগেই গড়ে উঠেছিল। তিনটি দ্বিজবর্ণের মধ্যে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণদেরই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত এই যুগে পাওয়া যায়। অন্যান্যেরা বিভিন্ন বৃত্তি অবলম্বন করে বিভিন্ন শূদ্র উপবর্ণ গড়ে তুলেছিলেন। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবর্ণের কোন হদিশই পাওয়া যায় না। বাংলাদেশে কোন কালেই ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সুনির্দিষ্ট বর্ণ হিসেবে গঠিত বা স্বীকৃত হয়েছে বলে মনে হয় না।

নবম-দশম শতক নাগাদ বাংলাদেশে পাল আমলে করণ-কায়স্থেরা বর্ণ হিসেবে গড়ে উঠেছিলেন। এই সময় থেকে করণ ও কায়স্থ সমার্থক হয়ে দাঁড়ায়। বাংলাদেশে করণেরা ক্রমে কায়স্থ নামের মধ্যেই বিলীন হয়ে যায়। একাদশ-দ্বাদশ শতকের আগে পর্যন্ত বৈদ্য ছিল বৃত্তিবাচক শব্দ ; কিন্তু এই সময় থেকে বৈদ্যবৃত্তিধারীরা বৈদ্য উপবর্ণ হিসেবে গড়ে ওঠেন। পাল আমলে কৈবর্তদের প্রথম ঐতিহাসিক উল্লেখ পাওয়া যায়। বরেন্দ্রী কিছুকাল দিব্য, রুদোক ও ভীম এই তিন কৈবর্ত রাজার অধীন হয়েছিল। সে সময়ে উত্তরবঙ্গ সমাজে কৈবর্তদের সামাজিক প্রভাব-প্রতিপত্তি, জনবল ও

পরাক্রম যথেষ্ট ছিল। কৈবর্তেরা ছিলেন কোন আর্যপূর্ব কোম বা গোষ্ঠী; ক্রমে তাঁরা আর্য-সমাজেই নিচের দিকে স্থান পান। পাল আমলে সমাজে কৈবর্তদের বৃত্তি বা স্থান কোনটাই নিন্দনীয় ছিল না। এই সময়ে সমাজের একেবারে নিচের কোঠায় ছিল চণ্ডাল, মেদ ও অন্ধ্র। অন্ধ্রেরা সম্ভবত জীবিকার জন্যে নিজের দেশ ছেড়ে এসে বাংলার বাসিন্দা হয়ে গিয়েছিলেন এবং সামাজিক দৃষ্টিতে ঘৃণ্য কোন কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। এ ছাড়াও আর যেসব নিচু জাতের খবর পাওয়া যায়, তার মধ্যে ছিল ডোম বা ডোম্ব, শবর ও কাপালি। ডোমেরা সাধারণত নগরের বাইরে কুঁড়ে বেঁধে থাকতেন, বাঁশের তাঁত ও চাঙাড়ি তৈরি করে বিক্রি করতেন এবং ব্রাহ্মণদের কাছে তাঁরা ছিলেন অচ্ছুৎ। ডোম মেয়ে-পুরুষেরা নাচগানে খুব পটু ছিলেন। কাপালিকদের লজ্জাঘৃণার বালাই ছিল না; গলায় হাড়ের মালা, পরনে আর প্রায় কিছুই থাকত না। শবরেরা থাকতেন পাহাড়ে জঙ্গলে, পরনে থাকত তাঁদের ময়ূরের পাখ্, গলায় গুঞ্জা বীচির মালা, কানে বজ্রকুণ্ডল। শবরী রাগ নামে তাঁদের গানের একটা বিশিষ্ট রীতি ছিল।

পাল-চন্দ্র-কম্বোজ রাজারা বৌদ্ধ হলেও তাঁদের প্রত্যেকেরই সমাজাদর্শ ছিল একান্তই ব্রাহ্মণ্য সংস্কার ও আদর্শ অনুযায়ী। সপ্তম শতকের মাঝামাঝি থেকে অষ্টম শতকের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে দেখা যায় ব্রাহ্মণদের আস্তানা সমুদ্রতীর পর্যন্ত ছেয়ে ফেলেছে। বৌদ্ধ মঠগুলি জীর্ণ হয়ে পড়েছে। লোকে তার ইটকাঠ খুলে নিয়ে ঘরবাড়ি তৈরি করছিল। ছোট বড় ভূস্বামীরাও তখন অনেকে ব্রাহ্মণ। বৌদ্ধ পালরাষ্ট্রে ব্রাহ্মণ্য সমাজ ও বর্ণব্যবস্থা পুরোপুরি স্বীকৃত হয়েছিল। চন্দ্র ও কম্বোজ রাষ্ট্রেও একই জিনিস দেখা যায়। এই দুই রাষ্ট্রেই ঋত্বিক, ধর্মজ্ঞ, পুরোহিত, শান্তিবারিক প্রভৃতি ব্রাহ্মণদের রাজপুরুষ হিসেবে দেখা যায়। সমাজব্যবস্থার ব্যাপারে বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণে কোনই তফাত থাকল না। গৃহী বৌদ্ধেরা সাংসারিক ক্রিয়াকর্মে প্রচলিত বর্ণশাসন মেনেই চলতেন।

পাল-চন্দ্র রাষ্ট্রে ও তাঁদের সময়ে ব্রাহ্মণ্য বর্ণবিন্যাসের আদর্শ ছিল যেমন উদার, তেমনি নমনীয়। কম্বোজ-সেন-বর্মণ আমলে সেন-বর্মণ রাষ্ট্রের সক্রিয় সচেতন চেষ্টার ফলে সেই আদর্শ হল সুদৃঢ়, অনমনীয় ও সুনির্দিষ্ট। এইভাবে দেড়শো বছরে প্রায় হাজার বছরের বাংলাদেশকে ভেঙে নতুন করে ঢেলে

সাজার পাকাপোক্ত ব্যবস্থা হল। পালবংশের জায়গায় এল সেন বংশ, চন্দ্র বংশের জায়গায় বর্মণ বংশ। দুটি বাঙালী বৌদ্ধ রাজবংশের বদলে এল এমন দুটি ভিন্-প্রদেশী রাজবংশ, যারা অত্যন্ত নৈষ্ঠিক ও গোঁড়া ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, সংস্কার ও সংস্কৃতির ধারক ও পোষক। দেখতে দেখতে বাংলাদেশে যাগযজ্ঞের ধুম পড়ে গেল; নদনদীর ঘাটে ঘাটে শোনা গেল বিচিত্র পুণ্যস্নানার্থীদের মন্ত্রগুঞ্জরণ; ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর পূজা, বিভিন্ন পৌরাণিক ব্রতানুষ্ঠান দ্রুত বেড়ে গেল। বাঙালীর দৈনন্দিন ক্রিয়াকর্ম, বিবাহ, জন্ম, মৃত্যু, শ্রাদ্ধ, পারস্পরিক আহার-বিহার, বিভিন্ন বর্ণের নানান স্তর উপস্তর বিভাগের সীমা উপসীমা—এক কথায়, সমস্ত রকম সমাজকর্মের রীতিপদ্ধতি ব্রাহ্মণ্য নিয়ম অনুযায়ী বেঁধে দেওয়া হল। পাল আমলের শেষের দিকে মাত্র অঙ্কুর দেখা গিয়েছিল; বর্মণ রাষ্ট্রকে অবলম্বন করে ব্রাহ্মণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা বাংলাদেশে ডালপালা ছড়াতে আরম্ভ করল।

পাল আমলে বৌদ্ধ দেবদেবীরা কিছু কিছু ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীদের সঙ্গে মিলেমিশে যাচ্ছিলেন, আবার ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীরাও বৌদ্ধ ও শৈবতন্ত্রে স্থান পাচ্ছিলেন। তাছাড়া বৌদ্ধ তান্ত্রিক মতের প্রভাবও কিছুটা ব্রাহ্মণ্য পূজানুষ্ঠানে এসে পড়েছিল। বর্মণ ও সেন আমলে ব্রাহ্মণ্য সমাজ তাই স্মৃতি ও ব্যবহারগ্রন্থ রচনা ক'রে আত্মসংরক্ষণ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার কাজে কোমর বেঁধে লাগল। দন্তধাবন, আচমন, স্নান, সন্ধ্যা, তর্পণ, আহ্নিক, যাগযজ্ঞ, হোম, পূজানুষ্ঠান, ক্রিয়াকর্মের শুভাশুভ কাল বিচার, অশৌচ, আচার, প্রায়শ্চিত্ত, বিচিত্র অপরাধ ও তার শাস্তি, কৃচ্ছ্র, তপস্যা, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সমস্ত ব্রাহ্মণ্য সংস্কার, উত্তরাধিকার, স্ত্রীধন, সম্পত্তি-বিভাগ, আহার-বিহারের নানান বিধিনিষেধ, বিচিত্র দানের বিবৃতি, দানকর্মের নানান বিধিনিষেধ, তিথিনক্ষত্রের ইঙ্গিত বিচার, দৈবিক, বায়বিক ও পার্থিব নানা ধরনের উৎপাত, লক্ষণাদির শুভাশুভ নির্ণয়, বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্রপাঠের নিয়ম ও কাল—এক কথায়, ব্রাহ্মণের জীবন-শাসনের কোন নির্দেশই এইসব গ্রন্থ থেকে বাদ পড়েনি। সমাজের বিভিন্ন স্তর-উপস্তর, বর্ণ-উপবর্ণের পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্ণয়, বিশেষত ব্রাহ্মণদের সঙ্গে তাদের সম্বন্ধের অসংখ্য বিধিনিষেধও এইসব স্মৃতিকর্তাদের আলোচনার বিষয়। এই যুগের স্মৃতিশাসনই পরবর্তী বাংলার ব্রাহ্মণ-তন্ত্রের ভিত্তি।

কম্বোজ-বর্মণ-সেন রাষ্ট্রে ব্রাহ্মণেরা রাজপুরুষ হিসেবে দেখা দিচ্ছেন। রাষ্ট্রে তাঁদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ক্রমেই বাড়ছে। তাঁরা রাষ্ট্রের কাছ থেকে প্রচুর

দাক্ষিণ্য লাভ করছেন, নানা উপলক্ষে দান গ্রহণ করে তাঁরা অগাধ জমির মালিক হয়ে বসছেন। এক বর্ণ, এক ধর্ম ও সমাজাদর্শের একাধিপত্যই সেন-বর্মণ যুগের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াল। সে-বর্ণ ব্রাহ্মণ বর্ণ ; সে-ধর্ম ব্রাহ্মণ্য ধর্ম। সে-সমাজাদর্শ পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য সমাজের আদর্শ ; সেই আদর্শই হল সমাজের মাপকাঠি। রাষ্ট্রের মাথায় রাজা ; তার প্রধান খুঁটি ব্রাহ্মণেরা। কাজেই মূর্তিতে-মন্দিরে, রাজকীয় লিপিমালায়, স্মৃতিব্যবহারে ও ধর্মশাস্ত্রে সমস্ত রকম উপায়ে এই আদর্শ ও মাপকাঠির ঢাক পেটানো হতে লাগল। রাষ্ট্রের ইচ্ছায় ও নির্দেশে সর্বময় ব্রাহ্মণ্য একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হল।

ফল যা ফলবার তাই ফলল। ব্রাহ্মণতান্ত্রিক বর্ণব্যবস্থার মাথায় থাকলেন ব্রাহ্মণেরা। দ্বাদশ শতকেই জনপদ-বিভাগ অনুযায়ী ব্রাহ্মণদের দুটি স্পষ্ট ভাগ দেখা যায়—রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র। সেন-বর্মণ আমলে বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণদেরও উদ্ভব। এইসব শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ ছাড়াও আরও দুতিন শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের খবর এই যুগেই পাওয়া যায়। এঁরা হলেন দেবল বা শাকদ্বীপী এবং গণক বা গ্রহবিপ্র। ব্রাহ্মণ সমাজে এঁদের তেমন ইজ্জত ছিল না। গণক বা গ্রহবিপ্ররা 'পতিত' বলেই গণ্য হতেন। এদেরই একটি শাখা 'অগ্রদানী' নামে পরিচিত। এ ছাড়া ছিল নিম্নশ্রেণীর ভট্ট ব্রাহ্মণ—অন্য লোকের যশোগান করাই ছিল তাঁদের পেশা। শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণেরা উত্তম সংকর পর্যায়ের ২০টি উপবর্ণ ছাড়া অন্য কারও পূজানুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করতে পারতেন না ; করলে যজমান বর্ণ বা উপবর্ণ হিসেবে গণ্য হতেন। এঁদের ছোঁয়া খেলে সংব্রাহ্মণদের প্রায়শ্চিত করতে হত। এ ছাড়া অনেকগুলো বৃত্তিও ছিল তাঁদের নিষিদ্ধ ; যেমন, চিকিৎসা ও জ্যোতির্বিদ্যার চর্চা, চিত্র ও অন্যান্য বিভিন্ন শিল্পবিদ্যার চর্চা ইত্যাদি। কিন্তু কৃষিকাজে কিংবা যুদ্ধবৃত্তিতে আপত্তি ছিল না ; মন্ত্রী, সান্ধিবিগ্রহিক ধর্মাধ্যক্ষ, সেনাধ্যক্ষ হলে কেউ পতিত হত না। অথচ বর্ণবিশেষের অধ্যাপনা বা পৌরোহিত্য খুবই দোষের ছিল।

ব্রাহ্মণ ছাড়া বাংলাদেশের বাদবাকি আর সমস্ত বর্ণকেই সংকর শূদ্রবর্ণ হিসেবে ধরা হত। এদের তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করে ব্রাহ্মণেরা তাদের প্রত্যেকের স্থান ও বৃত্তি বেঁধে দিয়েছিল। গোড়ায় এদের সংখ্যা ছিল ৩৬। তা থেকেই বাংলায় 'ছত্রিশ জাত' কথার উৎপত্তি। পরে এই সংখ্যা বেড়ে যায় এবং কয়েকটি কোমের নামও এর সঙ্গে যোগ হয়।

বৃহদ্ধর্ম পুরাণে তিনটি বিভাগ এই রকমের :

(১) উত্তম সংকর বিভাগে ২০টি উপবর্ণ : করণ (লেখক ও পুস্তকর্মদক্ষ—এঁরা সংশূদ্র), অম্বষ্ঠ (এঁদের বৃত্তি চিকিৎসা ও আয়ুর্বেদ চর্চা), উগ্র (যুদ্ধবিদ্যাই এঁদের ধর্ম), মগধ (হিংসামূলক যুদ্ধ ব্যবসায়ে অনিচ্ছুক হওয়ায় এঁদের বৃত্তি নির্দিষ্ট হয়েছিল চারণ ও সংবাদবাহীর), তন্তুবায়, গান্ধিক বণিক (গন্ধদ্রব্য বিক্রেতা), নাপিত, গোপ, কর্মকার, তৈলিক বা তৌলিক (সুপারি ব্যবসায়ী), কুম্ভকার, কাংস্যকার, শংখকার, দাস (চাষী), বারজীবী (পানের ·বরজ ছিল যাদের), মোদক (ময়রা), মালাকার, সূত (চারণ-গায়ক—পতিত ব্রাহ্মণ), রাজপুত্র (রাজপুত ?), তাম্বলী (পান বিক্রেতা)।

(২) মধ্যম সংকর বিভাগে ১২টি উপবর্ণ : তক্ষণ (খোদাইকর), রজক, স্বর্ণকার, সুবর্ণবণিক, আভীর (গোয়ালা), তৈলকার, ধীবর, শৌণ্ডিক (শুঁড়ি), নট (যারা নাচে, খেলা ও বাজি দেখায়), শাবাক (শাবার), শেখর, জালিক (জেলে)।

(৩) অধম সংকর বা অন্ত্যজ পর্যায়ে ৯টি উপবর্ণ : মলেগ্রহী, কুড়ব, চণ্ডাল, বরুড়, তক্ষ, চর্মকার, ঘট্টজীবী, ডোলাবাহী, মল্ল। ম্লেচ্ছ পর্যায়ে আরও কয়েকটি দেশী ও ভিন্প্রদেশী কোমের নাম পাওয়া যায়। পুক্কশ, পুলিন্দ, খস, খর, কম্বোজ, যবন, সুহ্ম, শবর ইত্যাদির স্থান ছিল বর্ণাশ্রমের বাইরে।

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণেও অনেকটা এই রকমের বর্ণবিন্যাস পাওয়া যায়। অনেকগুলি অর্থোৎপাদক শ্রেণী (তাদের মধ্যে স্বর্ণকার, সুবর্ণবণিক, তৈলকার, গন্ধবণিকও আছেন) বর্ণ হিসাবে সমাজের উঁচু কোঠায় স্থান পায়নি, বরং কতকটা অবজ্ঞাতই বলা চলে। যাঁরা সমাজ-শ্রমিক, তাঁরা তো বরাবরই নিম্নবর্ণ স্তরে—কেউ কেউ একেবারে অন্ত্যজ-অস্পৃশ্য পর্যায়ে। তবে সমাজে যতদিন ব্যবসাবাণিজ্যই ছিল ধনোৎপাদনের প্রধান উপায়, ততদিন বর্ণস্তর হিসেবে না হোক, অন্তত রাষ্ট্রে এবং সেই কারণে সামাজিক মর্যাদায় বণিক-ব্যবসায়ীদের বেশ কিছুটা প্রতিষ্ঠা ছিল। কিন্তু সপ্তম-অষ্টম শতক থেকে বাঙালী সমাজ যখন কৃষি ও ছোটখাটো গৃহ-শিল্পের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ল, তখন থেকে অর্থোৎপাদক ও শ্রমিক শ্রেণীগুলি ক্রমশ সামাজিক মর্যাদাও হারাতে আরম্ভ করে। হাতের কাজই ছিল যাঁদের জীবিকার উপায়, তাঁরা স্পষ্টতই সমাজের নিম্নতর ও নিম্নতম স্তরে স্থান পেলেন। অথচ বুদ্ধিজীবী ও মসীজীবী যাঁরা, তাঁরাই সমাজের ওপরকার স্তর দখল করলেন। এমন কি কৃষিজীবী দাস-

সম্প্রদায়ও অনেক ক্ষেত্রে বণিক-ব্যবসায়ী ও অতি-প্রয়োজনীয় সমাজ-শ্রেণী-সম্প্রদায়গুলির উপরের বর্ণস্তরে স্থান পেয়েছেন। পাল আমলের শেষের দিকে, বিশেষ করে, সেন-বর্মণ আমলে বর্ণের সঙ্গে শ্রেণীর পারস্পরিক সম্বন্ধের সুস্পষ্ট বিরোধ ফুটে ওঠে।

রাষ্ট্রে ব্রাহ্মণ ও করণ-কায়স্থদের প্রভাবই সবচেয়ে বেশি ছিল। জমির মাপ-জোখ, হিসাবপত্র ও দপ্তর ইত্যাদির তদারক, পুস্তপালের কাজকর্ম, লেখকের কাজ ইত্যাদি করার দরুনই রাষ্ট্রে করণ-কায়স্থরা প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। অম্বষ্ঠ-বৈদ্যদের প্রভাবও হয়ত সময়ে সময়ে কিছু কিছু ছিল, তবে সব জায়গায় সমানভাবে নয়। বৈশ্যবৃত্তিধারী বর্ণের লোকেরা অষ্টম শতক পর্যন্ত প্রভাবশালীই ছিলেন, কিন্তু পরে তাঁদের প্রভাব কমে যায় এবং তাঁদের কোন কোন সম্প্রদায় সংশূদ্র পর্যায় থেকেও পতিত হয়ে পড়েন। কৈবর্তদের একটি সম্প্রদায় কিছুদিন রাষ্ট্রে খুবই প্রভাবশালী হয়েছিলেন, পরেও সে প্রভাব খুব সম্ভব অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। আর কোন বর্ণের কোন প্রভাব রাষ্ট্রে ছিল বলে মনে হয় না।

প্রাচীন বাংলার সমাজ যেমন বিভিন্ন বর্ণে, তেমনি অর্থনৈতিক শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। সামাজিক ধনের উৎপাদন ও বিলিব্যবস্থা অনুসারে সমাজে

শ্রেণী

অর্থনৈতিক শ্রেণীর উদ্ভব ও স্তরভেদ দেখা দেয়। ধন যাঁরা উৎপাদন করতেন, তাঁরাই যে ভোগ করতে পারতেন তা নয়। কে বেশি পাবে, কে কম পাবে, কে শুধু কোন রকমে কষ্টেসৃষ্টে বেঁচে থাকবার মত পাবে, কে একেবারেই পাবে না—তা নির্ভর করত উৎপাদিত ধনের বিলিব্যবস্থার ওপর। বিলিব্যবস্থা কারা করত? প্রাচীন বাংলায় অর্থাগমের তিনটি উপায়—কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য। চাষবাসের জন্যে জমির দরকার—সে জমির ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা ও তারও ওপর রাষ্ট্রের মালিকানা। ক্ষেত্রকর বা কর্ষক ফসল ফলালেও তার বিলিব্যবস্থা ছিল জমিদার ও রাষ্ট্রের হাতে। ব্যবসাবাণিজ্য বণিকদের এবং শিল্প শিল্পীদের হাতে; এই দুই উপায়ে যে অর্থাগম হত, তার বিলিব্যবস্থা কিছুটা রাষ্ট্রের হাতে থাকলেও অধিকাংশই ছিল বণিক ও শিল্পীদের হাতে। প্রাচীন বাংলায় খৃষ্টপূর্ব শতকগুলিতেই ধন উৎপাদনের এই তিনটি প্রধান উপায় অবলম্বন করে তিনটি শ্রেণী গড়ে উঠেছিল। এ ছাড়াও সমাজে এমন বহু লোক আছেন, ধন উৎপাদন বা বিলিব্যবস্থার ভার সাক্ষাৎভাবে যাঁদের ওপর নেই। যেমন,

জ্ঞানবিজ্ঞান, ধর্মকর্ম, শিল্পকলা, ভাষাসাহিত্য নিয়ে যাঁদের কারবার ছিল, কিংবা যাঁরা সমাজের অঙ্গ-নির্গত আবর্জনা-পরিষ্কারক রজক-চণ্ডাল-বাউড়ী-পোদ-বাগ্দী প্রভৃতি। উৎপাদিত ধনে সকলের সমান অধিকার না থাকায়, বিলিব্যবস্থা বর্ণ ও বৃত্তির মর্যাদা অনুযায়ী হওয়ায় অর্থনৈতিক শ্রেণী তিনটির যে অনেক বেশি ছিল তাতে সন্দেহ নেই। সমাজের গঠন-বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে, সমাজকর্মের জটিলতা ও কর্মবিভাগ বেড়ে যাবার সঙ্গে ক্রমে ক্রমে শ্রেণী-উপশ্রেণীর সংখ্যাও বেড়ে গেছে।

পঞ্চম শতক থেকেই বিভিন্ন লিপিতে রাজপুরুষদের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু পাল আমলে রাজা-রাজনক-রাজপুত্র থেকে আরম্ভ করে তরিক-শৌল্কিক-গৌল্মিক প্রভৃতি একেবারে অধস্তন রাজকর্মচারী পর্যন্ত সকলকে এক শ্রেণীতে একত্রে গেঁথে বলা হয়েছে রাজপাদোপজীবী। এঁরা সবাই একই অর্থনৈতিক স্তরভুক্ত ছিলেন না। সকলের ওপরে ছিলেন রাণক, রাজনক, মহাসামন্ত, সামন্ত, মাণ্ডলিক ইত্যাদি সামন্ত প্রভুরা ; যার যার নিজের নিজের জনপদে এঁদের প্রভুত্ব মহারাজাধিরাজের চেয়ে কিছু কম ছিল না। এঁদের নিচের স্তরে উপরিক বা ভুক্তিপতি, বিষয়পতি, মণ্ডলপতি, অমাত্য, সান্ধিবিগ্রহিক, শান্ত্যাগারিক, রাজপণ্ডিত, কুমারামাত্য, মহাপ্রতীহার, মহাসেনাপতি, রাজামাত্য, রাজস্থানীয় ইত্যাদি। এঁরা হলেন বিরাট আমলাতন্ত্রের ওপরের স্তর। এঁদের শ্রেণীস্বার্থ একদিকে যেমন রাষ্ট্রের সঙ্গে, তেমনি অন্যদিকে ছোট-বড় ভূস্বামীদের সঙ্গে জড়িত। এরপর মধ্যবিত্ত, মধ্যক্ষমতাধারী রাজকর্মচারীর স্তর—অগ্রহারিক, ঔদ্রঙ্গিক, আবস্থিক, চৌরোদ্ধরণিক, বলাধ্যক্ষ, নাবাধ্যক্ষ, দাণ্ডিক, দণ্ডপাশিক, দণ্ডশক্তি, দশাপরাধিক, গ্রামপতি, জ্যেষ্ঠকায়স্থ, খণ্ডরক্ষ, খোল, কোট্টপাল, ক্ষেত্রপ, প্রমাতৃ, প্রান্তপাল, ষষ্ঠাধিকৃত ইত্যাদি। তার নিচে শৌল্কিক, গৌল্মিক, হট্টপতি, লেখক, শিরোরক্ষিক, শান্তকিক, বাসাগারিক, পিলুপতি প্রভৃতি। একেবারে নিচের স্তরে ছিল হূণ, মালব, খস, লাট, কর্ণাট, চোড় প্রভৃতি বেতনভুক সৈন্য, অধস্তন কেরানী, চাটভাট ইত্যাদি ক্ষুদ্রতম রাষ্ট্রসেবকেরা।

মহামহত্তর, মহত্তর, কুটুম্ব, প্রতিবাসী, জনপদবাসী ইত্যাদি ভূমিসম্পদে ও শিল্পবাণিজ্য-সম্পদে সমৃদ্ধ নানা স্তরে বিভক্ত একটি শ্রেণীর প্রতিনিধি। মহামহত্তর বড় ভূস্বামী, মহত্তর ছোট ভূস্বামী। স্বল্প ভূমি-সম্পন্ন গৃহস্থ কুটুম্ব ; প্রতিবাসী, জনপদবাসীদের বৃত্তি ও জীবিকা ছিল কৃষি, গৃহশিল্প ও ছোটখাটো

ব্যবসা। এঁরা নিজের হাতে চাষের কাজ করতেন না, নানা শর্তে জমি বিলিবন্দোবস্ত করতেন।

বৌদ্ধ-জৈন স্থবির ও সংঘ-সভ্যদের এবং ব্রাহ্মণদের নিয়ে প্রাচীন বাংলার বিদ্যা-বুদ্ধি-জ্ঞান-ধর্মজীবী শ্রেণী। এঁদের মধ্যে ব্রাহ্মণেরাই সংখ্যায় বেশি। তাছাড়া অল্পসংখ্যক করণ-কায়স্থ, বৈদ্য এবং উত্তম সংকর পর্যায়ের কিছু কিছু লোকও এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

অষ্টম শতকের আগে পর্যন্ত ক্ষেত্রকর, কর্ষক বা কৃষক শ্রেণীর উল্লেখ পাওয়া যায় না। তা থেকে একথা মনে করবার কারণ নেই যে, ঐ সময় কৃষক শ্রেণী ছিল না। আসলে তখনও সমাজ একান্তভাবে কৃষিনির্ভর হয়ে ওঠেনি; কৃষক বা ক্ষেত্রকর সমাজের মধ্যে থাকলেও তাঁরা কখনও বিশেষ অথবা উল্লেখযোগ্য শ্রেণী হিসেবে গড়ে ওঠেননি। দেশের ধনোৎপাদনের প্রধান একটি উপায় এঁদের হাতে থাকলেও সেই ধনের বিলিব্যবস্থায় এঁদের কোন হাত ছিল না। এঁরা অধিকাংশই সামান্যমাত্র জমির অধিকারী অথবা ভাগচাষী ও ভূমিহীন চাষী ছিলেন।

অষ্টম শতক থেকে আবার একটি শ্রেণীর উল্লেখ পাওয়া যায় না—এরা হ'ল শিল্পী-বণিক-ব্যবসায়ী শ্রেণী। অথচ তার আগে পর্যন্ত রাষ্ট্রে ও সমাজে এই শ্রেণীর রীতিমত প্রভাব-প্রতিপত্তি দেখা যায়। পঞ্চম থেকে সপ্তম শতক পর্যন্ত বাঙালী সমাজ ছিল প্রধানত শিল্প ও ব্যবসাবাণিজ্যের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু তারপর থেকে সমাজ ক্রমেই কৃষিনির্ভর হয়ে উঠেছে; কাজেই শ্রেণী হিসেবে শিল্পী-ব্যবসায়ী-বণিকদের প্রাধান্যও আর থাকেনি। সমাজ-মর্যাদার দিক থেকে তাঁরা খাটো হয়ে পড়লেন; এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে নিচের কোঠায় তাঁরা স্থান পেলেন। প্রাচীনকালে শ্রেষ্ঠীরা শক্রধ্বজার পুজো করতেন। দ্বাদশ শতকেও এই উৎসবটি হত। তখন শ্রেষ্ঠীরা আর ছিলেন না। এই সময় একান্ত কৃষিনির্ভরতার দরুন বাঙালী সমাজের আক্ষেপ জানিয়ে গোবর্ধন আচার্য বলছেন: "হে শক্রধ্বজ, যে শ্রেষ্ঠীরা তোমাকে উঁচু করে তুলে ধরেছিলেন, সম্প্রতি তাঁরা কোথায়! আজকাল লোকে তোমাকে লাঙলের ফাল আর গরু বাঁধবার খুঁটি করতে চাইছে।"

পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকে দেখা যায়, সে যুগের সমাজের প্রধান ধনোৎপাদক শ্রেণী শিল্পী, শ্রেষ্ঠী, সার্থবাহ, বণিক, ব্যাপারী রাষ্ট্রযন্ত্রে রীতিমত প্রভাব বিস্তার করে আছে। সেই সঙ্গে জ্ঞান-ধর্মজীবী জৈন-বৌদ্ধ যতি সম্প্রদায় ও ব্রাহ্মণেরাও

রাষ্ট্রের আনুকূল্য লাভ করতে আরম্ভ করেছে। ষষ্ঠ-সপ্তম শতকে ভূমি-নির্ভর সামন্তপ্রথার স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠা এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, সংস্কার ও সংস্কৃতির বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে দুটি শ্রেণীর সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হল—একটি বহুস্তরে বিভক্ত ভূম্যধিকারী শ্রেণী ও অন্যটি ব্রাহ্মণ-প্রধান জ্ঞান-ধর্মজীবী শ্রেণী। সামন্তচক্র ছিল রাষ্ট্রের শক্তি ও নির্ভর; এই সামন্তচক্রকে আশ্রয় করেই ভূম্যধিকারী শ্রেণীর অস্তিত্ব। কাজেই এই শ্রেণীর সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হওয়া খুবই স্বাভাবিক। একদিকে রাষ্ট্র এবং অন্যদিকে ভূম্যধিকারী শ্রেণীর দাক্ষিণ্যের ওপর ব্রাহ্মণদের জমি ও অর্থপ্রাপ্তি নির্ভর করত। কাজেই তাঁরা ছিলেন এই দুইয়েরই পোষক ও সমর্থক। অষ্টম শতক থেকে শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্যের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে ভূম্যধিকারী শ্রেণীর সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্বন্ধ আরও ঘনিষ্ঠ হতে থাকে। সেন ও বর্মণ রাজবংশ যে সমাজাদর্শ ও পরিবেশের মধ্যে তাঁদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন, যে-আদর্শ ও আবেষ্টনের মধ্যে ভূম্যধিকারতন্ত্র বজায় রাখা সম্ভব ও সহজ—সেই আদর্শ ও পরিবেশ রচনা ও প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব ছিল জ্ঞানবুদ্ধিজীবী ব্রাহ্মণ শ্রেণীর ওপর।

গ্রাম নগর

গ্রামকে কেন্দ্র করেই প্রাচীন বাংলার কৃষিনির্ভর সমাজ ও সভ্যতা গড়ে উঠেছে। যে সমাজ নেহাৎই চাষবাস এবং ছোটখাটো গৃহশিল্পের ওপর নির্ভরশীল, সে সমাজে গ্রামগুলো সাধারণত খুব বড় হয় না, শহরের সংখ্যাও বেশি থাকে না। চাষের ক্ষেত ও চাষের কাজ চালানোর জন্যে, ঘরবাড়ি তৈরি ও পোষাক-পরিচ্ছদ বানানোর জন্যে যতটুকু শিল্প একান্ত দরকার, তার জন্যে ফলাও আয়োজন বা খুব বেশি লোকের দরকার হয় না। তাছাড়া চাষের জায়গা কোথাও এত বেশি নেই যে, নগরের মত সীমাবদ্ধ ছোট্ট জায়গায় একসঙ্গে খুব বেশি লোকের অন্ন সংস্থান হতে পারে। তাই গ্রাম খুব বড় হলেও কিছুতেই নগরের সমকক্ষ হতে পারে না। নগরের বাইরে দেশের জনপদ জুড়ে চাষের ক্ষেত ছড়িয়ে আছে। যাঁরা চাষের কাজ করেন, ক্ষেতের কাছাকাছি তাঁদের বসবাস করতে হয়। তাঁদের বসতিগুলো নিয়েই গ্রাম গ'ড়ে উঠেছে। ছোটখাটো গৃহশিল্প নিয়ে যাঁদের থাকতে হয়, তাঁদেরও জীবিকার জন্যে কিছুটা চাষের কাজ করতেই হয়। তাই ছোটখাটো গৃহশিল্পও গ্রামকেন্দ্রিক। চাষের জন্যে জলের দরকার বলেই নদীনালা খালবিলের আশেপাশেই গ্রামের পত্তন হয়েছে।

দিন দিন জনসংখ্যা যত বেড়েছে, ততই বাস্তু ও কৃষিক্ষেত্রের বিস্তার

হয়েছে। সব রকম জমিরই চাহিদা বেড়েছে, বনজঙ্গল হাসিল করে নতুন গ্রামের পত্তন হয়েছে। যে ভূমিনির্ভর সমাজে পশুপালন ও পশুচারণই ছিল জীবিকানির্বাহের প্রধান উপায়, সে সমাজে চারণভূমি যেমন দূরে দূরে ছড়ানো, তেমনি বাস্তু ও পরস্পরবিচ্ছিন্ন। কিন্তু একান্তভাবে কৃষিনির্ভর গ্রামে দেখা যায় ঠিক তার উল্টো। গ্রামে গৃহস্থদের বাড়িগুলি যেমন কাছাকাছি, তেমনি চাষের জমিগুলিও গায়ে গায়ে লাগানো। ভয়, ভীতি, নানা রকমের আপদ্-বিপদের হাত থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যেও গ্রামবাসীরা এই রকম ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে বাস করত। এইভাবে সাধারণত একেকটি বৃত্তি আশ্রয় করে একই শ্রেণীর লোকদের নিয়ে একেকটি পাড়া গড়ে উঠত। পাড়া ও গ্রামের এই গড়ন প্রাচীন কৌমসমাজ থেকেই চলে আসছে।

সব গ্রামের আয়তন ও লোকসংখ্যা সমান ছিল না। প্রকৃতিও এক রকমের ছিল না। ছোট ছোট গ্রাম বা গ্রামাংশের নাম পাটক বা পাড়া। যে সব গ্রাম প্রশস্ত জলপথ ও স্থলপথের ওপর গড়ে উঠেছে, বাস্তু ও চাষের জমি যেখানে সুলভ ও সুপ্রচুর, যেসব গ্রামে শিল্পবাণিজ্যের সুযোগ ও প্রচলন বেশি, কিংবা যেসব গ্রামে শাসনকাজ পরিচালনার কোন কেন্দ্র থাকত অথবা শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ধর্মের কেন্দ্র হিসেবে যেসব গ্রাম গণ্য হত—সেই সব গ্রাম আয়তনে, লোকসংখ্যায় এবং মর্যাদায় অন্যান্য গ্রামের চেয়ে বেশি প্রাধান্য লাভ করত।

চতুর্থ-পঞ্চম শতক থেকে অষ্টাদশ শতকের শেষ পর্যন্ত বাংলার গ্রামের এই চেহারা ও প্রকৃতি বিশেষ বদলায়নি। তার প্রথম ও প্রধান কারণ, শত শত বছরেও গ্রাম্য উৎপাদনব্যবস্থার—কৃষি ও ছোটখাটো শিল্পের উৎপাদনপদ্ধতির—কোন বদলই হয়নি। একদিকে হাল আর বলদ, আখমাড়াই যন্ত্র, অন্যদিকে চরকা আর তাঁতই প্রধান উৎপাদন-যন্ত্র। দ্বিতীয় কারণ, এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে ভূমিব্যবস্থার কোন মূলগত পরিবর্তন হয়নি, ভূমিনির্ভর কৃষকসমাজের মধ্যেকার শ্রেণীবিভাগ মোটামুটি একই থেকে গেছে। কোন গ্রাম হয়ত কখনও ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র হওয়ায়, শাসন-কাজের অধিষ্ঠান নির্বাচিত হওয়ায় আলাদা একটা গুরুত্ব বা মর্যাদা পেয়েছে; কিন্তু তা সাধারণ নিয়মের বাইরে। এই নিয়মের ব্যতিক্রম হিসেবেই হয়ত কোন গ্রাম গুরুত্ব ও মর্যাদায় ফুলে ফেঁপে উঠে নগরের মর্যাদা পেয়েছে।

ছোট ছোট গ্রাম একাই একক; বড় বড় গ্রাম নানা পাড়ায় বিভক্ত।

গ্রামবাসী ছিলেন সাধারণত ব্রাহ্মণেরা, ভূস্বামী মহামহত্তর, মহত্তর, কুটুম্বেরা; ক্ষেত্রকর, বারজীবী, ভূমিহীন কৃষি-শ্রমিকেরা; তন্তুবায়-কুবিন্দক, কর্মকার, কুম্ভকার, কাংস্যকার, মালাকার, চিত্রকার, তৈলকার, সূত্রধার প্রভৃতি শিল্পীরা; তৌলিক, মোদক, তাম্বুলী, শৌণ্ডিক, ধীবর-জালিক প্রভৃতি ছোটখাটো ব্যবসায়ীরা; গোপ, নাপিত, রজক, আভীর, নট-নর্তক প্রভৃতি সমাজ-সেবকেরা; বরুড়, চর্মকার, ঘট্টজীবী, ডোলাবাহী, ব্যাধ, হড্ডি, ডোম, জোলা, বাগতীত, বেদিয়া, মাংসচ্ছেদ, চণ্ডাল, কোল, ভীল, শবর, পুলিন্দ, মেদ, পৌণ্ড্রক প্রভৃতি অন্ত্যজ ও আদিবাসী পর্যায়ের লোকজন। শেষোক্ত পর্যায়ের লোকে থাকত গ্রামের একেবারে একপ্রান্তে। কোন কোন গ্রামে শ্রেষ্ঠীদেরও বাস ছিল। এই সব বাস্তু দূরে দূরে ছড়ানো। অন্ত্যজদেরই শুধু গ্রামের একেবারে এক-প্রান্তে স্থান ছিল।

বসতবাড়ির গায়েই সুপারি, নারকেল, আম, মহুয়া প্রভৃতি ফলের গাছ; পানের বরজ, পুকুর, নর্দমা, চলাচলের রাস্তা; কিছু কিছু পতিত বাস্তুভিটা, উঁচু-নিচু জমি ইত্যাদি। চাষের ক্ষেত বসতবাড়ি থেকে বেশি দূরে নয়। বিরাট একটানা কৃষিক্ষেত্রে প্রত্যেকের জমির চৌহদ্দি আল দিয়ে বাঁধা। ক্ষেতের পাশ দিয়ে মাঝে মাঝে ছোট বড় খালনালা। তাতে শুধু চাষের জলই পাওয়া যায় না, জলনিকাশের কাজও হয়। চাষের ক্ষেতের মাঝখানে অথবা শেষ সীমায় গোবাট ও তৃণাচ্ছাদিত গোচর-ভূমি।

গ্রামের পাশ দিয়ে গেছে নদনদী, খালবিল এবং গ্রাম্য লোক-চলাচলের কিংবা গরুর গাড়ির রাস্তা। কোন কোন গ্রামের বাইরে হাট, দোকানপাট ইত্যাদি। সমুদ্র বা সমুদ্রের জোয়ারবাহী নদীর তীরে তীরে গ্রামের লোকদের লবণের গর্ত। কোন কোন গ্রামের নিম্নভূমিতে বন্যারোধী বাঁধ বা জাঙ্গাল। নদী বা বড় খাল পারাপারের জন্যে খেয়াঘাট। প্রত্যেক গ্রামেই ছোট বড় দু'একটি মন্দির; কোন কোন গ্রামে বৌদ্ধবিহার; ব্রাহ্মণদের ঘরে চতুষ্পাঠী। স্থলপথে যেসব গ্রাম ব্যবসা-বাণিজ্যের রাস্তায় পড়ে, সেখানে গঞ্জ, বড় হাট। জলপথ হলে নদীর ঘাটে ও সমুদ্রের খাড়িতে অসংখ্য নৌকোর মেলা। এই হল মোটামুটি প্রাচীন বাংলার গ্রামের চিত্র। তার চেহারা ও প্রকৃতি আজও মোটামুটি একই আছে।

কিন্তু প্রাচীন বাংলার নগরগুলির বেলায় তা খাটে না। প্রাচীন বাংলাদেশ গ্রামপ্রধান হলেও নগর নিতান্ত কম ছিল না, নাগরিক সভ্যতাও খুব নিচু স্তরের

ছিল না। এই সমস্ত নগর গড়ে উঠেছিল নানান প্রয়োজনে। কোথাও একটিমাত্র প্রয়োজনের তাগিদে, কোথাও একাধিক প্রয়োজনে। পুণ্ড্র-পুণ্ড্রবর্ধনের মত নগর একটিমাত্র প্রয়োজনে গড়ে ওঠেনি। করতোয়া তীরবর্তী এই নগর একটি নাম-করা তীর্থ ছিল। দ্বিতীয়ত, শত শত বছর ধরে এই নগর এক বৃহৎ রাজ্য ও জনপদের রাজধানী ও প্রধান শাসনকেন্দ্র ছিল। তৃতীয়ত, এই নগর সর্বভারতীয় ও আন্তর্দেশিক বাণিজ্যের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। একাধিক স্থলপথ এবং প্রশস্ত করতোয়ার জলপথ এই কেন্দ্রে মিলিত হত। তাম্রলিপ্তির মত নগরও একটিমাত্র প্রয়োজনে গড়ে ওঠেনি। তাম্রলিপ্তি ছিল ভারতের একটি সুপ্রসিদ্ধ সামুদ্রিক বন্দর। তাম্রলিপ্তির খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার অন্যতম কারণ এই নগর বৌদ্ধধর্ম, শিক্ষা ও সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ছিল। কোটীবর্ষ প্রধানত ও প্রথমত বহু শত বছর যাবৎ আন্তর্দেশিক রাজ্যবিভাগের একটি বড় শাসনকেন্দ্র ছিল। পুনর্ভবার তীরে হওয়ায় এই নগরের সামরিক গুরুত্ব ও তীর্থমহিমা থাকাও অসম্ভব নয়। বিক্রমপুরের গুরুত্ব শুধু শাসনকেন্দ্র হিসেবেই নয়, তার সামরিক গুরুত্বও ছিল। একাধিক সেনরাজার আমলে এখানে জয়স্কন্ধাবার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাছাড়া নদ-নদীবহুল নৌ-চলাচলের মর্মকেন্দ্রে অবস্থিত হওয়ায় এর বাণিজ্যিক গুরুত্বও ছিল বলে মনে হয়। আনুমানিক নবম-দশম শতক থেকেই এই নগর বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির একটা বড় কেন্দ্র ছিল। শুধু রাষ্ট্রীয় বা সামরিক প্রয়োজনে বা শুধু ধর্মকেন্দ্র হিসেবেও কোন কোন নগর গড়ে উঠেছিল। যেমন, শুধু রাষ্ট্রীয় বা সামরিক প্রয়োজনে গড়ে উঠেছিল পঞ্চনগরী বিষয়ের শাসনাধিষ্ঠান পুষ্করণ, ক্রীপুর, পাল ও সেন রাজাদের প্রতিষ্ঠিত রামপাল, রামাবতী ও লক্ষ্মণাবতী, শশাঙ্ক ও জয়নাগের রাজধানী কর্ণসুবর্ণ প্রভৃতি নগর। সোমপুর (বর্তমান পাহাড়পুর), ত্রিবেণী প্রভৃতি নগর গড়ে উঠেছিল ধর্ম ও সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসেবে। তবে কমবেশি ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রেরণা সর্বত্রই ছিল বলে মনে হয়। প্রায় প্রত্যেকটি নগরই প্রশস্ত ও প্রচলিত স্থল ও জলপথের ওপর অথবা সংযোগকেন্দ্রে অবস্থিত ছিল।

যেসব নগর রাষ্ট্রীয় ও সামরিক প্রয়োজনে গড়ে উঠেছিল, শাসনাধিষ্ঠান যেসব নগরে ছিল, সেখানে বাস করতেন রাষ্ট্রীয় ও সামরিক কর্মচারীরা। রাজা, মহারাজা, সামন্তরাও ছিলেন নগরবাসী। তীর্থস্থান বা শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে যেসব নগর গড়ে উঠেছিল, সেখানে থাকতেন বিভিন্ন ধর্ম ও শিক্ষার

গুরু, আচার্য, পুরোহিত প্রভৃতি বৃত্তিধারী লোকেরা, তাঁদের শিষ্য, ছাত্র প্রভৃতি। প্রত্যেক নগরেই নগরবাসীদের ধর্মাচরণ ও অনুষ্ঠানের জন্যে কিছু কিছু ব্রাহ্মণ আচার্য, পুরোহিতের বাস ছিল। এঁরা অনেকে রাজপাদোপজীবীর বৃত্তিও গ্রহণ করেছিলেন। তীর্থনগরে নানা শিল্পদ্রব্যের কেনাবেচার কেন্দ্রও গড়ে উঠত; তাছাড়া অধিকাংশ নগরেই ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রেরণা থাকার দরুন বহুসংখ্যক শ্রেষ্ঠী, সার্থবাহ, কুলিকের বাস ছিল। রাজকর্মচারী রাষ্ট্র-প্রতিনিধিদের সঙ্গে সঙ্গে এঁরাই নগরের প্রধান বাসিন্দা। কর্মকার, কাংস্যকার, শংখকার, মালাকার, সূত্রধার, শৌণ্ডিক, তন্তুবায় প্রভৃতি সম্প্রদায়ের অনেকেই নগরে বাস করতেন। স্বর্ণকার, সুবর্ণবণিক, গন্ধবণিক, অট্টালিকাকার, কোটক, অন্যান্য ছোটবড় শিল্পী ও বণিকেরা একান্তভাবেই নগরবাসী ছিলেন। রজক, নাপিত, গোপ প্রভৃতি সমাজ-সেবকেরাও অনেকে নগরে বাস করতেন। ডোম, চণ্ডাল, ডোলবাহী, চর্মকার, মাংসচ্ছেদ প্রভৃতি সমাজ-সেবকেরাও কিছু কিছু নগরে বাস করতেন। তাঁদের স্থান ছিল নগরের বাইরে। নগরবাসী হলেও তাঁরা যথার্থ নাগরিক হিসেবে গণ্য হতেন না। প্রধানত শ্রেষ্ঠী, শিল্পী, বণিক, রাজ ও অভিজাত সম্প্রদায়, রাষ্ট্রপ্রধান ও সমৃদ্ধ বিত্তবান ব্রাহ্মণেরাই ছিলেন নাগরিক।

প্রত্যেকটি নগরই ছিল প্রাকার-বেষ্টিত; প্রাকারের পরেই পরিখা। নগর থেকে নগরের উপকণ্ঠে, নদীর ঘাটে যাবার জন্যে প্রাকারের প্রত্যেক দিকেই এক বা একাধিক নগরদ্বার; পরিখার ওপর দিয়ে সেতু। পরিখার ওপারে শহরতলীতে সমাজ-সেবক, সমাজ-শ্রমিক ও নগর-নির্ভর কুটুম্ব-গৃহস্থের বাস; কোথাও কোথাও মন্দির, সংঘ, বিহার। নগরের মধ্যে উঁচু জমির ওপর প্রাসাদ-বেষ্টিত রাজপ্রাসাদ। রাজপ্রাসাদের গায়েই রাজকীয় ও শাসনকার্য-সংক্রান্ত সৌধমালা। সোজা সরল রেখায় পূর্ব-পশ্চিমে উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত রাজপথে গোটা নগরভূমি পৃথক পৃথক চতুর্ভুজে বিভক্ত। রাজপথের দুধারে সমান্তরালবর্তী বড় বড় সুরম্য অট্টালিকা, আপণি-বিপণি। তাছাড়া হাট-বাজার, মন্দির, প্রমোদোদ্যান, দীঘি, পুকুর, বিহার তো ছিলই। সব নগরই যে এই রকম সমৃদ্ধ ও ঐশ্বর্যবান ছিল তা নয়। বিষয়াধিষ্ঠান, মণ্ডলাধিষ্ঠান, বীথী-অধিষ্ঠান জাতীয় নগর, ছোট ছোট তীর্থ, শিক্ষা ও বাণিজ্যকেন্দ্রগুলি বরং বড় সমৃদ্ধ গ্রামের মতই ছিল। এই জাতীয় ছোট ছোট নগরের একেবারে গা ঘেঁষে ছিল বিভিন্ন গ্রাম। এইসব নগরের পথ গ্রামে গিয়ে মিশত কিংবা গ্রামেরই পথ নগরে গিয়ে মিশত।

গ্রামে যেসব কৃষি ও শিল্পদ্রব্য ইত্যাদি উৎপন্ন হত, তার কেনাবেচার কেন্দ্র ছিল গ্রাম থেকে দূরে নগরে-বন্দরে। কাজেই উৎপাদিত ধনের বণ্টনকেন্দ্র গ্রামে নয়। শাসনকেন্দ্রও নগরে, বাণিজ্যকেন্দ্রও তাই। কাজেই সামাজিক ধনদৌলতের বৃহত্তর গতিকেন্দ্রই হচ্ছে নগর; বণ্টন-ব্যবস্থাও প্রায় পুরোপুরি নগরেই সীমাবদ্ধ। নাগরিকেরাই সামাজিক ধনদৌলতের প্রধান বণ্টনকর্তা। তাই তৃতীয়-চতুর্থ শতক থেকে একাদশ-দ্বাদশ শতক পর্যন্ত সর্বত্রই নগরে নগরে দেখা যায় সারিবদ্ধ বড় বড় প্রাসাদ, নরনারীর প্রসাধন ও অলঙ্কার-প্রাচুর্য, নানারকমের বিলাসব্যসনের উপকরণ, আর ঐশ্বর্যের ছড়াছড়ি।

সপ্তম শতক ও তার পর থেকে ব্যবসাবাণিজ্য, বিশেষত সামুদ্রিক বহির্বাণিজ্যের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে নগরগুলির আকৃতি-প্রকৃতিও বদলাতে আরম্ভ করে। কৃষি ও গৃহশিল্প থেকে যখন সামাজিক ধনের উৎপাদন, তখনও নগরগুলিই ছিল সামাজিক ধনের কেন্দ্র। কিন্তু নগরগুলির বাণিজ্য-প্রাধান্য আর বজায় থাকেনি।

রাষ্ট্র

ইতিহাসে সে এক যুগ ছিল। রাজা নেই, উজির নেই; জজ নেই, হাকিম নেই; জেল নেই, আদালত নেই; পুলিশ নেই, পল্টন নেই; মামলা নেই, মোকদ্দমা নেই—তবু নিখুঁতভাবে সমাজের নিয়মশৃঙ্খলা বজায় থাকত। কোন বিবাদ-বিসম্বাদ হলে সমাজের সবাই মিলে মিশে তার নিষ্পত্তি করত। তখনও সমাজ গরিব আর বড়লোকে ভাগ হয়ে যায়নি; সবাই সমান, সবাই স্বাধীন। সকলে মিলে যা তৈরি করা হয়, তা সকলে মিলে ভোগ করা হয়—তা সকলের; নিজের তৈরি ও ব্যবহারের জিনিসটাই শুধু নিজের। জমির ওপর কোন ব্যক্তির নয়, গোটা কোমের অধিকার। জোরজুলুম নয়, জনমতের জোরেই সে যুগে সমাজের শাসন চলত।

বাংলাদেশেও অনেক পুরনো আমলে এমনি একটা যুগ ছিল। তখন রাজা ছিল না, রাষ্ট্র ছিল না—কৌমসমাজই ছিল সর্বেসর্বা। সেই সমাজের খুব বেশি খবর না পেলেও বাংলার জেলায় জেলায় আজও সেই পুরনো দিনের শাসনযন্ত্র ও শাসনপদ্ধতির কিছু কিছু রেশ আমরা দেখতে পাই। সমাজের একেবারে নিচের কোঠায়, গারো-সাঁওতাল-রাজবংশী প্রভৃতি পাহাড়ী ও জংলী কোমদের মধ্যে পঞ্চায়েতী প্রথায়, দলপতি নির্বাচনে, সামাজিক দণ্ডবিধানে, আচার-অনুষ্ঠানে, চাষের জমি ও শিকার-ভূমির বিলিবন্দোবস্তে, উত্তরাধিকার শাসনে সুপ্রাচীন কৌমসমাজের স্মৃতিচিহ্ন আজও দেখতে পাওয়া যায়।

কিন্তু সমাজ যখন গরিব আর বড়লোকে ভাগ হয়ে যায়, তখন আর পুরনো শাসনযন্ত্র আর শাসনপদ্ধতি টেঁকে না। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে পরস্পরের প্রতি মারমুখো শ্রেণীগুলো লড়তে গিয়ে নিজেদের এবং সমাজকে যাতে একেবারে খুইয়ে না ফেলে, লড়াইটা যাতে নিয়মমাফিক ও গা-সহা গোছের হয়, তা দেখবার জন্যেই রাষ্ট্রের পত্তন হয়েছে। সমাজে যখন যে শ্রেণীর হাতে ক্ষমতা বেশি, অর্থনৈতিক কলকাঠি যে শ্রেণীর হাতে, রাষ্ট্র তাদেরই হাতের যন্ত্র হয়ে দাঁড়ায়।

বাংলাদেশে ঠিক কবে কিভাবে সমাজ ভাগ হয়ে গিয়ে রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হল, তা বলবার উপায় নেই। তবে মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, খৃষ্টজন্মের পাঁচ-ছশো বছর আগে থেকেই বাংলাদেশে কৌমতন্ত্র ভেঙে গিয়ে রাজতন্ত্র দেখা দিতে আরম্ভ করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও দীর্ঘদিন ধরে শুধু লোকের মনে নয়, অভ্যাস ও সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যেও কৌমতন্ত্রের স্মৃতিশাসন প্রচলিত ছিল।

রাজতন্ত্রের নিঃসংশয় প্রমাণ ও পরিচয় পাওয়া যায় খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে গঙ্গারাষ্ট্রের বিবরণে। গ্রীক ঐতিহাসিকদের লেখা থেকে গঙ্গারাষ্ট্রের সামরিক শক্তি ও সেনাবিন্যাসের যে খবর জানা যায়, তা থেকে বেশ সুশৃঙ্খল ও সুদৃঢ় রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। মহাভারত ও সিংহলী পুরাণের কাহিনী থেকে মনে হয়, এই সময় গঙ্গারাষ্ট্রের বাইরেও অন্যান্য রাষ্ট্র ছিল; তারা সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে পরস্পর সন্ধি করত, পররাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় সম্বন্ধের লেনদেন হত, ছোট ছোট রাজ্য ও রাষ্ট্র সময় সময় বড় বড় রাজ্য ও রাষ্ট্রের সঙ্গে মিলে যেত।

রাজতন্ত্র

এর ঠিক পরেই বাংলার একাংশে রাষ্ট্রবিন্যাসের কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। আনুমানিক খৃষ্টীয় তৃতীয়-দ্বিতীয় শতকে উত্তর-বঙ্গ মৌর্য-রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল; মৌর্য-শাসনের কেন্দ্র ছিল পুডনগল বা পুণ্ড্রনগর—বর্তমান বগুড়ার পাঁচ মাইল দূরে মহাস্থানে। একজন রাজপ্রতিনিধির নেতৃত্বে তখন বাংলায় মৌর্য-শাসনযন্ত্র পরিচালিত হত। জটিল ও সুসম্বদ্ধ মৌর্য-রাষ্ট্রের প্রাদেশিক শাসনযন্ত্রের রূপ তখন বাংলাদেশেও দেখা গিয়েছিল। পুণ্ড্রনগরে একবার দুর্ভিক্ষ দেখা দেওয়ায় রাষ্ট্র থেকে প্রজাদের ধান ও অর্থ ঋণ দেওয়া হয়েছিল।

গুপ্ত-আমলে প্রাচীন বাংলার অধিকাংশ গুপ্ত-সাম্রাজ্যের অধীন হয়ে পড়েছিল। গুপ্ত-সম্রাটদের জাঁকজমকের অন্ত ছিল না। তাঁদের বলা হত 'পরমদৈবত', অর্থাৎ সম্রাট স্বয়ং ভগবানের প্রতিনিধি।

যেসব রাজ্য গুপ্ত-সাম্রাজ্যের অধীন হত তার অনেক অংশ থাকত সামন্ত রাজাদের শাসনাধীনে। সম্রাট বা তাঁদের রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিরা সে-সব অংশ নিজেরা শাসন করতেন না। সামন্ত রাজারা নিজের নিজের রাজ্যে প্রায় স্বাধীন স্বতন্ত্রভাবেই রাজত্ব করতেন। তাঁদের নিজেদের আলাদা রাষ্ট্রযন্ত্র ছিল, সেই রাষ্ট্রযন্ত্রও ছিল কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রযন্ত্রেরই

সামন্ত-মহাসামন্ত

ছাঁচে ঢালা। এই সামন্ত রাজ্য ও রাষ্ট্র অবশ্য সম্রাটের সর্বাধিপত্য মেনে চলতেন। যুদ্ধবিগ্রহের সময় তাঁরা সৈন্য যোগাতেন ; নিজেরা সম্রাটের যুদ্ধে যোগ দিতেন। এইসব সামন্ত-মহাসামন্তেরা কখনও কখনও মহারাজ উপাধি গ্রহণ করতেন। কোন বিশেষ রাষ্ট্রীয় কাজে যিনি রাষ্ট্রপ্রতিনিধি নিযুক্ত হতেন, তাঁকে বলা হত দূতক ; শান্তিরক্ষা ও যুদ্ধবিগ্রহ সংক্রান্ত উপরওয়ালা রাজপুরুষকে বলা হত মহাপ্রতীহার ; রাজকীয় হস্তীসৈন্যের অধ্যক্ষকে বলা হত মহাপিলুপতি ; পাঁচটি শাসন-কর্মকেন্দ্রের যিনি প্রধান কর্মকর্তা, তিনি পঞ্চাধিকরণোপরিক ; নগরের অধ্যক্ষদের যিনি কর্তা, তিনি পুরপালোপরিক। অনেক ক্ষেত্রে সামন্ত রাজারা একাই এইসব পদ অধিকার করতেন। সামন্ত রাজারা তাঁদের শাসিত জনপদে নিজেরা ভূমি দান করতে পারতেন না ; কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রে ভূমিদানের অনুরোধ জানাতেন।

এ ছাড়া বাকি দেশ ছিল খাস রাষ্ট্রের অধিকারে। কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের বৃহত্তম রাজ্য-বিভাগের নাম ছিল ভুক্তি ; প্রত্যেক ভুক্তি কয়েকটি বিষয়ে, প্রত্যেক বিষয় কয়েকটি মণ্ডলে, প্রত্যেক মণ্ডল কয়েকটি বীথীতে, প্রত্যেক বীথী কয়েকটি গ্রামে বিভক্ত ছিল। গ্রামই ছিল সর্বনিম্ন দেশবিভাগ।

রাজ্য-বিভাগ

মহারাজাধিরাজ স্বয়ং ভুক্তির শাসনকর্তা নিযুক্ত করতেন। রাজকুমার বা রাজপরিবারের লোকেরা কখনও কখনও ভুক্তিপতি হতেন। ভুক্তিপতিদের বলা হত উপরিক। বিষয়-বিভাগের সর্বোচ্চ রাজকর্মচারী হলেন বিষয়পতি। কর্তাকৃতিক হলেন শিল্পকর্মের অধ্যক্ষ। চৌরোদ্ধরণিক হলেন উচ্চপদস্থ শান্তিরক্ষক কর্মচারী। রাজপ্রাসাদ, রাজকীয় ঘরবাড়ি, বিশ্রামস্থান ইত্যাদির অধ্যক্ষের নাম আবসথিক। রেশম-জাতীয় বস্ত্রশিল্পের কর্তা ঔর্নস্থানিক। যানবাহনসংক্রান্ত কর্তা বাহনায়ক।

বিষয়পতিকে কোন কোন ক্ষেত্রে আয়ুক্তক বলা হত। বিষয়পতি যেখানে থাকতেন, সেখানে একটি অধিকরণ বা কর্মকেন্দ্র থাকত। নগরশ্রেষ্ঠী, প্রথম কুলিক, প্রথম কায়স্থ ও প্রথম সার্থবাহ ছিলেন এই অধিকরণের অবিচ্ছেদ্য অংশ ; এঁরা শুধু সহায়ক বা উপদেষ্টা ছিলেন না, বিষয়পতির সঙ্গে এঁরাও সমানভাবে শাসনকার্যের দায়িত্ব নির্বাহ করতেন। বিষয়াধিকরণের সভ্যদের দরকারমত সাহায্য করার জন্যে একটি প্রস্তপালনের দপ্তরও থাকত। জমির মাপ-জোখ, সীমানা, স্বত্ব ইত্যাদি সব কিছুর দলিলপত্র এঁদের দপ্তরে রাখা হত।

থী-বিভাগেরও নিজস্ব অধিকরণ থাকত। মহত্তর, খাড়্গী (খড়্গাধারী প্রহরী বা শান্তিরক্ষা বিভাগের রাজপুরুষ) ও অন্তত একজন বাহনায়ক এই অধিকরণের সঙ্গে যুক্ত থাকতেন। জমি বিক্রি করে বীথী-বিভাগে যে অর্থ আসত, অধিকরণের নির্দেশমত যিনি তা বিলি-বন্দোবস্ত করতেন, তাঁকে বলা হত কুলবারকৃত।

গ্রাম্য শাসনযন্ত্রের কর্তা ছিলেন বোধ হয় গ্রামিক। কোন কোন গ্রামে গ্রামিক ও অষ্টকুলাধিকরণ নামে একটি করে অধিকরণ থাকত। অনেক লিপিতে পঞ্চকুলের উল্লেখ পাওয়া যায়। পঞ্চকুল অনেকটা কৌমতান্ত্রিক পঞ্চায়েতী প্রথার মত। অষ্টকুল বোধ হয় পঞ্চকুলের মতই কোন জনসংঘ— আট জন প্রধান ব্যক্তি নিয়ে গঠিত সমিতি। এই ধরনের বিস্তৃততর গ্রাম্য শাসনযন্ত্রের কাজের সাহায্যের জন্যে একটি পুস্তপালের দপ্তরও থাকত।

শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য বহুল জনপদের বিভিন্ন অধিকরণে শিল্পী, বণিক ও ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধিরা স্থান পেতেন ; কৃষিবহুল, ভূমিনির্ভর জনপদের স্থানীয় বীথী ও গ্রাম্য অধিকরণে মহত্তর, কুটুম্ব, ব্রাহ্মণ ইত্যাদিরা শাসনকাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। এই যুগের রাষ্ট্রযন্ত্র অর্থবান ও ভূমিবান সমৃদ্ধ শ্রেণী ও ব্রাহ্মণদের একেবারে অবজ্ঞা করতে পারেনি।

ষষ্ঠ শতকে স্বাধীন স্বতন্ত্র রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গে নতুন রাষ্ট্রযন্ত্রেরও পত্তন হল। কিন্তু তা গুপ্ত-রাষ্ট্রযন্ত্রের একেবারে নকল।

স্বাধীন বঙ্গরাষ্ট্র

অষ্টম শতকের মাঝামাঝি পালবংশ প্রতিষ্ঠিত হবার পর সমস্ত দিক দিয়ে রাষ্ট্রযন্ত্রের বিস্তার ও জটিলতা দেখা গেল। আগের মতই এ-যুগেও এবং পরের যুগেও রাষ্ট্রবিন্যাসের গোড়ার কথা হল রাজতন্ত্র। সাম্রাজ্য, রাজকীয় মর্যাদা ও রাষ্ট্রীয় প্রভাব বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে রাজাদের উপাধির জাঁকজমকও বেড়ে গেল। পাল ও চন্দ্র বংশের রাজারা শুধু মহারাজাধিরাজ নন, তাঁরা হলেন পরমেশ্বর ও পরমভট্টারক। বাংলাদেশে এই সময় ভগবানের অবতার ও পরমগুরু বলে রাজার ঢাক পেটানো হল। রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র যুবরাজ। সাবালক হলেই তিনি যৌবরাজে অভিষিক্ত হতেন। রাজারা রাষ্ট্র পরিচালনায় ভাইদেরও সাহায্য ও উপদেশ নিতেন। রাজকীয় মহিমা ও মর্যাদায় মহিষীরও স্থান ছিল।

পাল-আমলে সামন্ততন্ত্রের ভিত আরও মজবুত ও পাকাপোক্ত হয়ে ওঠে।

সুবিস্তৃত সাম্রাজ্যের এখানে সেখানে বিক্ষিপ্ত সামন্তদের সংখ্যাও ছিল অনেক। এঁরা অনেকেই বিজিত রাজ্য ও রাষ্ট্রের প্রভু ছিলেন। মাঝে মাঝে উৎসব-অনুষ্ঠানে রাজসভায় এসে এঁরা মহারাজাধিরাজ সম্রাটকে প্রণতি জানিয়ে নিজেদের অধীনতার স্বীকৃতি জানাতেন। রাজন্, রাজনক, রাজন্য, রাণক, সামন্ত, মহাসামন্ত ইত্যাদি রাজপাদোপজীবীরা সবাই ছিলেন নানা স্তরের সামন্ত নরপতি।

পাল চন্দ্র পর্বের রাষ্ট্রেই প্রথম মন্ত্রী বা সচিব নামে একজন প্রধান রাজপুরুষের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। ইনি রাজা ও সম্রাটের সমস্ত কাজের প্রধান সহায়ক, কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রযন্ত্রের সর্বপ্রধান কর্মচারী। বংশানুক্রমিক মন্ত্রিত্বপদ পালরাষ্ট্রেই প্রচলিত হয়েছিল। শুধু মন্ত্রিত্বপদে নয়, অন্যান্য অনেক পদেই পাল, বর্মণ ও সেনবংশীয় রাজারা বংশানুক্রমিক নিয়োগপ্রথা মেনে চলতেন। গুপ্তরাষ্ট্রের আমলেই এই প্রথা বহুল প্রচলিত হয়েছিল।

প্রধানমন্ত্রী বা সচিব ছাড়াও কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের কাজে আরও কয়েকজন মন্ত্রী সহায়তা করতেন। অমাত্য সাধারণভাবে উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী; কুমারামাত্য হলেন বিষয়ের সর্বময় কর্তা; মহাসান্ধিবিগ্রহিক হলেন পররাষ্ট্র সংক্রান্ত যুদ্ধ ও শান্তির ব্যাপারে উচ্চতম রাজকর্মচারী; যুদ্ধবিগ্রহ সম্পর্কে উচ্চতম রাজপুরুষ মহাসেনাপতি; মহাদণ্ডনায়ক হলেন বিচার বিভাগের সর্বময় কর্তা; মহাক্ষপটলিক আয়ব্যয় বিভাগের কর্তা; রাজস্থানীয় হলেন রাজপ্রতিনিধি। এঁরা সবাই রাষ্ট্রযন্ত্রে একেকটি প্রধান বিভাগের সর্বময় কর্তা; রাজধানীতে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের সদর দপ্তরে বসে এঁরা বিভিন্ন বিভাগের কাজ পরিচালনা করতেন। এঁরা ছাড়াও কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রযন্ত্রের আরও কয়েকজন পরিচালক থাকতেন; তাঁদের উপাধি ছিল অধ্যক্ষ এবং কাজ ছিল রাজকীয় অসামরিক বিভাগের হাতী, ঘোড়া, গাধা, খচ্চর, গরু, মোষ, ভেড়া, ছাগল প্রভৃতি পশুর রক্ষণাবেক্ষণ করা। নৌকাধ্যক্ষ ছিলেন রাজকীয় নৌবাহিনীর ও বলাধ্যক্ষ ছিলেন রাজকীয় পদাতিক সৈন্যবাহিনীর অধ্যক্ষ। ধর্ম ও ধর্মানুষ্ঠান ব্যাপার সুনিয়ন্ত্রিত করবার জন্যে পাল-চন্দ্র আমলের কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রযন্ত্রে কয়েকজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী যুক্ত থাকতেন।

রাষ্ট্রের প্রধান বিভাগ ভুক্তি; তার নিচে বিষয়। বিষয়ের ঠিক নিচে সম্ভবত মণ্ডল। বিষয়ের শাসনকাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন জ্যেষ্ঠ কায়স্থ, মহামহত্তর, মহত্তর এবং দাশগ্রামিক। দাশগ্রামিক দশটি গ্রামের কর্তা। বিষয়ের

অধীনে দশটি করে গ্রামের একেকটি উপবিভাগ ছিল বলে মনে হয়। গ্রামের স্থানীয় শাসনকার্যের ভারপ্রাপ্ত রাজকর্মচারীর নাম গ্রামপতি।

কম্বোজ-রাষ্ট্রে প্রাদেষ্টৃ নামে এক শ্রেণীর উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন; তাঁদের কাজ ছিল কর আদায়, শান্তিরক্ষা ইত্যাদি। রাষ্ট্রযন্ত্রের বহু বিভাগ; প্রত্যেক বিভাগে একজন করে অধ্যক্ষ থাকতেন। প্রত্যেক বিভাগের অধীনে বহু করণ বা কেরানী কর্মচারী ছিলেন। যুদ্ধবিগ্রহ বিভাগের কর্তা ছিলেন সেনাপতি। তাঁর অধীনে ছিলেন সৈনিক-সংঘের প্রধান কর্মচারীরা। পররাষ্ট্র বিভাগের কর্তা ছিলেন দূত। এই বিভাগের আবার দুটো উপবিভাগ—একটিতে মন্ত্রপালেরা, অন্যটিতে গূঢ়পুরুষেরা। পররাষ্ট্র ব্যাপারে মন্ত্রপালেরা সাধারণত দূতকে মন্ত্রণা দিতেন; গূঢ়পুরুষেরা গোপনীয় খবর সরবরাহ করতেন।

পাল ও চন্দ্র রাষ্ট্রযন্ত্রেরও এই রকমের নানা বিভাগ ছিল। বিচার-বিভাগের কর্তা মহাদণ্ডনায়ক; তাঁর নিচে দণ্ডনায়ক। কায়িক, বাচনিক ও মানসিক দশ রকমের অপরাধের বিচার করতেন ও জরিমানা আদায় করতেন দাশাপরাধিক। ভাগ, ভোগ, কর, হিরণ্য ও উপরিকর আদায়ের জন্যে ছিল রাজস্ববিভাগ। ভোগপতি, মহাভোগিক, ষষ্ঠাধিকৃত, তরিক, দাশাপরাধিক, চৌরোদ্ধরণিক, শৌল্কিক, গৌল্মিকেরা একেকজন একেক রকমের কর আদায় করতেন। আয়ব্যয়-হিসাব বিভাগের সর্বময় কর্তা ছিলেন মহাক্ষপটলিক। রাজকীয় দলিলপত্র থাকত জ্যেষ্ঠ কায়স্থের তত্ত্বাবধানে। ক্ষেত্রপ ছিলেন চাষ-করা জমি ও চাষযোগ্য জমির সর্বোচ্চ হিসাব-রক্ষক ও পর্যবেক্ষক। প্রমাতৃ ছিলেন জমির মাপ-জোখ, জরিপ ইত্যাদি বিভাগের কর্তা। পররাষ্ট্র বিভাগের ওপরওয়ালা ছিলেন দূত; তাঁর অধীনে মন্ত্রপাল ও গূঢ়পুরুষেরা। এঁদের সকলের ওপরে বোধহয় মহাসান্ধিবিগ্রহিক। শান্তিরক্ষা বিভাগে ছিলেন মহাপ্রতীহার, দাণ্ডিক, দাণ্ডপাশিক, দণ্ডশক্তি, অঙ্গরক্ষ বা দেহরক্ষী, চাটভাট প্রভৃতি। খোল খুব সম্ভব এই বিভাগের গুপ্তচর। সৈন্যবিভাগের সর্বোচ্চ রাজপুরুষ মহাসেনাপতি; তাঁর নিচে সেনাপতি। পদাতিক সেনার কর্তা বলাধ্যক্ষ; নৌবলের কর্তা নৌকাধ্যক্ষ। উষ্ট্রবলের কর্তা ব্যাপৃতক। কোট্টপাল দুর্গরক্ষক; প্রান্তপাল রাজ্যসীমার রক্ষাকর্তা; যুদ্ধের সময় ব্যূহ-রচনার কর্তা মহাব্যূহপতি।

এ ছাড়া আরও অনেক রাজপুরুষ ছিলেন। যেমন: অভিত্বরমান (যে

খুব চটপট যাতায়াত করে), গমাগমিক (যাতায়াতকারী), দূতপ্রৈষণিক (দূতের সংবাদবাহী), খণ্ডরক্ষ (শান্তিরক্ষা বিভাগের অধ্যক্ষ অথবা শুল্ক-পরীক্ষক), শরভঙ্গ (তীরন্দাজ সৈন্যদের অধ্যক্ষ) ইত্যাদি।

আগেকার আমলে রাষ্ট্রযন্ত্রের সঙ্গে স্থানীয় জন-প্রতিনিধিদের যতটুকু যোগাযোগ ছিল, পাল আমল থেকে তারও অভাব দেখা গেল। গ্রাম্য স্থানীয় শাসনকাজে ছাড়া আর কোথাও এই সব প্রতিনিধিদের কোন প্রভাব ছিল বলে মনে হয় না। সমাজ-বিন্যাসের একটা বড় অংশের দায়িত্ব ও অধিকার এই সময় রাষ্ট্রের কুক্ষিগত হয়ে পড়ল। আমলাতন্ত্রের বিস্তৃতি, রাষ্ট্রযন্ত্রের স্ফীতি ও সূক্ষ্মতর বিভাগের ভেতর দিয়ে রাষ্ট্রের বাহু সমাজের সর্বাঙ্গ বেঁধে ফেলল। রাষ্ট্রযন্ত্রের সঙ্গে জনসাধারণের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হতে লাগল।

এই ধারাই সেন-বর্মণ রাজাদের আমলে আরও প্রবল আকারে দেখা দিল। আমলাতন্ত্র আরও ফুলে ফেঁপে উঠল; রাজা ও রাজপরিবারের জাঁকজমক বেড়ে গেল; রাষ্ট্রযন্ত্রের একাংশে ব্রাহ্মণ ও পুরোহিততন্ত্র জাঁকিয়ে বসল : গ্রাম থেকে পাড়া পর্যন্ত রাষ্ট্রযন্ত্রের বাহু বিস্তৃত হল।

এই আমলেও সামন্তেরা যেমন প্রবল, সংখ্যার দিক থেকেও তাঁরা তেমনি প্রচুর ছিলেন। মন্ত্রীরাও সংখ্যায় প্রচুর ছিলেন। নানা রাষ্ট্রকর্মে নিযুক্ত প্রধান প্রধান মন্ত্রীদের মধ্যে বৃহদুপরিক, মহাভোগপতি, মহাধর্মাধ্যক্ষ, মহাসেনাপতি, মহাগণস্থ, মহাসমুদ্রাধিকৃত, মহাসর্বাধিকৃত, মহাবলাধিকরণিক, মহাবলাকোষ্ঠিক, মহাকরণাধ্যক্ষ, মহাপুরোহিত, মহাতন্ত্রাধিকৃত প্রভৃতি রাজপুরুষদের দেখা যায়। তাছাড়া রাষ্ট্রযন্ত্রে এই আমলে পুরোহিততন্ত্রের প্রভাব-প্রতিপত্তি খুবই বেড়ে গিয়েছিল।

ভুক্তিপতির শাসনাধীনে ছিল ভুক্তি, মণ্ডলপতির শাসনাধীনে মণ্ডল, বিষয়পতির শাসনাধীনে ছিল বিষয়। বিষয় বা মণ্ডলের নিচে গ্রাম-সংক্রান্ত স্থানীয় বিভাগ-উপবিভাগের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছিল এবং ছোটবড় একাধিক নতুন বিভাগের সৃষ্টি হয়েছিল। কোন কোন ক্ষেত্রে মণ্ডলের নিচে ছিল চতুরক; বোধ হয় গোড়ায় চারটি গ্রাম নিয়ে ছিল চতুরক। পাটক বা পাড়া ছিল একেবারে নিম্নতম রাষ্ট্রীয় বিভাগ। এই আমলে স্থানীয় জনসাধারণের সঙ্গে রাষ্ট্রের যোগাযোগ একেবারে ধুয়ে মুছে গিয়েছিল।

বিচার বিভাগে এই আমলে মহাধর্মাধ্যক্ষের দেখা পাওয়া যায়। বিচার-সংক্রান্ত ব্যাপারে যিনি শপথ বা অঙ্গীকার করাতেন, তাঁর নাম অঙ্গীকরণিক।

হট্টপতি ছিলেন হাটবাজারের কর্তা। রাজকীয় বিশ্রামস্থান, ভোজনশালা, পানীয়াগার প্রভৃতির ভারপ্রাপ্ত কর্তা ছিলেন পানীয়াগারিক। রাষ্ট্রের অতিথিশালা বা রাজকীয় বাসভবনের তদারক করতেন বাসাগারিক। ঔখিতাসনিক রাজসভা ও রাজদরবারের আসনসজ্জার ব্যবস্থা করতেন। রাষ্ট্রযন্ত্রের সমস্ত করণের সর্বময় কর্তা ছিলেন মহাকরণাধ্যক্ষ। রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারের প্রধান ছিলেন মহামন্ত্রী বা মহামহত্তর। পররাষ্ট্র বিভাগের প্রধান ছিলেন মহাসান্ধিবিগ্রহিক। শিরোরক্ষক ও খড়্গগ্রাহ শান্তিরক্ষা বিভাগের কর্মচারী। আরোহক অশ্বারোহী প্রহরী। সৈন্যবিভাগে অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন মহাপিলুপতি, মহাগণস্থ, মহাবলাধিকরণিক, মহাবলাকোষ্ঠিক এবং বৃদ্ধধানুষ্ক। মহাপিলুপতি হস্তীসৈন্যের অধ্যক্ষ। ২৭টি রথ, ২৭টি হস্তী, ৮১টি ঘোড়া ও ১৩৫জন পদাতিক সৈন্য নিয়ে এককেটি গণ; এই সৈন্য-গণের যিনি সর্বময় কর্তা, তিনি মহাগণস্থ। মহাবলাধিকরণিক সৈন্য-সংক্রান্ত অধিকরণের প্রধান কর্তা। মহাবলাকোষ্ঠিক ও বৃদ্ধধানুষ্ক সামরিক কর্মচারী। দৌঃসাধনিকেরা ঠিক কী করতেন বোঝা না গেলেও, তাঁদের কাজটা দুঃসাধ্য ছিল তা বোঝা যায়। মহামুদ্রাধিকৃতের কাছে থাকত রাজকীয় মুদ্রা বা শীলমোহর। এ ছাড়াও একসরক, মহকটুক, শান্তকিক, তদানিযুক্তক, খণ্ডপাল প্রভৃতি আরও অনেক রাজপুরুষ ছিলেন।

বিভিন্ন পর্বের রাষ্ট্রবিন্যাস থেকে প্রাচীন বাংলার রাষ্ট্র সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা পাওয়া যায়। মহারাজাধিরাজের ক্ষমতা ও অধিকার ছিল অবাধ। তিনি শুধু দণ্ডমুণ্ডের সর্বময় কর্তা নন, শুধু শাসন, সমর ও বিচারের একচ্ছত্র অধিপতি নন, সমস্ত রকম দায় ও অধিকারের তিনিই উৎস। কিন্তু রাজার ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা সংস্কারের ওপর কিছু কিছু বাধা-বন্ধনও ছিল। তারই ফলে, তাঁর একেবারে পুরোপুরি স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠা সম্ভব হয়নি। প্রথম বাধা-বন্ধনের কারণ মহামন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রিবর্গ। এঁদের উপদেশ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাজাকে মেনে চলতে হত। অন্য এক বাধা-বন্ধনের কারণ ছিলেন সামন্ত-মহাসামন্তেরা। মিত্র ও সামন্ত-মহারাজদের অবজ্ঞা করে চলা কোন মহারাজাধিরাজের পক্ষেই সম্ভব ছিল না। কোন রাজা বা রাজবংশ নিজেদের রুচি, প্রবৃত্তি ও সংস্কার অনুযায়ী রাষ্ট্রকে প্রভাবিত করলেও রাষ্ট্র-ব্যবস্থাকে কখনই নতুন করে ঢেলে সাজতেন না। চিরাচরিত সংস্কার, শাস্ত্র ও ধর্ম-নির্দেশ তাঁদের মেনে চলতে হত।

শাসনব্যবস্থা ছিল খুব বিস্তৃত, সুবিন্যস্ত ও সুপরিচালিত। জনপদবাসীদের ওপর রাজপুরুষদের অত্যাচার, উৎপীড়ন কম হত না। প্রাচীনকালে গ্রাম্য বাঙালী গৃহস্থের একটি বড় কামনা ছিল : "বিষয়পতিরা যেন লোভহীন হন।" চাটভাট প্রভৃতি 'উপদ্রবকারী'দের সংখ্যাও কম ছিল না। নানা রকমের করভার তো ছিলই, তার ওপর আবার রাজপুরুষরা নানাভাবে উপরি আদায় করতেন।

পাল ও সেন আমলে ভূমিবান মহত্তর, কুটুম্ব, সাধারণ গৃহস্থের মোটামুটি স্বাচ্ছল্য থাকলেও ভূমিহীন গৃহস্থ ও সমাজ-শ্রমিকদের যে কী দুরবস্থা ছিল, পুরনো চর্যাপদ গীতি ও সদুক্তিকর্ণামৃত থেকে তার যথেষ্ট আভাস পাওয়া যায়।

একটি গীতিতে বলা হয়েছে : 'টিলাতে আমার ঘর, পাড়াপড়শী নেই। হাঁড়িতে ভাত নেই ; সারাদিন ক্ষিধেয় ধুঁকছি।' অন্যত্র বলা হচ্ছে : 'শিশুরা ক্ষুধার্ত, তাদের দেহ কঙ্কালসার, বন্ধুবান্ধবেরা বিমুখ, পুরনো ফুটোফাটা পাত্রে সামান্যই জল ধরে—এসবও আমায় তেমন কষ্ট দেয়নি, যেমন কষ্ট দিয়েছিল যখন দেখেছিলাম আমার গৃহিণী ছেঁড়া কাপড় সেলাই করার জন্যে রাগী প্রতিবেশিনীর কাছ থেকে ছুঁচ চাইছেন।' আরও নির্মম, আরও নিষ্করুণ চিত্র আছে : 'পরনে তার ছেঁড়া কাপড়, বিষণ্ণ শীর্ণ দেহ। ক্ষিধেয় শিশুদের চোখ গর্তে-ঢোকা, পেট-পিঠ এক হয়ে গেছে ; তারা খাবে বলে কাঁদছে। দীন দুঃস্থ ঘরের বউ চোখের জলে বুক ভাসিয়ে প্রার্থনা করছেন, একমুঠো চালে যেন একশো দিন চলে।' অন্য একটি শ্লোকে ঘরের বর্ণনা পাওয়া যায় : 'কাঠের খুঁটি নড়ছে, মাটির দেয়াল গলে পড়ছে, চালের খড় উড়ে যাচ্ছে ; কেঁচোর সন্ধানে আসা ব্যাঙেরা আমার ভাঙা ঘর ছেয়ে ফেলেছে।'

সাধারণ মানুষের এই দুঃখদৈন্য নিয়ে রাষ্ট্র এতটুকু মাথা ঘামাত বলে মনে হয় না।

রাজারাজড়া

আলেকজান্দারের ভারত-অভিযান সম্পর্কে গ্রীক ও লাতিন লেখকেরা যা লিখে গিয়েছেন, তা থেকে চতুর্থ শতকের তৃতীয় পাদে বাংলার রাজারাজড়াদের কথা কিছুটা জানা যায়। এই সময় প্রাচ্যরাষ্ট্র ও গঙ্গারাষ্ট্র এক রাজার অধীনে আসে এবং একটি যুক্তরাষ্ট্র গড়ে ওঠে। এই যুক্তরাষ্ট্রের রাজা ছিলেন ঔগ্রসৈন্য। তাঁর পিতা উগ্রসেন বা মহাপদ্মনন্দ।

মৌর্য-সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত নন্দবংশ ধ্বংস করে শুধু সুবিস্তৃত নন্দ-সাম্রাজ্যেরই অধিপতি হননি, সেই সঙ্গে নন্দদের বিপুল সৈন্য-সামন্ত ও অগাধ ধনরত্নের অধিকারী হয়েছিলেন। মহাপদ্ম ও তাঁর পুত্রদের গঙ্গারাষ্ট্রও মৌর্য-সম্রাটদের অধীনে এসেছিল। পুণ্ড্রবর্ধন বা উত্তর-বঙ্গ মৌর্য-সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল।

গুপ্ত রাজবংশ

খৃষ্টোত্তর চতুর্থ শতকের গোড়ায় গুপ্তরাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে পর্যন্ত রাজা ও রাজবংশ সম্পর্কে এর চেয়ে বেশি কিছু খবর পাওয়া যায় না। প্রথম চন্দ্রগুপ্তের পুত্র সমুদ্রগুপ্তের আমলে এক সমতট ছাড়া বাংলার প্রায় সমস্ত জনপদই গুপ্ত-সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পুত্র প্রথম কুমারগুপ্তের আমল থেকে একেবারে ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত বাংলার গুপ্ত-রাজত্বের প্রধানতম কেন্দ্র ছিল পুণ্ড্রবর্ধন। এই রাষ্ট্রবিভাগ গুরুত্বপূর্ণ বলেই সম্রাট স্বয়ং এর শাসনকর্তা নিযুক্ত করতেন।

গুপ্ত আমলে স্বর্ণমুদ্রা দিনার ও রৌপ্যমুদ্রা রূপক ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। সাধারণ গৃহস্থরাও জমি কেনাবেচায় এইসব মুদ্রা ব্যবহার করতেন! এই যুগেই বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি বাণিজ্য-সমৃদ্ধি দেখা গিয়েছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যের সমৃদ্ধি ছিল বলেই রাষ্ট্রে বণিক, শ্রেষ্ঠী, ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের রীতিমত

প্রাধান্য ছিল। রাষ্ট্রের অধিকরণগুলিতে শিল্পী, বণিক ও ব্যবসায়ী সমাজের প্রতিনিধিদেরই সংখ্যাধিক্য। এই যুগে বাংলার সামাজিক ধনদৌলত ছিল এঁদেরই হাতে এবং সেই ধনদৌলতের জোরেই রাষ্ট্র ফেঁপে উঠেছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রে কৃষিসমাজের কোন স্থান ছিল না বললেই চলে। মধ্যবিত্ত সমাজের আয় ছিল কিছুটা জমি থেকে, কিছুটা ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প থেকে। নগর ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্পের কেন্দ্র। নাগরিকেরা বিলাসব্যসনে সময় কাটাতেন।

গুপ্তরাজবংশ ছিল ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী। এঁদের রাজত্বকালেই ভারতবর্ষে পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বা হিন্দুধর্মের অভ্যুত্থান ও প্রসার হয়। জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি রাজকীয় উদারতা থাকলেও ব্রাহ্মণ্য ধর্মই বিশেষ প্রশ্রয় পেয়েছিল।

আর্য স্রোত

তারই ফলে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ্য সমাজ রাষ্ট্রের অন্যতম ধারক ও পোষক শ্রেণী হিসেবে গড়ে উঠতে আরম্ভ করে এবং এঁরাই হয়ে ওঠেন ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতির নিয়ন্তা। এঁদের অবলম্বন করেই বাংলাদেশে আর্যভাষা, আর্য-ধর্ম ও আর্য-সংস্কৃতির স্রোত বাংলাদেশে সবেগে আছড়ে পড়ল। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণকথা, বিচিত্র লৌকিক কাহিনী ইত্যাদি সেই স্রোতের মুখে ভেসে এসে বাংলার প্রাচীনতর ধর্ম, সংস্কৃতি, লোক-কাহিনীকে একপ্রান্তে ঠেলে নামিয়ে দিল। উচ্চতর শ্রেণীগুলির ভাষা হল আর্যভাষা, ধর্ম হল বৌদ্ধ, জৈন বা পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম। আর্য-আদর্শ অনুযায়ী সাংস্কৃতিক আদর্শ গড়ে উঠল।

বঙ্গ-গৌড়ের স্বাতন্ত্র্য

খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকে দুর্ধর্ষ হূণেরা ভারতের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং গুপ্ত-সাম্রাজ্যের বুকে বসে তার ভিত নাড়িয়ে দিল। গুপ্ত-সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ষষ্ঠ শতকের গোড়ায় বঙ্গ ও তারপর শেষের দিকে গৌড় স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করল।

মোটামুটি ষষ্ঠ শতকের দ্বিতীয় পাদ থেকে তৃতীয় পাদ পর্যন্ত তিনজন মহারাজাধিরাজের খবর পাওয়া যায়, যাঁদের রাজ্য বর্ধমান অঞ্চল থেকে আরম্ভ করে একেবারে ত্রিপুরা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এঁদের নাম গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য

এবং নরেন্দ্রাদিত্য সমাচারদেব। সমাচারদেবের পর আরও কয়েকজন রাজা এইসব অঞ্চলে রাজত্ব করেছিলেন ; এঁদের মধ্যে একজনের নাম পৃথুজবীর ও আরেকজনের নাম সুধন্যা। বাদামীর চালুক্যরাজ কীর্তিবর্মা ষষ্ঠ শতকের শেষের দিকে কোন সময়ে বঙ্গদেশ জয় করেছিলেন। বঙ্গের স্বাতন্ত্র্য কিছুদিনের জন্যে ক্ষুণ্ণ হয়েছিল।

সপ্তম শতকের গোড়া থেকে তৃতীয় পাদ পর্যন্ত সমতটে একটি বৌদ্ধ খড়্গ রাজবংশের খবর পাওয়া যায়। নৃপাধিরাজ খড়্গোদ্যম, জাতখড়্গ, দেবখড়্গ ও রাজরাজভট্ট এই বংশের রাজা। খড়্গোরা বোধহয়

খড়্গবংশ

সামন্তবংশ ছিলেন। মনে হয়, এঁরা কোন পার্বত্য কোমের প্রতিনিধি। প্রথমে বোধহয় বঙ্গে এঁরা রাজত্ব করতেন, পরে সমতটে রাজ্য বিস্তার করেন।

আরেকটি সামন্ত রাজবংশের সন্ধান পাওয়া যায়। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন একজন অধিমহারাজ। শিবনাথ, শ্রীনাথ, ভবনাথ, লোকনাথ—সকলেই এই বংশের সামন্ত।

ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী সামন্ত রাতবংশ সপ্তম শতকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাদে সমতটের অধীশ্বর ছিলেন। শ্রীজীবধারণ রাত ছিলেন এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর পুত্র শ্রীধারণ ছিলেন পরমবৈষ্ণব, পরমকারুণিক ; তিনি

রাতবংশ

ছিলেন একাধারে কবি, রচয়িতা, শব্দশাস্ত্রজ্ঞ এবং নানা বিদ্যা ও কলায় পারদর্শী। তাঁর পুত্র বলধারণও শব্দবিদ্যা, শস্ত্রবিদ্যা এবং হস্তী ও অশ্ববিদ্যায় সুনিপুণ ছিলেন।

নামে সামন্ত হলেও খড়্গবংশ, লোকনাথের বংশ ও রাতবংশের রাজারা কার্যত স্বাধীন নরপতির মতই ব্যবহার করতেন। সপ্তম শতকের শেষাশেষি কি অষ্টম শতকের গোড়া পর্যন্ত বঙ্গ ও সমতটের স্বাতন্ত্র্য বজায় ছিল। কিন্তু ঘন ঘন রাজবংশের বদল ও সামন্তদের প্রবল আধিপত্য দেখে মনে হয় এই স্বাতন্ত্র্যের ভিত আল্‌গা হয়ে পড়ছিল।

ষষ্ঠ শতকের শেষ পঁচিশ বছরের আগে পুণ্ড্রবর্ধন ও গৌড় স্বাতন্ত্র্য লাভ করতে পেরেছিল বলে মনে হয় না। সপ্তম শতকের গোড়ায়

শশাঙ্ক

শ্রীমহাসামন্ত শশাঙ্ক গৌড়ের স্বাধীন রাজা হিসেবে দেখা দেন।

মহাসামন্ত হিসেবে শশাঙ্কের প্রথম পরিচয়। খুব সম্ভবত, তিনি গুপ্ত রাজাদেরই মহাসামন্ত ছিলেন। সপ্তম শতকের গোড়ায় অথবা তার কাছাকাছি

কোন সময়ে তিনি গৌড়ের স্বাধীন রাজা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পান। কর্ণসুবর্ণ হয় তাঁর রাজধানী। কজঙ্গল, পুণ্ড্রবর্ধন, কর্ণসুবর্ণ, তাম্রলিপ্তি—পাঁচটির মধ্যে বাংলার এই চারটি জনপদই শশাঙ্কের রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। শশাঙ্ক কীর্তিমান নরপতি ছিলেন। কনৌজ-স্থানীশ্বর-কামরূপ—উত্তর-ভারতের এই সেরা রাষ্ট্রগুলির সমবেত শক্তির বিরুদ্ধে তিনি সার্থকভাবে লড়াই করেন এবং শেষ পর্যন্ত স্বাধীন রাজা হিসেবে সুবিস্তৃত রাজ্যের অধিকারী হন। হর্ষবর্ধনকে যদি কেউ সার্থকভাবে প্রতিরোধ করে থাকেন, তবে তা শশাঙ্ক এবং চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীই করেছিলেন। উত্তর-ভারতের আধিপত্য নিয়ে পরে পাল আমলে যে সুদীর্ঘ সংগ্রাম হয়েছিল, তার প্রথম সূচনা করেছিলেন শশাঙ্ক। তিনিই সর্বপ্রথম বাংলাদেশকে উত্তর-ভারতে রাষ্ট্রীয় পটভূমিকায় দাঁড় করিয়েছিলেন। কামরূপরাজ ভাস্করবর্মা ও হর্ষবর্ধনের সম্মিলিত শত্রুতা সত্ত্বেও মৃত্যুর আগে পর্যন্ত গৌড় দেশ, মগধ-বুদ্ধগয়া অঞ্চল এবং কঙ্গোদ ও উৎকল দেশের অধিপতি ছিলেন।

শশাঙ্কের মৃত্যুর পর গৌড় ও মগধের অধিকার নিয়ে প্রায় কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। প্রত্যেকটি জনপদই স্বাতন্ত্র্যের দিকে ঝুঁকল। ভাস্করবর্মা পুণ্ড্রবর্ধন ও কর্ণসুবর্ণ এবং হর্ষবর্ধন কঙ্গোদ, কজঙ্গল ও মগধ জয় করে নিলেন। সপ্তম শতকের মাঝামাঝি শশাঙ্কের গৌড়-রাজ্য তছনছ হয়ে গেল। গৌড়কে কেন্দ্র করে শশাঙ্ক বৃহত্তর গৌড়তন্ত্র গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন; তা অন্তত কিছুকালের জন্যে ধূলিসাৎ হল। অষ্টম শতকের শেষ পঁচিশ বছরে গৌড়ের একজন রাজা শশাঙ্কের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে গুপ্তবংশকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করেন এবং মগধের অধিপতি হন। কিন্তু সে-চেষ্টা সত্ত্বেও গৌড়তন্ত্র আর বাঁচিয়ে তোলা গেল না।

শশাঙ্কের আমলে রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্য লাভের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্র অনেক বেশি আত্মসচেতন হয়েছে, নতুন নতুন সামাজিক দায় ও কর্তব্য এসে হাজির হয়েছে। ভুক্তি-উপরিকের ক্ষমতা এযুগে বেড়েছে। আমলাতন্ত্রের ফলাও ব্যবস্থা এই যুগেই শুরু হয়েছে। সমাজের অন্তঃপুরেও রাষ্ট্র হাত বাড়াবার চেষ্টা করছে। আগে যা ছিল পল্লী বা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের অন্তর্গত, আস্তে আস্তে তা রাষ্ট্রের তাঁবে এসে যাচ্ছে। বিষয়াধিকরণে মহত্তর ও ব্যাপারী বা ব্যবহারীদের স্থান ছিল।

বাংলাদেশে এই আমলেই পুরোপুরি সামন্ততন্ত্র রচনারও সূত্রপাত হয়।

কোন কোন সামন্ত প্রায় স্বতন্ত্র স্বাধীন রাজার মতই রাজত্ব করতেন। অবশ্য মুখে বা দলিলপত্রে তাঁরা ঐ স্বাতন্ত্র্য প্রচার করতেন না। কিন্তু মহারাজাধিরাজের ক্ষমতা ও রাষ্ট্র দুর্বল হলে বা কোন রকম সুযোগ পেলেই তাঁরা নিজেদের স্বাধীন বলে ঘোষণা করে বসতেন। কোন কোন সামন্ত-মহাসামন্ত মহারাজাধিরাজের অধীনে উচ্চ রাজকর্মচারী হিসেবেও কাজ করতেন। রাজাদেরও আবার একদল সামন্ত থাকত। সামন্তেরা যুদ্ধবিগ্রহের সময় মহারাজাধিরাজকে সৈন্য যোগাতেন এবং নিজেরা যুদ্ধে যোগ দিয়ে মহারাজাধিরাজকে সাহায্য করতেন।

বঙ্গ, সমতট, গৌড় প্রত্যেক রাষ্ট্রেই এযুগেও স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন ছিল। তবে খাঁটি মুদ্রার বদলে এই সময় নকল মুদ্রা চলতে শুরু করেছে। রুপোর মুদ্রা একেবারেই নেই। ব্যবসা-বাণিজ্যে মন্দা দেখা দিয়েছে। মহত্তর-গ্রামিক-কুটুম্ব ভূস্বামীদের প্রতিপত্তি বাড়ছে। এই যুগেই জমির চাহিদা বেড়ে গিয়ে সমাজ ক্রমশ ভূমিনির্ভর হয়ে পড়ছে।

এই যুগের বঙ্গ ও সমতটের রাজারা সবাই ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী। শশাঙ্ক ও ভাস্করবর্মা ছিলেন শৈব ; রাজবংশের মধ্যে একমাত্র খড়্গ রাজারাই ছিলেন বৌদ্ধ। জনসাধারণের বেশ একটা বড় অংশে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কার প্রচলিত ছিল ; কিন্তু সপ্তম শতকের শেষ পঁচিশ বছরের আগে পর্যন্ত বৌদ্ধধর্ম রাষ্ট্রের ও রাজবংশের কোন অনুগ্রহ বা সমর্থন পায়নি। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতিই সমানে রাজকীয় সমর্থন ও পোষকতা লাভ করেছে।

শশাঙ্কের বৌদ্ধবিদ্বেষ সম্পর্কে অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে। এর সবটাই নিছক কল্পনা বলে মনে হয় না। এই বৌদ্ধবিদ্বেষের কারণ সহজেই অনুমান করা যায়। প্রথমত, এইযুগে বাংলা ও আসামের সর্বত্র ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও সংস্কৃতি ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছিল ; কোন কোন রাজবংশের পক্ষে এই নতুন ধর্ম ও সংস্কৃতির গোঁড়া পাণ্ডা হওয়া অস্বাভাবিক নয়। বিশেষত, যেসব উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতি বিস্তার লাভ করছিল, তারাই ছিল রাষ্ট্রের প্রধান খুঁটি। দ্বিতীয়ত, শশাঙ্কের অন্যতম প্রধান শত্রু হর্ষবর্ধন ছিলেন বৌদ্ধধর্মের বড় সমর্থক ; শত্রুর আশ্রিত ও লালিত ধর্ম নিজের না হলে তার প্রতি বিদ্বেষ থাকা স্বাভাবিক। শশাঙ্ক যেসব জায়গায় বৌদ্ধবিদ্বেষ দেখিয়েছিলেন বলে জানা যায়, সবই বাংলার বাইরে। অন্য অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণও থাকতে পারে ; যেমন, বাণিজ্যে বৌদ্ধদের প্রতিপত্তি।

তৃতীয়ত, বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির সমৃদ্ধ বর্ধিষ্ণু অবস্থা ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী রাজা বোধহয় পছন্দ করতে পারতেন না। বৌদ্ধ লেখকেরা শশাঙ্কের নামে যে সব অপবাদ দেন, তার সব সত্যি না হলেও এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, শশাঙ্ক ও তাঁর রাষ্ট্রের ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে পক্ষপাত ছিল। গোটা যুগ সম্বন্ধেই একথা খাটে। কারণ, একটানা দেড়শো বছর ধরে কোন রাষ্ট্র বা রাজবংশই সমসাময়িক বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির কোন পোষকতা করেননি; অন্যদিকে ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও সংস্কৃতি তাঁদের অবারিত দাক্ষিণ্য লাভ করেছে।

মাৎস্যন্যায়

সপ্তম শতকের মাঝামাঝি হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর পূর্ব-ভারতে রাষ্ট্রীয় দুর্যোগ দেখা দেয়। এই সময় থেকে নবম শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত বাংলাদেশ বারবার তিব্বতী অভিযানে বিপর্যস্ত হয়। অষ্টম শতকের প্রায় গোড়ার দিকে হিমালয় উপত্যকাবাসী শৈলবংশীয় কোন রাজা পৌণ্ড্রদেশ বা উত্তরবঙ্গ জয় করেন। মগধ ও গৌড়ে কনৌজরাজ যশোবর্মার আক্রমণের ফলেই বেশি বিপর্যয় দেখা যায়। মগধ ও গৌড় জয় করে যশোবর্মা সমুদ্রতীরের দিকে অগ্রসর হন এবং বঙ্গদেশও জয় করেন। এরপর কাশ্মীররাজ মুক্তাপীড় ললিতাদিত্যের হাতে যশোবর্মা শোচনীয়ভাবে পরাস্ত হন। গৌড় কিছুদিনের জন্যে হলেও কাশ্মীর-রাজের বশ্যতা স্বীকার করে।

এইসব বৈদেশিক আক্রমণের বিবরণ কতটা সত্যি জানা না গেলেও বিভিন্ন সাক্ষ্যপ্রমাণ দেখে মনে হয়, সপ্তম শতকের মাঝামাঝি থেকে অষ্টম শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত এই একশো বছরে গৌড়রাষ্ট্রে সর্বময় প্রভু কেউই ছিল না। রাষ্ট্রের কোন সামগ্রিক ঐক্য ছিল না। ছোট ছোট সামন্তেরাই নিজের নিজের এলাকায় একচ্ছত্র হয়ে উঠেছিলেন। এই সমৃদ্ধ অথচ বহুবিভক্ত দেশের দিকে স্বভাবতই ভিন্ন প্রদেশের লুব্ধ রাজাদের নজর পড়েছিল।

সপ্তম শতকের প্রায় শেষ পর্যন্ত খড়্গ ও রাতবংশের নায়কত্বে বঙ্গ ও সমতট রাষ্ট্রে মোটামুটি একটা সামগ্রিক ঐক্য বজায় ছিল। খড়্গ বংশের পতনের পর বঙ্গরাষ্ট্র চন্দ্রবংশীয় রাজাদের হাতে আসে। গোবিন্দচন্দ্র ও ললিতচন্দ্র এই বংশের শেষ দুই রাজা।

ললিতচন্দ্রের মৃত্যুর পর সারা বাংলাদেশ জুড়ে দারুণ নৈরাজ্য নেমে এল। গৌড়-বঙ্গ-সমতটে তখন কোন রাজার আধিপত্য নেই। রাষ্ট্র ছিন্নভিন্ন; ক্ষত্রিয়, বণিক, ব্রাহ্মণ, নাগরিক যে যার ঘরে সবাই রাজা। আজ যে রাজা হচ্ছে, রাষ্ট্রীয় প্রভুত্ব দাবি করছে—কাল তার কাটা মুণ্ডু ধুলোয় গড়াগড়ি যাচ্ছে। এই নৈরাজ্যেরই নাম দেওয়া হয়েছে মাৎস্যন্যায়। রাজা নেই, অথচ সবাই রাজার গদিতে বসতে চায়। একশো বছর ধরে চলল এই অবস্থা।

শেষ পর্যন্ত যখন আর এই বাহুবলের উৎপীড়ন সহ্য হল না, তখন সারা বাংলাদেশের রাষ্ট্র-নায়কেরা এক হয়ে নিজেদেরই মধ্যে থেকে একজনকে রাজা নির্বাচন করলেন এবং তাঁর সর্বময় প্রভুত্ব মেনে নিলেন। এই নির্বাচিত রাজার নাম গোপালদেব।

মাৎস্যন্যায়ের এই একশো বছরে শান্তিশৃঙ্খলার অভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থা বেজায় কাহিল হয়ে পড়ল। বাংলাদেশের মুদ্রাজগৎ থেকে স্বর্ণমুদ্রা একেবারেই উধাও হয়ে গেল। সামুদ্রিক বন্দর তাম্রলিপ্তির সৌভাগ্যসূর্য চিরতরে অস্তমিত হল। স্ব স্ব প্রধান সামন্তরাই ছিলেন এযুগের নায়ক। ধর্ম ও সংস্কৃতির দিক থেকে এই একশো বছরের দুর্দিন-দুর্যোগের সুযোগে বাংলাদেশে বড় রকমের রূপান্তর ঘটছিল বলে মনে হয়। যে সংস্কৃত ভাষা বাঙালী পণ্ডিতদের হাতে কোন রকমে ভাব প্রকাশের উপায়মাত্র ছিল, সপ্তম শতকের মাঝামাঝি সেই সংস্কৃত ভাষা অপূর্ব ছন্দলালিত্যপূর্ণ কাব্যময় ভাব প্রকাশের বাহন হয়ে উঠেছে। পালবংশ প্রধানত বৌদ্ধ হওয়ায় বৌদ্ধধর্ম, শিক্ষা ও সংস্কৃতি অষ্টম শতকের শেষ পচিশ বছর থেকেই প্রসার লাভ করেছিল। ব্রাহ্মণ্য ধর্মও আগের যুগের তুলনায় ঢের বেশি বিস্তৃতি লাভ করেছিল এবং এমন কি বৌদ্ধধর্মের সাংস্কৃতিক আদর্শও অনেকটা ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ছাঁচে গড়ে উঠেছিল। বাংলাদেশে পাল-আমল থেকে বৌদ্ধধর্ম ক্রমেই তন্ত্রের দিকে ঝুঁকেছে; এর পেছনে একাধিক তিব্বতী অভিযানের কিছুটা প্রভাব থাকলেও থাকতে পারে। একশো বছরের ডামাডোলের মধ্যে কোন্ ফাঁকে কে কখন কোন্ সংস্কৃতির ধারায় নতুন কোন্ স্রোত বইয়ে দিয়েছিল, ইতিহাস তার কোন হিসেব, এমন কি ইঙ্গিতও রাখেনি।

অষ্টম শতকের মাঝামাঝি কোন সময়ে গোপালদেব পাল-বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। সুদীর্ঘ চারশো বছর ধরে এই রাজবংশ রাজত্ব করে। গোবিন্দপালের সঙ্গে সঙ্গে দ্বাদশ শতকে এই রাজবংশের অবসান ঘটে। গোপালদেবের পিতা দয়িতাবিষ্ণু, পিতামহ বপ্যট। পালরাজাদের আদিবাস বরেন্দ্রভূমিতে। গোপালদেবের কুলগৌরব কিছু ছিল বলে মনে হয় না। বরেন্দ্রী ও বঙ্গে রাজা হয়েই গোপালদেব যথেচ্ছাচারী সামন্তদের শায়েস্তা করেন এবং বহু সামন্ত-নায়কের সহায়তায় সারা বাংলাদেশে নিজের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন।

গোপালদেব

গোপালদেবের পুত্র ধর্মপাল সিংহাসনে বসবার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর-ভারতের আধিপত্য নিয়ে গুর্জরপ্রতীহার, রাষ্ট্রকূট ও পালবংশের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম শুরু হয়ে গেল। বংশপরম্পায় এই সংগ্রাম চলেছিল। প্রতীহার বংশের বৎসরাজের কাছে যখন ধর্মপাল পরাজিত হলেন, ঠিক সেই সময়ে দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুব ঝড়ের মত এসে পড়ে প্রথমে বৎসরাজ ও পরে ধর্মপালকে পরাস্ত করলেন। ধ্রুব দাক্ষিণাত্যে ফিরে যাওয়ায় ধর্মপাল নির্বিবাদে কিছু দিনের মধ্যেই ভোজ (বর্তমান বেরারের অংশ), মৎস্য (আলওয়ার এবং জয়পুর-ভরতপুরের অংশ), মদ্র (মধ্য-পঞ্জাব), কুরু (পুর্ব-পঞ্জাব), যদু (পঞ্জাবের সিংহপুর), যবন (পঞ্জাব বা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের কোন আরব খণ্ডরাষ্ট্র হতে পারে), অবন্তী (বর্তমান মালব), গন্ধার (পশ্চিম-পঞ্জাব) এবং কীর (পঞ্জাবের কাংড়া জেলা) রাজ্য জয় করেন। কনৌজের রাজা ইন্দ্ররাজকে পরাজিত করে তিনি চক্রায়ুধকে সেই সিংহাসনে বসান। ধর্মপাল সম্ভবত নেপালও জয় করেছিলেন। নেপালের অধিকার নিয়েই বোধহয় তিব্বতরাজের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ হয়েছিল। কেন্দ্রীয় পালরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত না হলেও বিজিত রাজ্যের রাজাদের ধর্মপালের বশ্যতা ও আনুগত্য স্বীকার করতে হত। এদিকে বৎসরাজের পুত্র দ্বিতীয় নাগভট কনৌজ আক্রমণ করলেন; চক্রায়ুধ পরাজিত হয়ে ধর্মপালের কাছে পালিয়ে গেলেন। মুদ্গগিরি বা মুঙ্গেরের কাছে তুমুল সংগ্রামে নাগভটের কাছে ধর্মপাল পরাস্ত হলেন। ঠিক এমনি সময় এবারও রাষ্ট্রকূট-রাজ তৃতীয় গোবিন্দ এসে প্রতীহাররাজ নাগভটকে পরাজিত করলেন। ধর্মপাল ও

ধর্মপাল

চক্রায়ুধ তাঁর কাছে নতি স্বীকার করলেন। এবারও রাষ্ট্রকূট-রাজ তৃতীয় গোবিন্দ দাক্ষিণাত্যে ফিরে গেলেন। ধর্মপাল আবার রাহুমুক্ত হলেন। উত্তর-ভারতে তাঁর সর্বময় আধিপত্য অক্ষুণ্নই থাকল।

ধর্মপালের পুত্র দেবপাল যখন রাজা হলেন, প্রতীহার ও রাষ্ট্রকূটেরা তখনও প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ; কাছেই উৎকল ও প্রাগ্‌জ্যোতিষ (কামরূপ) তখন নিজের নিজের রাজবংশের অধীনে পরাক্রান্ত রাষ্ট্র গড়ে তুলেছে ; দূরে দক্ষিণে পাণ্ড্যরাও প্রবল হয়ে উঠেছে। এ অবস্থায় দেবপাল রাজ্যবিস্তারে মন দিলেন। দেবপালের সহায়ক হলেন তাঁর দুই প্রধান মন্ত্রী ; ব্রাহ্মণ দর্ভপাণি ও তাঁর পৌত্র কেদারমিশ্র। এঁদের সাহায্যে দেবপাল হিমালয় থেকে বিন্ধ্য এবং পূর্ব থেকে পশ্চিম সমুদ্রতীর পর্যন্ত সমস্ত উত্তর ভারত থেকে কর ও প্রণতি আদায় করেছিলেন। হূণ-উৎকল-দ্রবিড়-গুর্জরনাথদের দর্প খর্ব করে তিনি সমুদ্রমেখলা রাজ্য ভোগ করেছিলেন ; তাঁর এক সমর-নায়কের সাহায্যে উৎকলরাজকে রাজ্য ছেড়ে পালাতে এবং প্রাগ্‌জ্যোতিষ-রাজকে বিনাযুদ্ধে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করেন। উত্তর-পশ্চিমে কম্বোজ এবং দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্যন্ত তিনি বিজয়ী যুদ্ধাভিযান চালিয়েছিলেন। প্রতীহাররাজ নাগভটের পৌত্র ভোজদেবের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ হয়েছিল ; ভোজদেব বিজয়ী হতে পারেননি। রাষ্ট্রকূটরাজ অমোঘবর্ষকেও সম্ভবত দেবপাল পরাজিত করেন। দেবপালের সময়েই পাল-সাম্রাজ্য সবচেয়ে বিস্তৃতি লাভ করে। হিমালয়ের সানুদেশ থেকে অন্তত বিন্ধ্য পর্যন্ত এবং উত্তর-পশ্চিমে কম্বোজ থেকে আরম্ভ করে প্রাগ্‌জ্যোতিষ পর্যন্ত তাঁর আধিপত্য স্বীকৃত হত।

দেবপাল

দেবপালের মৃত্যুর পর থেকেই পাল-সাম্রাজ্যে আস্তে আস্তে চিড় ধরতে আরম্ভ করল। দেবপালের পর প্রথম বিগ্রহপাল রাজা হলেন। প্রথম বিগ্রহপাল দেবপালের পুত্র ছিলেন না ; দেবপালের সমরনায়ক বাক্‌পাল বোধহয় তাঁর পিতা। দেবপালের পুত্র থাকা সত্ত্বেও তিনি কেন রাজা হলেন না বলা কঠিন। বিগ্রহপালের অন্য নাম শূরপাল ; তিনি ধর্মনিষ্ঠ রাজা ছিলেন বলে মনে হয়। পুত্র নারায়ণপালকে সিংহাসনে বসিয়ে তিনি বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন।

১ম বিগ্রহপাল

নারায়ণপাল অন্তত ৫৪ বছর রাজত্ব করেছিলেন। এই সময় রাষ্ট্রকূটরাজ অমোঘবর্ষ একবার অঙ্গ-বঙ্গ-মগধে বিজয়ী সমরাভিযান পাঠিয়েছিলেন ; উড়িষ্যার

শুল্কিরাজ মহারাজাধিরাজ রণস্তম্ভও বোধহয় এই সময় রাঢ়ের কিছুটা অংশ জয় করেন। প্রতীহাররাজ ভোজদেব প্রায় মগধ পর্যন্ত সমস্ত পাল সাম্রাজ্য অধিকার করেন। কলচুরীরাজ গুণাম্বোধিদেব এবং গুহিলোট্-রাজ দ্বিতীয় গুহিল এই বিজয়ের অংশীদার হন। এই সময়ই বোধহয় ডাহলরাজ প্রথম কোকল্লদেব বঙ্গরাজভাণ্ডার লুণ্ঠন করেন। ভোজদেবের পুত্র প্রতীহার মহেন্দ্রপাল পুণ্ড্রবর্ধনের পাহাড়পুর পর্যন্ত প্রতীহার সাম্রাজ্য বিস্তার করেন। নারায়ণপাল তাঁর মৃত্যুর আগে বঙ্গ-বিহার আবার দখল করেছিলেন। প্রতীহারদের কতকটা খর্ব করা সম্ভব হলেও রাষ্ট্রকূটরাজ দ্বিতীয় কৃষ্ণের কাছে নারায়ণপালকে বোধহয় কিছুটা আনুগত্য স্বীকার করতে হয়। নারায়ণপালের আমলে রাজা মাধববর্মা শ্রীনিবাসের নেতৃত্বে শৈলোদ্ভব বংশ উড়িষ্যায় এবং রাজা হর্জর ও পুত্র বনমালের নেতৃত্বে কামরূপ প্রবল পরাক্রান্ত হয়ে ওঠে।

নারায়ণপাল

নারায়ণপালের পুত্র রাজ্যপাল এবং পৌত্র গোপালের রাজত্বকালে পাল-সাম্রাজ্য অন্তত মগধ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কিন্তু গোপালের পুত্র দ্বিতীয় বিগ্রহপালের আমলে মগধের অধিকার বোধ হয় পালবংশের হাতছাড়া হয়ে যায়। উত্তর ভারতের চন্দেল্ল এবং কলচুরী রাজবংশ এই সময় প্রবল পরাক্রান্ত হয়ে ওঠে। গৌড়, অঙ্গ এবং রাঢ়দেশকে যুদ্ধে পরাস্ত করেছিলেন চন্দেল্লরাজ যশোবর্মা ও তাঁর পুত্র ধঙ্গ। কলচুরীরাজ প্রথম যুবরাজ দশম শতকের গোড়ায় গৌড়ে যুদ্ধাভিযান পাঠিয়েছিলেন এবং তাঁর পুত্র লক্ষ্মণরাজ বঙ্গালদেশ জয় করেছিলেন। এই সময় বিভিন্ন জনপদ-রাষ্ট্রে পালরাজ্যের বিভক্ত হয়ে পড়ার ঝোঁক দেখা যায়। রাঢ়া অঞ্চলে বঙ্গাল দেশে স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ে ওঠে।

রাজ্যপাল

এই সময় উত্তর ও পূর্ব-বঙ্গে কম্বোজ নামে এক রাজবংশ প্রবল হয়ে ওঠে। দশম শতকে এই বংশের কয়েকজন রাজার খবর পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গের অন্তত কিছু অংশ এবং উত্তরবঙ্গেরও কিছুটা তাঁদের হাতে এসে গিয়েছিল। কম্বোজদের আদিভূমি তিব্বতে না উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে, না পূর্ব-দক্ষিণ ভারতে—এই নিয়ে নানা মত আছে। কম্বোজ রাজাদের রাষ্ট্রকেন্দ্র ছিল প্রিয়ঙ্গুতে।

কম্বোজ বংশ

পূর্ব ও দক্ষিণ-বঙ্গও এই সময় পালবংশের হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল। হরিকেল অঞ্চলে মহারাজাধিরাজ কান্তিদেব নামে এক বৌদ্ধ রাজার খবর

পাওয়া যায়। এঁর রাষ্ট্রকেন্দ্র ছিল বর্ধমানপুরে ; জায়গাটা সম্ভবত শ্রীহট্ট-ত্রিপুরা-চট্টগ্রাম অঞ্চলের কোথাও হবে। ত্রিপুরা অঞ্চলে লহরচন্দ্র নামে এক রাজার খবর পাওয়া যায়। তিনি অন্তত আঠারো বছর রাজত্ব করেছিলেন। এ ছাড়া চন্দ্র রাজবংশের চার জন রাজার খবর পাওয়া যায়। তাঁদের নাম পূর্ণচন্দ্র, পুত্র সুবর্ণচন্দ্র, মহারাজাধিরাজ ত্রৈলোকচন্দ্র, পুত্র মহারাজাধিরাজ শ্রীচন্দ্র। সুবর্ণচন্দ্র থেকে আরম্ভ করে এঁরা সবাই বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা, ঢাকা ও ফরিদপুর অঞ্চল এঁদের রাজ্যভুক্ত ছিল। গোবিন্দচন্দ্র নামে বঙ্গালদেশের একজন রাজা ছিলেন। চন্দ্রবংশীয় রাজাদের কলচুরীরাজ এবং গোবিন্দচন্দ্রকে অন্তত একজন চোলরাজের পরাক্রান্ত বাহিনীর সঙ্গে লড়তে হয়েছিল।

মহীপাল

সমস্ত বাংলাদেশই পালরাষ্ট্রের হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয় বিগ্রহপালের পুত্র মহীপাল উত্তর ও পূর্ব-বঙ্গের হারানো রাজ্য আবার ফিরে দখল করলেন। বিলুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তত খানিকটা পুনরুদ্ধার করে মহীপাল পালবংশের লুপ্ত গৌরব কিছুটা ফিরিয়ে এনেছিলেন। সারনাথে অনেক জীর্ণ বিহার ও মন্দিরের সংস্কার, নতুন বিহার-মন্দিরের প্রতিষ্ঠা, বুদ্ধগয়া বিহারের সংস্কার ইত্যাদির ফলে আন্তর্জাতিক বৌদ্ধজগতেও বাংলাদেশ তার স্থান কিছুটা ফিরে পেয়েছিল। পালবংশের নতুন করে মাথা তোলবার চেষ্টার মধ্যে বাঙালী তার দেশ ও রাষ্ট্রের আত্মগৌরবের প্রতিষ্ঠা দেখতে পেয়েছিল। তাই মহীপালের গান লোকমুখে ছড়িয়ে পড়েছিল। আজও সেই স্মৃতি 'ধান ভান্‌তে মহীপালের গীত' প্রবাদটির মধ্যে বেঁচে আছে। বহু নগর ও দীঘির নামের সঙ্গে মহীপালের নাম জড়িয়ে আছে।

সমসাময়িক হিন্দুশক্তিপুঞ্জ পশ্চিমদিকে সুলতান মামুদের বারংবার আক্রমণে বিব্রত ও বিপর্যস্ত ছিলেন বলেই বোধহয় মহীপালের পক্ষে হারানো সাম্রাজ্যের খানিকটা ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছিল। এই সময় একাধিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে উত্তর ভারতের রাষ্ট্রব্যবস্থা ভেঙে পড়ছিল এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রপুঞ্জ একে একে পশ্চিমাগত মুসলিম অভিযানকারীর হাতে পরাস্ত ও পর্যুদস্ত হচ্ছিল। ভারতের সামগ্রিক রাষ্ট্রীয় ঐক্যের বদলে স্থানীয় প্রাদেশিক মনোভাব ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছিল। অষ্টম শতকের গোড়া থেকেই ভারতের সমৃদ্ধ বৈদেশিক বাণিজ্যে আরব ও পারসিক বণিকেরা মোটা ভাগ বসাতে আরম্ভ করেছিল। ভারতের রাষ্ট্রীয় ও বাণিজ্যিক কেন্দ্র ক্রমশ উত্তর ভারত থেকে দক্ষিণ ভারতে

সরে যাচ্ছিল। ভারতের সামগ্রিক ঐক্যের আদর্শ মহীপালের কাছে বড় হয়ে দেখা দেয়নি। তাই তিনি গজনীর সুলতান মামুদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত হিন্দু শক্তিসঙ্ঘে যোগ দেননি। স্থানীয় আত্মকর্তৃত্বের আদর্শই তাঁর কাছে বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল।

মহীপাল পাল-সাম্রাজ্যের গৌরব খানিকটা ফিরিয়ে আনলেও তা স্থায়ী হল না। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই পালরাজ্য আস্তে আস্তে ভেঙে পড়তে লাগল। এই ভাঙন ঠেকাবার কিছুটা চেষ্টা হলেও তাতে শেষ পর্যন্ত কোন ফল হল না। মহীপালের পুত্র জয়পালের রাজত্বকালে বঙ্গ ও গৌড় কলচুরীরাজ কর্ণ বা লক্ষ্মীকর্ণের হাতে পরাজয়ের অপমান স্বীকার করে। জয়পালের পুত্র তৃতীয় বিগ্রহপালের রাজত্বকালে কর্ণ বোধহয় দ্বিতীয়বার বাংলা আক্রমণ করে অন্তত বীরভূম পর্যন্ত অগ্রসর হন। দ্বিতীয় আক্রমণের পরিণতিই বোধহয় তৃতীয় বিগ্রহপাল ও কর্ণকন্যার বিবাহ।

৩য় বিগ্রহপাল

লক্ষ্মীকর্ণের হাত থেকে উদ্ধার পেলেও পশ্চিমবঙ্গ বোধ হয় আর বেশিদিন পাল-সাম্রাজ্যের অধীন থাকেনি। মহামাণ্ডলিক নামে এক সামন্ত রাজা বর্ধমান অঞ্চলে স্বতন্ত্র স্বাধীন মহারাজাধিরাজ হিসেবে দেখা দেন। পূর্ববঙ্গে ত্রিপুরা অঞ্চলে এই সময় পট্টিকেরা রাজ্য গড়ে ওঠে। পূর্ববঙ্গের অন্যান্য জায়গায় একাদশ শতকের শেষার্ধে এবং দ্বাদশ শতকে চন্দ্রবংশ ও পরে বর্মণ বংশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল। কাজেই পালরাজারা আর পূর্ববঙ্গ পুনরুদ্ধার করতে পারেননি।

তৃতীয় বিগ্রহপালের রাজত্বকালে বাংলাদেশে আরেক নতুন বহিঃশত্রুর আক্রমণ দেখা দিল। বাংলায় কর্ণাটের একাধিক চালুক্যরাজ যুদ্ধাভিযান চালান। এই সূত্রেই কিছু কিছু কর্ণাটী ক্ষত্রিয় সামন্ত-পরিবার ও অন্যান্য কিছু লোক বাংলাদেশে এসেছিলেন এবং অভিযানকারীরা দেশে ফিরে গেলেও এঁরা এদেশেই থেকে গেলেন। বিহার ও বাংলার সেন রাজবংশ ও বঙ্গের বর্মণ রাজবংশ এই সব দক্ষিণী কর্ণাটী পরিবার থেকেই উদ্ভূত। একাদশ শতকের মাঝামাঝি বাংলাদেশে আরেকটি ভিন্‌প্রদেশী আক্রমণের খবর পাওয়া যায়। উড়িষ্যার এক রাজা মহাশিবগুপ্ত যযাতি গৌড়, রাঢ়া ও বঙ্গে বিজয়ী যুদ্ধাভিযান চালিয়েছিলেন এবং আরেক রাজা উদ্যোতকেশরী গৌড়-সৈন্যদের পরাস্ত করেছিলেন। এই সব আক্রমণে পালরাজ্য ভেঙে পড়বার উপক্রম হল। মগধেও পাল-রাজাদের আসন টলে উঠেছিল। বর্মণ রাজবংশ পূর্ব বাংলায়

স্বতন্ত্র ও স্বাধীন রাজ্য গড়ে তুলল ; কামরূপ-রাজ রত্নপাল গৌড়রাজকে অমান্য করে তাঁকে অপমানিত করতে এতটুকু ভয় পেলেন না।

তৃতীয় বিগ্রহপালের তিন পুত্র : দ্বিতীয় মহীপাল, দ্বিতীয় শূরপাল এবং রামপাল। দ্বিতীয় মহীপাল যখন রাজা হলেন, তখন তাঁর নিজের পরিবারেই নানা চক্রান্ত এবং সামন্তদের মধ্যে ব্যাপক বিদ্রোহের মনোভাব। দ্বিতীয় মহীপাল তাঁর এই দুই ভাইকে বন্দী করলেন। বরেন্দ্রীর কৈবর্ত-সামন্তদের দমন করতে গিয়ে তিনি শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে পরাস্ত ও নিহত হলেন। কৈবর্ত-নায়ক দিব্য বরেন্দ্রীর অধিকার লাভ করলেন।

দিব্য

দিব্য পাল-রাজাদের অন্যতম রাষ্ট্র-নায়ক ছিলেন। পাল-রাষ্ট্রের দুর্বলতা ও রাজপরিবারের ভ্রাতৃবিরোধের সুযোগ নিয়ে তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন এবং বরেন্দ্রীর রাজা হয়েছিলেন। তাঁকে যুদ্ধে বর্মণবংশীয় বঙ্গরাজ জাতবর্মার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, কিন্তু তাতে কৈবর্তরাজের কিছু ক্ষতি হয়েছিল বলে মনে হয় না।

রামপাল

দ্বিতীয় শূরপাল বেশিদিন রাজত্ব করতে পারেননি। রামপাল রাজা হয়ে বরেন্দ্রী পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেছিলেন ; তাতে ফল হয়নি। বরং কৈবর্তপক্ষ একাধিকবার রামপালের রাজ্য আক্রমণ করেছিল। দিব্যের পুত্র রুদোকের আমলেও রামপাল কিছু করে উঠতে পারেননি। রুদোকের ভাই ভীম বরেন্দ্রীর রাজা হওয়ার পর কৈবর্তশক্তি প্রবল পরাক্রান্ত হয়ে ওঠে। রামপাল প্রচুর অর্থ ও জমির বদলে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন সামন্তদের কাছ থেকে সামরিক সাহায্য আদায় করে ক্ষৌণী-নায়ক ভীমকে গঙ্গার উত্তর তীরে তুমুল যুদ্ধে পরাস্ত ও বন্দী করেন। রামপালের সৈন্যসামন্তরা ভীমের অগণিত ধনরত্নপূর্ণ রাজকোষ লুণ্ঠন করে। ভীম সপরিবারে রামপালের হাতে নিহত হন।

বরেন্দ্রী উদ্ধারের পর রামপাল হৃত রাজ্যের অন্যান্য অংশ উদ্ধারে মন দিলেন। পূর্ববঙ্গের এক বর্মণ রাজা নিজের স্বার্থে রামপালের বশ্যতা স্বীকার করলেন। রামপালের এক সামন্ত কামরূপ জয় করে রামপালের প্রিয়পাত্র হয়েছিলেন। রাঢ়দেশের সামন্তদের সহায়তায় উড়িষ্যারও অন্তত কিছুটা তাঁর পক্ষে জয় করা সম্ভব হল। এই সময় কর্ণাটের লুব্ধ দৃষ্টি বরেন্দ্রীর ওপর পড়ে। মিথিলা রামপালের হাতছাড়া হয়। কাশী-কান্যকুব্জের পরাক্রান্ত গাহড়বাল রাজাদের সঙ্গেও রামপালকে যুঝতে হয়েছিল।

পালবংশের শেষ পরিণতির কথা বলবার আগে বর্মণ বংশের কথা একটু বলে নেওয়া যাক। যাদববংশীয় এই বর্মণ রাজারা কলিঙ্গ দেশের সিংহপুর থেকে একাদশ শতকে পূর্ববঙ্গে এসে আধিপত্য স্থাপন করে। বজ্রবর্মার পুত্র জাতবর্মা এই বংশের প্রথম রাজা। জাতবর্মা কলচুরীরাজ কর্ণের কন্যা বীরশ্রীকে বিবাহ করেন। দ্বিতীয় মহীপালের মৃত্যুর পর পাল রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। জাতবর্মা তার পুরো সুযোগ নিতে ছাড়েননি। জাতবর্মার পেছনে বোধ হয় কলচুরীরাজ গাঙ্গেয়দেব ও কর্ণের সহায়তা ছিল। জাতবর্মার পর তাঁর পুত্র হরিবর্মা রাজা হন। বিক্রমপুরে তাঁর রাজধানী ছিল; তাঁর সান্ধিবিগ্রহিক মন্ত্রী ছিলেন ভট্ট ভবদেব। হরিবর্মার পর তাঁর ভাই শ্যামলবর্মা বঙ্গের রাজা হন। শ্যামলবর্মার আমলেই বৈদিক ব্রাহ্মণেরা বাংলায় আসেন। তাঁর পুত্র ভোজবর্মা এই বংশের শেষ রাজা। পুণ্ড্রবর্ধনের রাজশাহী-বগুড়া অঞ্চলেও তাঁর আধিপত্য এক সময় বিস্তার লাভ করেছিল। এর পরই পূর্ববঙ্গের বর্মণ রাজ্য সেন-রাজবংশের হাতে চলে যায়।

বর্মণ বংশ

রামপালের চার পুত্র—বিত্তপাল, রাজ্যপাল, কুমারপাল ও মদনপাল। প্রথম দুজন রাজা হতে পারেননি। কুমারপাল ও তাঁর পুত্র তৃতীয় গোপালের রাজত্বের পর রাজা হন রামপালের পুত্র মদনপাল। মদনপালই পালবংশের শেষ রাজা। শেষ তিনজনের রাজত্বকালেই পালরাজ্য সম্পূর্ণভাবে ভেঙে পড়ে।

পালরাজ্যের পতন

কুমারপালের সেনাপতি বৈদ্যদেব কামরূপে এক বিদ্রোহ দমন করে নিজেই এক স্বতন্ত্র স্বাধীন নরপতি হয়ে বসলেন। পূর্ববঙ্গে ভোজবর্মার নেতৃত্বে বর্মণেরা স্বাধীন হল। দক্ষিণ থেকে কলিঙ্গের গঙ্গবংশীয় রাজারা আরম্য (আরামবাগ) দুর্গ জয় করে মেদিনীপুরের ভেতর দিয়ে গঙ্গাতীর পর্যন্ত ঠেলে চলে এলেন। সুযোগ বুঝে দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গে কর্ণাট থেকে আগত সেন রাজবংশ মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। সেন রাজবংশ ইতিমধ্যেই পূর্ববঙ্গে আধিপত্য বিস্তার করেছিল। এইবার তারা খাস গৌড়ের ওপর চড়াও হল। অন্যদিকে গাহড়বাল রাজারাও এই সময় বাংলাদেশে নতুন করে যুদ্ধাভিযান চালান। প্রথমে পাটনা, পরে মুঙ্গের তাদের দখলে চলে গেল। মদনপা-নর রাজত্বের আট বছরের মধ্যে বরেন্দ্রীর কিছুটা অংশে ছাড়া বাংলার আর কোথাও পালরাজ্যের আধিপত্য থাকল না; তবে বিহারে মধ্য ও পূর্বাঞ্চল তখনও পালরাজ্যের মধ্যে ছিল।

মদনপালের মৃত্যুর দশ বছরের মধ্যে সেটুকুও আর বজায় থাকেনি। পালরাজ্য একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

বাঙালী জাতির গোড়াপত্তন

পালরাজত্বের এই চারশো বছর বাঙালীর ইতিহাসে এক স্মরণীয় যুগ। এই যুগেই হয়েছে আজকের বাংলাদেশ ও বাঙালী জাতির গোড়াপত্তন। আর্যপূর্ব ও আর্য সংস্কৃতিকে মিলিয়ে বাঙালীর যে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে, এই যুগেই তার ভিৎ তৈরি হয়ে যায়।

খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক থেকে খৃষ্টোত্তর ষষ্ঠ-সপ্তম শতক পর্যন্ত গোটা দেশে একচ্ছত্র রাজত্ব কায়েম করাই ছিল ভারতের রাষ্ট্রীয় আদর্শ। মৌর্য ও গুপ্ত-রাজবংশের সেই আদর্শই ছিল। সপ্তম শতকেও এই আদর্শ বজায় ছিল; তবে নজরটা তখন খাটো হয়ে এসেছে—সমগ্র ভারতের বদলে গোটা উত্তরাপথে আধিপত্য বিস্তারই তখন রাষ্ট্রীয় আদর্শ। অষ্টম শতকেও এই নিয়ে ছিল প্রতীহার আর পালবংশের লড়াই। অন্যদিকে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর থেকেই স্থানীয় ও প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্বের আদর্শ আস্তে আস্তে মাথা তুলতে থাকে। নবম শতকের গোড়ার দিক থেকেই এই আদর্শ জোরালো হয়ে ওঠে। এই সময় থেকেই ভারতবর্ষের বিভিন্ন দেশখণ্ডের ভাষা ও সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে একেকটি রাষ্ট্র গড়ে ওঠে; এইসব রাষ্ট্র নিজেদের প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্বের প্রতিষ্ঠা ও বিস্তারের জন্যে উঠে পড়ে লাগে। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে দেখা যায়, একেকটি বৃহত্তর জনপদরাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে মূলগত এক অথচ ভিন্ন ভিন্ন বিশিষ্ট লিপি বা অক্ষররীতি, ভাষা ও শিল্পাদর্শ গড়ে উঠেছে। দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে তাদের একেকটি প্রাদেশিক বৈশিষ্ট্য দাঁড়িয়ে গেছে।

বঙ্গ-বিহারে রাষ্ট্রীয় সত্তার সূচনা সপ্তম শতকেই দেখা গিয়েছিল। শশাঙ্ক ছিলেন তার প্রতীক। কিন্তু তার পরের একশো বছরে মাৎস্যন্যায়ের যুগে সে সত্তা প্রায় ধুয়ে মুছে গিয়েছিল। পালরাজারা আবার তা জাগিয়ে তুললেন। বাঙালীর স্বদেশ ও স্বাজাত্যবোধ, বাঙালীর এক-জাতীয়ত্বের ভিত্তি পাল-রাজত্বের এই চারশো বছরের মধ্যেই গড়ে উঠল।

বাংলায় ভৌগোলিক সত্তা এই যুগেই গড়ে উঠেছিল। বাংলা লিপি ও ভাষার গোড়া খুঁজতে গেলেও এই চারশো বছরের মধ্যেই খুঁজতে হবে।

পালবংশকে কেন্দ্র ও আশ্রয় করে বাংলাদেশে প্রথম সামাজিক-সাংস্কৃতিক সমন্বয় সম্ভব হয়েছিল। ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ-বহির্ভূত স্মৃতি ও আচার, আর্য ও

আর্য-বহির্ভূত সংস্কার ও সংস্কৃতি, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য পুরাণ, পূজা, শিক্ষা ও আদর্শ, দেবদেবী সমস্ত পালবংশকে কেন্দ্র ও আশ্রয় করে পরস্পরে মিলে মিশে এক বিরাট সামাজিক সমন্বয় গড়ে তুলেছে।

সমন্বয়

আর্যব্রাহ্মণ্য স্মৃতি ও সংস্কৃতির ছাঁচেই অবশ্য এই সমন্বয় গড়ে উঠেছিল। ভূমিব্যবস্থা উত্তরাধিকার, চাতুর্বর্ণ, সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থা, সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের স্বীকৃতি ও প্রচলনের মধ্যেই সেই আদর্শ সুস্পষ্ট। আর্য, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিকে আশ্রয় করেই ক্রমশ উত্তর-ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির ক্রমবর্ধমান ধারার সঙ্গে বাংলাদেশ যুক্ত হল। গুপ্ত আমলেই এর সূত্রপাত হয়েছিল, পাল আমলে তা পূর্ণতা নিয়ে দেখা দিল। পাল আমলের এই সমন্বিত ও সমীকৃত সংস্কৃতিই হল বাঙালী সংস্কৃতির ভিত্তি।

স্থানীয় আত্মকর্তৃত্বের রাষ্ট্রীয় আদর্শ শুধু বৃহত্তর ক্ষেত্রেই নয়, নিচের দিকেও দেখা গেল। এ থেকেই সামন্ততন্ত্রের সূত্রপাত। মোটামুটি ষষ্ঠ শতক থেকে বাংলা দেশে মহারাজাধিরাজের বৃহত্তর রাজ্যের মধ্যে অনেক ছোটখাটো সামন্ত নায়ক ও সামন্ত রাজার রাজ্য ও রাষ্ট্রের বিস্তার হয়েছে। নিজেদের ছোটখাটো রাজ্যে আসলে এরা একেকজন স্বাধীন রাজার মতই চলত ফিরত। মুখে শুধু মহারাজাধিরাজকে মেনে চলত। পাল আমলে এই সামন্তপ্রথা ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মত বাংলাদেশেও পূর্ণ পরিণতি লাভ করেছিল। মৌর্য বা গুপ্ত আমলের মত পাল আমলে বিজিত রাষ্ট্রগুলিকে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের মধ্যে টেনে আনা হত না। তারা স্বাধীন স্বতন্ত্র রাষ্ট্রই থাকত। পাল-রাষ্ট্রের সর্বাধিপত্য স্বীকার করত মাত্র। কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের সঙ্গেও অনেক সামন্ত রাজা ও নায়ক যুক্ত থাকতেন। কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র ও রাজবংশ দুর্বল হলে ভেতর ও বাইরের এই অনন্ত সামন্তচক্র মাথা চাড়া দিয়ে উঠত; পাল আমলে একাধিকবার এরকম ঘটনা ঘটতে দেখা গেছে।

সামন্ততন্ত্র

সামন্ততান্ত্রিক বীরত্বধর্ম ও বীরত্বগাথা এই যুগে প্রচলিত ছিল। তাছাড়া সামন্ততান্ত্রিক যুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য সতীদাহ প্রথাও পাল আমলের শেষ দিকে এবং সেন আমলে প্রসার লাভ করেছিল বলে মনে হয়। একাদশ-দ্বাদশ শতকেই বাংলাদেশে সামন্ততন্ত্রের সব কয়েকটি লক্ষণই ফুটে উঠেছিল।

সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়ে উঠেছিল কর্মচারী বা আমলার দল। পাল আমলে রাষ্ট্রের প্রধান কেন্দ্র থেকে শুরু করে গ্রামের হাট-খেয়াঘাট পর্যন্ত সমাজের সর্বাঙ্গ জুড়ে আমলাতন্ত্রের ডালপালা ছড়িয়ে

পড়েছিল। সমস্ত লৌকিক ব্যাপারেই রাষ্ট্রের হাত ছিল, এমন কি পারলৌকিক ধর্মাচরণে পর্যন্ত। বিভিন্ন বিচিত্র রাষ্ট্রীয় বিভাগের কর্মচারীদের যে সব লম্বা ফিরিস্তি পাওয়া যায়, তাতে বলা আছে যে, এ ছাড়াও আরও বিস্তর কর্মচারী আছে যাদের উল্লেখ করা হল না। প্রধান প্রধান কর্মচারী, মন্ত্রী, সেনাপতিদের প্রচুর ক্ষমতা ছিল। কখনও কখনও সুযোগ পেলে তারা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যে বেঁকে বসত, পাল-রাজত্বেই তার প্রমাণ আছে।

আমলাতন্ত্র

শিল্পী-বণিক-ব্যবসায়ী সমাজের প্রভাব-প্রতিপত্তি এই যুগের রাষ্ট্রে ও সমাজে তেমন ছিল না। কর্মচারীদের তালিকায় দেখা যায় ভূমি ও কৃষি-সংক্রান্ত রাজপদই বেশি। বর্ণ-ব্রাহ্মণ্য সমাজে বণিক-ব্যবসায়ী শিল্পীদের স্থান তেমন উঁচুতে ছিল না। এই যুগে যেটুকু বা রুপোর মুদ্রা পাওয়া যায়, সুবর্ণমুদ্রার প্রচলন তো একেবারেই নেই। সমাজে এই যুগে ভূমি ও কৃষিনির্ভরতা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে দেখা যায়। ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায়, রাজপাদোপজীবী, মহত্তর, কুটুম্বের দল—সবাই ভূমিনির্ভর। যে সমাজে জমিই জীবিকার প্রধান উপায় এবং জমির ওপর যেখানে ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকৃত, সেখানে সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা গড়ে ওঠাই স্বাভাবিক।

কৃষি-নির্ভরতা

সেন পর্ব

সেনবংশের পূর্বপুরুষেরা এসেছিলেন কর্ণাট দেশ থেকে। চন্দ্রবংশীয় কোন সেন পরিবার কর্ণাট থেকে রাঢ়াভূমিতে এসে বসবাস করতে আরম্ভ করেন। সেই পরিবারে সামন্তসেনের জন্ম। সামন্তসেনের বাল্য এবং যৌবন কেটেছিল কর্ণাটে; দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধবিগ্রহে তাঁর কিছুটা নামডাকও হয়েছিল। পরে বৃদ্ধ বয়সে রাঢ়দেশে এসে বানপ্রস্থ নিয়ে গঙ্গাতীরে আশ্রমবাসে দিন কাটিয়েছিলেন। সেন-পরিবারের পূর্বপুরুষেরা আগে ব্রাহ্মণ ছিলেন; পরে ব্রাহ্মণদের আচার-সংস্কার ও জীবিকা ছেড়ে দিয়ে তাঁরা ক্ষত্রিয়বৃত্তি গ্রহণ করেন। তাঁরা ঠিক কবে কেমন করে বাংলাদেশে এসেছিলেন, বলা মুস্কিল। পালরাজাদের সৈন্যদলে অনেক ভিন্‌-প্রদেশী লোক

সামন্তসেন

নিযুক্ত হত। পাল আমলের কোন সেন-বংশীয় রাজকর্মচারী হয়ত ক্রমে ক্ষমতাশালী হয়ে উঠে নিজেকে সামন্ত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং পরে পালবংশের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে নিজের আধিপত্য বিস্তার করেন। কিংবা কর্ণাট থেকে বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশে যেসব সমরাভিযান চলেছিল, সেই সূত্রে এই কর্ণাটী সেন-পরিবারের এদেশে আসা অসম্ভব নয়।

সামন্তসেনের পুত্র হেমন্তসেন। দ্বিতীয় মহীপালের রাজত্বকালে সামন্ত-চক্রের বিদ্রোহ ও ভ্রাতৃবিরোধের সুযোগে রাঢ়দেশ অঞ্চলে স্থানীয় সামন্ত হিসেবে তিনি কিছুটা জাঁকিয়ে বসেন।

রামপালের মৃত্যুর পর বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ভগ্নদশার সুযোগে হেমন্তসেনের পুত্র মহারাজাধিরাজ বিজয়সেনই বাংলায় সেনবংশের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। শূর পরিবারের কন্যা বিলাসদেবীকে বিজয়সেন বিবাহ করেছিলেন। শূর বংশে বিবাহের ফলে রাঢ়দেশে বিজয়সেনের প্রভাববিস্তারে সাহায্য হয়েছিল। তিনি রাঢ়দেশের অন্যান্য সামন্তদের জয় করেছিলেন। বর্মণদের যুদ্ধে হারিয়ে পূর্ববঙ্গে আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন এবং পাল-বংশের হাত থেকে উত্তর-বঙ্গ কেড়ে নিয়েছিলেন। এই সমস্ত ঘটনার বিস্তারিত খবর কিছু জানা যায় না। বিজয়সেন প্রদ্যুম্নেশ্বরের একটি মন্দির তৈরি করেছিলেন ; রাজশাহী শহরের সাত-আট মাইল পশ্চিমে পদ্মশহর দীঘির পাড়ে এই মন্দিরের বিস্তৃত ধ্বংসাবশেষ এখনও ছড়িয়ে আছে দেখতে পাওয়া যায়।

বিজয়সেন

বিজয়সেনের পুত্র বল্লালসেন একবার সম্ভবত গোবিন্দপালের আমলে গৌড় আক্রমণ করেছিলেন। তাঁর সময়ে বঙ্গ, রাঢ়, বরেন্দ্রী, বাগড়ী (সুন্দরবন-মেদিনীপুর অঞ্চল), এবং মিথিলা সেনরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বল্লাল কর্ণাট-চালুক্যরাজ দ্বিতীয় জগদেকমল্লের কন্যা রামদেবীকে বিবাহ করেছিলেন। বল্লালসেন তাঁর অদ্ভুতসাগর-গ্রন্থ লিখে শেষ করবার আগেই সপত্নীক গঙ্গা-যমুনাসঙ্গমে নিরঞ্জরপুরে চলে যান। রাজ্যভার ও গ্রন্থ শেষ করবার ভার তিনি তাঁর পুত্র লক্ষ্মণসেনকে দিয়ে গেলেন।

বল্লালসেন

প্রায় ষাট বৎসর বয়সে লক্ষ্মণসেন সিংহাসনে বসেন। তাঁর রাজত্বকালে গৌড়-কলিঙ্গ-কামরূপ সেন-রাজ্যভুক্ত হয়। তাছাড়া তিনি পুরী, বারাণসী ও প্রয়াগে বিজয়স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। লক্ষ্মণসেন গাহড়বালদের

পরাস্ত করে মগধ অধিকার করেন এবং প্রয়াগ পর্যন্ত যুদ্ধাভিযান চালান। এর ফলে গাহড়বাল রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়েছিল ; ফলে তাদের পক্ষে মুসলমান অভিযানের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়নি।

লক্ষ্মণসেন

লক্ষ্মণসেন যে-রাজ্য ও রাষ্ট্র গড়ে তুলেছিলেন, সেই রাজ্য ও রাষ্ট্র ভেতর থেকে ক্রমেই দুর্বল ও ক্ষীণ হতে আরম্ভ করল। স্থানীয় আত্মকর্তৃত্বের যে ব্যাধি পালরাজ্যের কাল হয়ে দেখা দিয়েছিল, সেনরাজ্যের ক্ষেত্রেও তাই ঘটল। এই ব্যাধিরই একটি রাষ্ট্রীয় রূপ সামন্ততন্ত্র। দ্বাদশ শতকের শেষাশেষি সুন্দরবন অঞ্চলে এক মহামাণ্ডলিকের পুত্র ডোম্মনপাল প্রধান হয়ে উঠে স্বাধীন রাজ্যখণ্ড প্রতিষ্ঠা করলেন। এই সময়ে কিংবা এর ঠিক পরেই ত্রিপুরা অঞ্চলে পট্টিকেরায় রণবঙ্কমল্ল হরিকালদেব নামে এক রাজা স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করেন। বর্তমান কুমিল্লা শহরের পাঁচ মাইল পশ্চিমে ময়নামতী পাহাড় অঞ্চলেই বোধহয় তার রাজধানী ছিল।

স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা

মেঘনার পূর্বতীরে আরেকটি স্বাধীন স্বতন্ত্র রাজবংশও এই সময় গড়ে উঠল। এই বংশের নাম দেববংশ। পুরুষোত্তমদেবের পুত্র মধুমথন বা মধুসূদনদেব দ্বাদশ শতকের শেষে কিংবা ত্রয়োদশ শতকের গোড়ায় প্রথম স্বতন্ত্র রাজা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর পুত্র বাসুদেব ; বাসুদেবের পুত্র দামোদরদেবই এই বংশের পরাক্রান্ত রাজা। তিনি ত্রিপুরা-নোয়াখালি-চট্টগ্রামে নিজের আধিপত্য বিস্তার করেন। পরে এই বংশের আরেক রাজা দশরথদেব তাঁর রাজ্য আরও বাড়িয়েছিলেন ; বিক্রমপুরে রাষ্ট্রকেন্দ্র গড়ে ঢাকা অঞ্চলও তিনি নিজের রাজ্যভুক্ত করেছিলেন।

মুঙ্গের অঞ্চলে এক গুপ্তবংশ ছিল সেনবংশের মহামাণ্ডলিক সামন্ত। এই বংশের রাজা কৃষ্ণগুপ্ত ও তাঁর পুত্র সংগ্রামগুপ্ত লক্ষণসেনের রাজত্বকালেই স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করেছিলেন।

রাষ্ট্রের ভেতরে যখন এই ভাঙন চলেছে, সেই সময় পশ্চিম থেকে মুসলিম রাজশক্তি আস্তে আস্তে পূর্বদিকে তার লুব্ধ থাবা বাড়িয়েছে। কুতব্-উদ্দীন তখন দিল্লীর মসনদে। উত্তর ভারতের হিন্দুরাষ্ট্র-শক্তি তখন একে একে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ছে ; রাষ্ট্রীয় শান্তি-শৃঙ্খলার বালাই নেই। এই অবস্থার সুযোগে ভাগ্যান্বেষীদের মত তুর্কজাতীয় যুদ্ধব্যবসায়ী মুহম্মদ বখ্‌ৎ-ইয়ার খিলজী বিহারে ও বাংলায়

বখ্‌ৎ-ইয়ারের বঙ্গ-বিহার জয়

কপাল ফেরাতে আসেন। তিনি বিহার, গৌড় ও বরেন্দ্রী জয় করেছিলেন। এর পঞ্চাশ বছর পর বিভিন্ন লোকের মুখ থেকে কাহিনী শুনে দিল্লীর ভূতপূর্ব প্রধান কাজী মৌলানা মিনহাজ্-উদ্দীন এই বঙ্গ ও বিহার জয়ের যে বিবরণ রেখে গেছেন, তার সবটাই ঐতিহাসিক সত্য না হলেও তার ভেতর দিয়ে সে-সময়কার সামাজিক চেহারা পরিষ্কার ফুটে ওঠে।

বর্তমান চুনারের কাছে ভুইলি গ্রামে ছিল বখ্‌ৎ-ইয়ারের জায়গীরের সদর ঘাঁটি। গাহড়বাল সামন্তরাজদের হারিয়ে বখ্‌ৎ-ইয়ার সেই সব জায়গাই লুটপাট ও দখল করতে শুরু করে দেন, যেখানে হিন্দুরাজশক্তির মোটেই দাপট নেই। বছর দুই এইভাবে চলার পর বখ্‌ৎ-ইয়ার হঠাৎ বিহার দুর্গ আক্রমণ ও অধিকার করে বসলেন। সেখানকার বাসিন্দাদের সবাইকে খুন করে তিনি প্রচুর ধনরত্ন লুট করলেন এবং প্রচুর বই-পুঁথি পুড়িয়ে দিলেন। এই দুর্গনগরই বিখ্যাত ওদণ্ডপুর বৌদ্ধ-বিহার। যাঁরা খুন হলেন তাঁরা সবাই মুণ্ডিতশির বৌদ্ধ-ভিক্ষু। এই বিহার থেকেই বর্তমান বিহার জনপদের নাম হয়েছে। এক বছর পর ১২০০ খৃষ্টাব্দে বখ্‌ৎ-ইয়ার আবার বিহার আক্রমণ করলেন ও নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হলেন।

বিহার জয়ের পরের বছরই বখ্‌ৎ-ইয়ার একদল সৈন্য নিয়ে বিহার-সরিফ থেকে গয়া ও ঝাড়খণ্ড জনপদের ভেতর দিয়ে নদীয়ার দিকে অগ্রসর হলেন। নবদ্বীপের রাজপ্রাসাদে বখ্‌ৎ-ইয়ার অতর্কিতে ঢুকে পড়ায় উপায়ান্তর না দেখে লক্ষ্মণসেন পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে গেলেন। লক্ষ্মণসেনের রাজপ্রাসাদ ও নগর অধিকারের পর বখ্‌ৎ-ইয়ার কয়েকদিন ধরে নদীয়া বিধ্বস্ত করে গৌড়-লক্ষ্মণাবতীতে গিয়ে নিজের শাসনকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করেন। এর কয়েক বছর পর তিব্বত জয় করতে গিয়ে হেরে নাস্তানাবুদ হয়ে মাঝপথ থেকেই তাঁকে ফিরে আসতে হয়েছিল।

বখ্‌ৎ-ইয়ার যে একেবারে বিনা বাধায় বিহার ও বাংলাদেশ জয় করেছিলেন, তার কয়েকটি কারণ ছিল। প্রথমত, ইসলামধর্মী আরব, তুর্কী, খিল্‌জী প্রভৃতি বিদেশী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে উত্তর ভারতের হিন্দুরাজশক্তির প্রতিরোধ ভেঙে পড়ায় দুর্ধর্ষ মুসলমান অভিযাত্রীদের ঠেকিয়ে রাখার মত মনোবল বা শক্তি সেন-রাষ্ট্রযন্ত্রের ছিল না। বিহারকে ধনেপ্রাণে ধ্বংস হতে দেখে আতঙ্কগ্রস্ত দেশের লোক দলে দলে পূর্ববঙ্গে, কামরূপে পালিয়ে গিয়েছিল, এমন কি নবদ্বীপও জনশূন্য হয়ে পড়েছিল।

প্রতিরোধের অভাব

দ্বিতীয়ত, পরাজয়ের মনোভাব রাষ্ট্রকে যে পেয়ে বসেছিল, অদৃষ্টের ওপর নির্ভরতার ভেতর দিয়ে তার পরিচয় পাওয়া যায়। রাজা, মন্ত্রী, ব্রাহ্মণ, সেনাপতি, বণিক, রাজপুরুষ সবাই জ্যোতিষশাস্ত্রে পরম বিশ্বাসী হয়ে পড়েছিলেন। তৃতীয়ত, লক্ষ্মণসেন বিহারে, বাংলার পথে ও নবদ্বীপে শত্রুকে যতটুকু বাধা দিয়েছিলেন, তা মোটেই কার্যকরী হয়নি। যেখানে জনসাধারণ আতঙ্কগ্রস্ত ও পলায়মান, যেখানে উপদেষ্টা ও মন্ত্রিমণ্ডলী পরাজয়ের মনোভাবে আচ্ছন্ন, জ্যোতিষ যেখানে রাষ্ট্রবুদ্ধির নিয়ামক—সেখানে সৈন্যদলের ও জনসাধারণের প্রতিরোধ দুর্বল হতে বাধ্য। সেইজন্যেই কোন প্রতিরোধই শেষ পর্যন্ত টেঁকেনি।

সেন-বংশের অবসান

নবদ্বীপ থেকে পালিয়ে লক্ষ্মণসেন পূর্ববঙ্গে চলে গিয়েছিলেন এবং সেখানে অল্প কিছুকাল রাজত্ব করবার পর তাঁর মৃত্যু হয়। গৌড় ও বরেন্দ্রীর মুসলমান সুলতান ও সেনানায়কেরা কেউ কেউ হয়ত পূর্ব ও দক্ষিণ-বঙ্গের সেনরাজ্যের বাকি অংশও দখল করতে চেয়েছিলেন, প্রায় একশো বছর ধরে তাঁদের সে চেষ্টা সফল হয়নি। লক্ষ্মণসেন ও তাঁর পুত্র বিশ্বরূপসেন ও কেশবসেনের সঙ্গে তাঁদের যে ক'বার সংঘর্ষ হয়েছিল, তাতে সেনরাজারাই জয়ী হয়েছিলেন। নবদ্বীপ ও লক্ষ্মণাবতী হারিয়ে পূর্ব ও দক্ষিণ-বঙ্গে কোণঠাসা হয়েও সেনরাজাদের বড় বড় উপাধির বহর একটুও কমেনি। বিশ্বরূপ ও কেশবের পরেও বিভিন্ন গ্রন্থে আরও কয়েকজন সেনরাজার নাম পাওয়া যায়। তার পেছনে ঐতিহাসিক সত্য কতটুকু বলা মুস্কিল।

পূর্ববঙ্গেও সেনরাষ্ট্র ক্রমশ ভেতর থেকে দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ১২২১ খৃষ্টাব্দের আগেই কোন সময়ে পট্টিকেরা (ত্রিপুরা জেলা) রাজ্যে রণবঙ্কমল্ল হরিকালদেব স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করেন। লক্ষ্মণসেনের জীবদ্দশাতেই ত্রিপুরা-নোয়াখালি-চট্টগ্রামে এক দেববংশ মাথা তুলেছিল। ত্রয়োদশ শতকের শেষ পর্যন্ত পূর্ব ও দক্ষিণ-বঙ্গ মুসলমান আধিপত্যের হাত থেকে কোন রকমে নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেছিল। কিন্তু ত্রয়োদশ শতকের পর বাংলাদেশের কোথাও আর কোন স্বতন্ত্র স্বাধীন হিন্দু নরপতির নাম শোনা যায় না।

সেন আমলে নতুন কোন রাষ্ট্রীয় আদর্শ গড়ে ওঠেনি। স্থানীয় স্বাতন্ত্র্য ও আত্মকর্তৃত্বের মনোভাব সমানতালে চলেছে। বৈদেশিক মুসলমান শক্তি এদেশে কায়েম হওয়া সত্ত্বেও সামগ্রিক ভারতীয় ঐক্যবোধ ও বৃহত্তর রাষ্ট্রীয়

ধ্যান-ধারণা

সন্ধ্যে হলে আজও আমরা তুলসীতলায় পিদিম জ্বালি, মারী-মড়কে মা শীতলার পুজো দিই, পালেপার্বণে উৎসবের আঙিনায় আম্রপল্লবের চিত্রবিচিত্র ঘট সাজাই, মা-ঠাকুরমার কাছে মাথা পেতে ধানদুর্বোর আশীর্বাদ নিই। প্রাচীন বাংলার আদিবাসী মানুষের ভয়ভাবনা, বিস্ময় আর বিশ্বাসের অনেক কিছুই আজও আমরা মনের মধ্যে পুষে রেখেছি। আমাদের অনেক ধ্যান-ধারণায়, অনেক অভ্যাসে আজও জড়িয়ে আছে প্রাচীন বাঙালীর সংস্কার-আচ্ছন্ন মন। বাঙালীর ধর্মকর্মের গোড়াকার ইতিহাস হল জনপদবদ্ধ প্রাচীন বাংলার আদিবাসীদের পুজোআর্চা, ভয়ভক্তি, বিশ্বাস, সংস্কারেরই ইতিহাস।

ধর্মকর্মে জড়ানো মানুষের মন খুবই জটিল। কাজেই বাংলার আদিবাসী মানুষের মনের সেই ছবি স্পষ্ট করে ফুটিয়ে তোলা খুবই শক্ত। তার ওপর একেক বর্ণ, একেক শ্রেণী, একেক কোম, একেক জনপদে ভয়ভক্তি পুজোআর্চার একেক রকম রূপ। গোটা সমাজে দেশ জুড়ে একই সময়ে কখনও তার চেহারা এক নয়। আবার এইসব বিশ্বাস বা সংস্কার শুধুমাত্র একটি কোম বা একটি শ্রেণীর গণ্ডিতে বাঁধা থাকে না। কখনও মিলন কখনও বিরোধের ভেতর দিয়ে যখন তারা পরস্পর কাছাকাছি হয়, তখন একে অন্যের ওপর কমবেশি ছাপ ফেলে। একের ধ্যানধারণা আর অভ্যাস কখনও অবিকলভাবে কখনও বা তাতে রং লাগিয়ে অপরে গ্রহণ করে। এই দেওয়া-নেওয়ার কাজটা চলে লোকচক্ষুর অন্তরালে। বহুকাল পরে একদিন তার দানাবাঁধা রূপ লোকের চোখে ধরা পড়ে।

অবিরাম এই দেওয়া-নেওয়ার ফলেই গড়ে উঠেছে আজকের হিন্দুর ধর্মকর্ম-সাধনা। অরণ্যচারী হিংস্র উলঙ্গ অর্ধমানবের কোম থেকে শুরু ক'রে কত কোম, কত শ্রেণী, কত স্তর, কত দেশখণ্ডের মানুষের ধর্মকর্ম-সাধনা যে চলমান আর্যব্রাহ্মণ্য স্রোতে কোথাও ক্ষীণ কোথাও বেগবান ধারা মিশিয়েছে

তার ইয়ত্তা নেই। মোটামুটি খৃষ্টীয় পঞ্চম-ষষ্ঠ-সপ্তম শতকে আর্যধর্মের প্রবাহ জোরালো হবার সময় থেকেই আর্য-অনার্যের এই সমন্বয় চলেছে।

আর্যব্রাহ্মণ্য বা বৌদ্ধ, জৈন সম্প্রদায়ের ধর্মকর্ম, শ্রাদ্ধ, বিবাহ, জন্ম, মৃত্যু-সংক্রান্ত বিশ্বাস, সংস্কার আর আচার-অনুষ্ঠান, নানা দেবদেবীর রূপ আর কল্পনা, খাওয়া-দাওয়ার বাছবিচার ছোঁয়াছুঁয়ি—বিশেষত হিন্দুর জন্মান্তরবাদ, পরলোকে বিশ্বাস, প্রেততত্ত্ব, পিতৃতর্পণ, পিণ্ডদান, শ্রাদ্ধ-সংক্রান্ত অনেক কিছুরই মূলে আছে আদিবাসীদের ধ্যানধারণা।

গ্রামীণ কৃষিজীবী সমাজের প্রধানতম ও আদিমতম ভয়, বিস্ময়, বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত আদিবাসী বাঙালীর আচার-অনুষ্ঠানের পুরো ছবি ফুটিয়ে তোলা সম্ভব নয়; তবু টুকরো টুকরো কয়েকটি রেখা থেকে তার খানিকটা আভাস দেওয়া যেতে পারে।

আর্যপূর্ব

বাংলার গাঁয়ে গাঁয়ে লোকালয়ের বাইরে খোলা জায়গায় কিংবা গাছের ছায়ায় একটা ক'রে স্থান বা 'থান' থাকে—সেখানে থাকেন গ্রাম-দেবতা। কোথাও কোথাও গ্রাম-দেবতার বিগ্রহ থাকে, কোথাও থাকে না। এইসব জায়গায় পশুপাখি বলি দেওয়া হয়। লোকে গ্রাম-দেবতার নামে মানত করে, তাঁকে খুশি রাখার চেষ্টা করে।

গ্রামদেবতা

এই গ্রাম-দেবতা কোথাও কালী, কোথাও ভৈরব বা ভৈরবী, কোথাও বনদুর্গা বা চণ্ডী, কোথাও আবার তাঁর স্থানীয় কোন নাম। গ্রাম-দেবতা হলেন আর্য-পূর্ব আদিম গ্রামগোষ্ঠীর ভয়ভক্তির দেবতা, তাই তাঁর স্থান গ্রামে নয়, গ্রামের বাইরে। ব্রাহ্মণ্য বিধানে গ্রাম-দেবতার পূজো বারণ; যাঁরা এই দেবতার পূজারী, মনুর বিধানে তাঁরা পতিত হিসেবে গণ্য। তবু কোন বিধিনিষেধই এইসব গ্রাম-দেবতার পুজো কোনদিন বন্ধ করতে পারেনি; বরং এঁদের কেউ কেউ ক্রমশ ব্রাহ্মণ্য সমাজে স্বীকৃত হয়ে ব্রাহ্মণ্য ধর্মকর্মে ঢুকে পড়েছেন। যেমন শীতলা, মনসা, বনদুর্গা, ষষ্ঠী, নানান রকম চণ্ডী, নরমুণ্ডমালিনী, শ্মশানচারী কালী, শ্মশানচারী শিব, পর্ণশবরী, জাঙ্গুলী।

প্রাচীন ভারতে যেমন গরুড়ধ্বজ, মীনধ্বজ, ইন্দ্রধ্বজ, ময়ূরধ্বজ, কপিধ্বজ

আদর্শ দেখা দিল না। সমাজ ক্রমশ ভূমিনির্ভর ও কৃষিনির্ভর হয়ে পড়েছে। রাষ্ট্রের সামাজিক দৃষ্টি যত সংকীর্ণ হয়েছে, আমলাতন্ত্রের তত বিস্তার হয়েছে। রাজার সর্বময় কর্তৃত্ব বেড়েছে। রাষ্ট্রযন্ত্রে ব্রাহ্মণ-পুরোহিতেরা আসর জাঁকিয়ে বসেছে; শিল্পী, বণিক, ব্যবসায়ীরা সেন-আমলে সমাজের নিচের স্তরে নেমে গেছে।

সেন-আমলে রাষ্ট্র ও সমাজ

এই যুগের প্রধান চেষ্টাই হল পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য স্মৃতি-সংস্কৃতির আদর্শ অনুযায়ী বাংলার সমাজকে একেবারে নতুনভাবে ঢেলে সাজা। সেই চেষ্টার পেছনে ছিল রাষ্ট্র ও রাজবংশের পরিপূর্ণ সক্রিয় সমর্থন। উচ্চতর বর্ণ ও শ্রেণীর লোকেরাও ছিল তার পোষক ও সমর্থক। এই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল বরেন্দ্রী ও রাঢ়দেশ এবং পরে বিক্রমপুর অঞ্চল। বিক্রমপুরে বৌদ্ধ সাধনা ও সংস্কৃতির একটি বড় ঘাঁটি থাকায়, সেখানে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতি রাঢ়-বরেন্দ্রীর মত তেমন প্রবলপ্রতাপ হয়ে উঠতে পারেনি। আর ত্রিপুরা-চট্টগ্রাম অঞ্চলে বৌদ্ধ সাধনার প্রভাব বহুদিন পর্যন্ত প্রবল ছিল। এইজন্যেই বোধ হয় মৈমনসিং-ত্রিপুরা-চট্টগ্রাম-শ্রীহট্ট অঞ্চলে ব্রাহ্মণ্য স্মৃতির শাসন আজও কিছুটা দুর্বল। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, সংস্কার ও সংস্কৃতির দিক থেকে উত্তর-ভারতের চেয়ে দক্ষিণ-ভারত বরাবরই একটু বেশিরকমের গোঁড়া। কলিঙ্গ-কর্ণাট থেকে সেন ও বর্মণেরা সেই আদর্শ নিয়েই বাংলাদেশে এসেছিলেন। এই যুগে বাংলার সমাজ ও বাঙালী জাতিকে বর্ণ ও শ্রেণীর দিক থেকে খণ্ড খণ্ড করে ভেঙে নতুন করে গড়া হয়েছিল; এই গড়ার পেছনে মিলিয়ে মিশিয়ে দেবার কিংবা নিজের করে নেবার কোন আদর্শ সক্রিয় ছিল না। বাংলার রাষ্ট্র ও সমাজ এই যুগে ভেদবুদ্ধিতে আচ্ছন্ন, স্তরে উপস্তরে দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীরে বিভক্ত। রাজসভার চরিত্রবল ও আত্মশক্তির অভাব। ধর্ম ও সমাজ বিলাসব্যসনে মশগুল। শিল্প ও সাহিত্য বাস্তবতা হারিয়ে ফাঁকা উচ্ছ্বাস, অত্যুক্তি ও দেহসর্বস্বতায় ভরে উঠেছে। জনসাধারণের দেহমন বৌদ্ধ বজ্রযান-সহজযান প্রভৃতির এবং তান্ত্রিক সিদ্ধাচার্য-ডাকিনী-যোগিনীদের অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ড ও তুক্-তাকে পঙ্গু। উচ্চতর বর্ণসমাজ ব্রাহ্মণ্য পুরোহিততন্ত্র ও ব্রাহ্মণ্য রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্বে আড়ষ্ট।

এরপর বখ্‌ৎ-ইয়ারের নবদ্বীপ-জয় এবং একশো বছরের মধ্যে সারা বাংলা-দেশ জুড়ে মুসলমান রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা মোটেই আকস্মিক ঘটনা নয়—সেন আমলে রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধোগতিরই অনিবার্য পরিণাম।

রাজবংশের আনুমানিক কালসূচী

খৃষ্টোত্তর তৃতীয় শতকের শেষ বা চতুর্থ শতকের গোড়ায়
বাংলায় রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা।

৩০০—৫৫০ খৃঃ … বাংলায় গুপ্তাধিপত্য
৫০০—৬৫০ খৃঃ … বঙ্গ-গৌড়ের স্বাতন্ত্র্য

৬ষ্ঠ শতকের ২য় পাদ
থেকে ৩য় পাদ পর্যন্ত …গোপচন্দ্র
ধর্মাদিত্য
সমাচারদেব

৬০৬-৭ খৃষ্টাব্দের আগে থেকে
৬৩৭-৩৮ খৃঃ পর্যন্ত … শশাঙ্ক

৭ম শতক … খড়্গবংশ
লোকনাথের বংশ
রাত বংশ

৬৫০—৭৫০ … মাৎস্যন্যায়ের শতবর্ষ
৭৫০—১১৬০ … পাল বংশ
১০৭৫ … দিব্য
১০৫০—১২শ শতকের প্রথমার্ধ … বর্মণ বংশ

১০৯৫ থেকে ১৩শ
শতকের শেষার্ধ পর্যন্ত … সেন বংশ
১২০৪—১২২০ … রণবঙ্কমল্ল হরিকালদেব
১২শ শতকের শেষ বা ১৩শ শতকের
গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত… দেব বংশ

জীবন চিত্র

রোগা লিক্‌লিকে চেহারা, হাড় ক'খানা গোনা যায়। তিরিক্ষে মেজাজ, চোয়াড়ে স্বভাব। একটু ধাক্কা লাগলে পাছে মট্ করে ভেঙে যায়, সেই ভয়ে সবাই দূরে দূরে থাকে। প্রবাসে এসে কাশ্মীরের জলহাওয়ায় কিছুদিনের মধ্যেই তাদের চেহারা ফিরে যায়; হাড়ে মাংস লাগে, গায়ে জোর বাড়ে। 'ওঙ্কার' আর 'স্বস্তি' উচ্চারণ করতে যদিও তাদের দাঁত ভেঙে যায়, তবু তাদের পাতঞ্জলভাষ্য, তর্ক, মীমাংসা সবই পড়া চাই। গজেন্দ্র-গমনে তারা রাস্তায় হাঁটে; থেকে থেকে তাদের দর্পিত মাথাটা একবার এদিকে একবার ওদিকে হেল্‌তে দুল্‌তে থাকে। যখন তারা রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলে, তাদের ময়ূরপঙ্খী জুতোয় মচ্ মচ্ আওয়াজ ওঠে। মাঝে মাঝে তারা চলতে চলতে নিজেদের সাজপোষাকের বাহারটা পরখ করে নেয়। তাদের সরু কোমরে ঝোলে লাল কটিবন্ধ। তাদের কাছ থেকে পয়সা বাগাবার জন্যে ভিক্ষুক আর অন্যান্য পরাশ্রয়ী লোকেরা নানাভাবে তাদের খোশামোদ করে আর ছড়া বাঁধে। কালো রং আর শাদা দাঁতের পাটিতে তাদের দেখায় যেন বানরটি। তাদের দু' কানে তিন তিনটে করে সোনার মাকড়ি, হাতে ছড়ি—দেখে মনে হয় যেন সাক্ষাৎ কুবের। সামান্যমাত্র অজুহাতেই তারা রেগে আগুন হয়; মামুলি ঝগড়াঝাঁটিতে ক্ষেপে গিয়ে ছুরি দিয়ে সহ-আবাসিকের পেট চিরে দিতেও তাদের বাধে না। গর্ব করে তারা নিজেদের ঠক্কুর বা ঠাকুর বলে পরিচয় দেয় এবং কম দাম দিয়ে বেশি জিনিস দাবি করে দোকানদারদের উত্তম ফুত্তম করে।

আজ থেকে হাজার বছর আগেকার প্রবাসী বাঙালী ছাত্রের এই বর্ণনা দিচ্ছেন সমসাময়িক কাশ্মীরী কবি ক্ষেমেন্দ্র তাঁর দশোপদেশ গ্রন্থে। প্রাচীন বাঙালীর চালচলন ও দৈনন্দিন জীবনযাত্রা সম্বন্ধে খুব বেশি তথ্য পাওয়া যায় না। পুরনো লেখমালা, সাহিত্য, মূর্তিবিগ্রহ থেকে বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত যেটুকু তথ্য পাওয়া যায়, তা দিয়ে কোন ধারাবাহিক ছবি ফুটিয়ে

তোলা যায় না। এই টুকরো টুকরো কাটা-ছেঁড়া ছবিগুলো জোড়া দিয়ে প্রাচীন জীবনচিত্রের শুধু একটা আভাস পাওয়া যেতে পারে।

সাজসজ্জা

একবস্ত্র

পূর্ব, দক্ষিণ আর পশ্চিম ভারতে সেলাই-করা কাপড় পরার আদৌ রেওয়াজ ছিল না। সেলাই-করা জামার আমদানি হয়েছিল ঢের পরে মধ্য ও উত্তর-পশ্চিম ভারত থেকে। কিন্তু অধোবাসের ক্ষেত্রে সেলাই-করা ঢিলা বা চুড়িদার পাজামা বাঙালী, তামিল, গুজরাটী, মারাঠীদের একবস্ত্রের পরিধেয়কে হটাতে পারেনি। পুরুষের অধোবাস যেমন ধুতি, মেয়েদের তেমনি শাড়ি। ধুতি ও শাড়িই ছিল প্রাচীন বাঙালীর প্রধান বেশবাস। তবে যাদের অবস্থা ভাল ছিল, তাদের পরিবারে পুরুষেরা ব্যবহার করত সেলাই-বিহীন উত্তরীয়, মেয়েরা ওড়না। ওড়নাই দরকারমত ঘোমটার কাজ করত। তবে গরিব ও সাধারণ ভদ্র গৃহস্থবাড়ির মেয়েরা শাড়ির আঁচল টেনেই ঘোমটা দিতেন।

ধুতি

প্রাচীনকালের প্রমাণ-সাইজের ধুতি দেখলে আজকাল আমাদের হাসি পাবে। সচরাচর হাঁটুর নিচে ধুতি পরার সে সময় রেওয়াজ ছিল। কাজেই দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ধুতি ছিল নেহাৎ ছোট। মাঝখানটা কোমরে জড়িয়ে দুটো খুঁট টেনে পেছন দিকে নিয়ে গিয়ে কচ্ছ বা কাছা বাঁধা হত। ঠিক নাভির নিচে দু'তিন প্যাঁচের একটি কটিবন্ধের সাহায্যে কাপড়টা কোমরে আটকানো থাকত। কটিবন্ধের গ্রন্থি থাকত ঠিক নাভির নিচে। কেউ কেউ ধুতির একটা খুঁট পেছন দিকে টেনে কাছা দিতেন। অন্য খুঁটটা থাকত সামনের দিকে কোঁচার মত ঝোলানো।

শাড়ি

মেয়েদের শাড়ি পরবার ধরনও প্রায় একই রকম। তবে শাড়ি ধুতির মত এত খাটো নয়। পায়ের গোছ পর্যন্ত নামানো; কাছা নেই। আজকের দিনের বাঙালী মেয়েরা যেভাবে কোমরে এক বা একাধিক প্যাঁচ দিয়ে অধোবাস রচনা করেন, প্রাচীন পদ্ধতিও সেই রকম। তবে আজকের দিনের মেয়েদের মত সেকালের মেয়েরা শাড়ির সাহায্যে উত্তরবাস রচনা করে আব্রুর প্রয়োজন বোধ করতেন না। ওপরের গা খালি রাখাই ছিল রীতি। তবে অবস্থাপন্ন উচ্চকোটি স্তরে ও নগরে

—হয়ত কতকটা মধ্য ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের দেখাদেখি—উত্তরীয় বা ওড়নার কিছুটা ব্যবহার ছিল। মেয়েদের ওপরের গা খালি রাখার ঐতিহ্য শুধু প্রাচীন বাংলাদেশেই সীমাবদ্ধ ছিল না; আসলে সমস্ত প্রাচীন আদি অস্ট্রেলীয়-পলিনেশিয়-মেলানেশিয় নরগোষ্ঠীর মধ্যেই এই ছিল প্রচলিত প্রথা। বলিদ্বীপ এবং প্রশান্ত মহাসাগরের অন্যান্য দ্বীপে সেই অভ্যাস ও ঐতিহ্যের রেশ আজও দেখতে পাওয়া যায়।

মেয়েদের শাড়ি ও উত্তরবাস, পুরুষদের ধুতি প্রভৃতিতে কোন কোন ক্ষেত্রে নানারকম লতাপাতা, ফুল এবং জ্যামিতিক নক্সা আঁকা থাকত। এই রকম নক্সা আঁকা কাপড়ের সঙ্গে ভারতের পরিচয় আরম্ভ হয় খৃষ্টীয়

নক্সা সপ্তম-অষ্টম শতক থেকে; এবং সিন্ধু, সৌরাষ্ট্র ও গুজরাট ছিল গোড়ার দিকে এই বস্ত্র-ব্যবসায়ের প্রধান কেন্দ্র। পরে ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গাতেও ক্রমে তা ছড়িয়ে পড়ে। এই নক্সা-আঁকা বস্ত্রের ইতিহাসের মধ্যে ভারত-ইরাণ-মধ্য এশিয়ার শিল্প ও অলংকরণগত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের ইতিহাস লুকিয়ে আছে।

আটপৌরে পরিধেয় ছাড়াও সভা-সমিতি এবং বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে বিশেষ বিশেষ পোষাকের ব্যবস্থা ছিল। নর্তকী মেয়েরা পরতেন পায়ের গোছ অবধি আঁটসাঁট পাজামা; দেহের উত্তরার্ধে কাঁধের ওপর দিয়ে

সাজপোষাক তাঁরা ঝুলিয়ে দিতেন লম্বা একটা ওড়না। নাচের সময় ওড়নার আঁচল উড়ত লীলায়িত ভঙ্গিতে। সন্ন্যাসী তপস্বীরা এবং একান্ত দরিদ্র সমাজ-শ্রমিকেরা পরতেন ন্যাঙ্গোটি। সৈনিক ও কুস্তিগিররা পরতেন উরু পর্যন্ত লম্বা খাটো আঁট জাঙ্গিয়া; সাধারণ মজুররাও বোধ হয় কখনও কখনও ঐ ধরনের পোষাক পরতেন। শিশুদের পরনে থাকত আজানুলম্বিত আঁট পাজামা এবং কটিদেশে জড়ানো ধটি। তাদের গলায় ঝুলত এক বা একাধিক পাটা বা পদক সম্বলিত সূত্রহার।

আজও যেমন, তেমনি প্রাচীনকালেও বাঙালীর টুপি জাতীয় কিছু ছিল না। নানা কায়দায় কেয়ারি-করা চুলই ছিল তাঁদের শিরোভূষণ। পুরুষেরা লম্বা বাবড়ির মত চুল রাখতেন; থোকা থোকা হয়ে তা কাঁধের

চুলের বাহার ওপর ঝুলত। কারও কারও আবার ওপরের চুল চুড়ো করে বাঁধা। কপালের ওপর দোলানো কোঁকড়া চুল টুকরো কাপড়ে ফিতের মত ক'রে বাঁধা। মেয়েদের লম্বা চুল ঘাড়ের ওপর খোঁপা করে বাঁধা,

কারো কারো মাথার পেছনে দিকে এলানো। সন্ন্যাসী তপস্বীদের লম্বা জটা দু ধাপে মাথার ওপর জড়ানো। শিশুদের চুল তিনটি 'কাকপক্ষ' গুচ্ছে মাথার ওপর বাঁধা।

যোদ্ধারা জুতো পায়ে দিত; পাহারাওয়ালা, দরোয়ানেরাও জুতো পরত। চামড়া দিয়ে সেই জুতো এমনভাবে তৈরি হত যাতে পায়ের গোছ পর্যন্ত ঢাকা পড়ে। জুতোয় কোন ফিতে থাকত না। সাধারণ লোকে বোধ হয় চামড়ার কোন জুতো ব্যবহার করত না। অবস্থাপন্ন লোকদের মধ্যেও কাঠের খড়মের ব্যাপক প্রচলন ছিল। লোকে বাঁশের লাঠি এবং ছাতা ব্যবহার করত। পাহারাদার, দরোয়ান, কুস্তিগির সবাই লম্বা বাঁশের লাঠি ব্যবহার করত।

জুতো

সাজসজ্জার দিক থেকে প্রাচীন কালের মেয়েদের শৌখিনতা কম ছিল না। কপালে পরতেন তাঁরা কাজলের টিপ; সিঁথিতে সিঁদুর। পায়ে দিতেন আলতা, ঠোঁটে সিঁদুর। গায়ে আর মুখে মাখতেন চন্দনের গুঁড়ো আর চন্দনপঙ্ক, মৃগনাভি, জাফরান প্রভৃতি। ঠোঁটে লাক্ষারস। মাথা আর খোঁপায় ফুল গুঁজে দেওয়া ছিল প্রসাধনের অঙ্গ। মেয়েরা চোখে কাজল দিতেন; নখে রং লাগাতেন কিনা জানা যায় না। তবে পুরুষরা লম্বা লম্বা নখ রাখতেন এবং তাতে রং লাগাতেন। বিধবা হলে মেয়েদের সিঁথির সিঁদুর মুছে ফেলা হত। মেয়েরা প্রসাধনে কর্পূর এবং রং ব্যবহার করতেন। রাজরাজড়াদের বাড়ির মেয়েরা বেশভূষা, প্রসাধন, গয়নাগাঁটি ইত্যাদি ব্যাপারে উত্তরাপথের আদর্শই মেনে চলতেন।

সাজসজ্জা

শহুরে মেয়েদের বর্ণনা দিয়েছেন এক অজ্ঞাতনামা প্রাচীন কবি:

"গায়ে তাদের সূক্ষ্ম বসন, হাতে সোনার তাগা; গন্ধতেল ঢালা চক্‌চকে চুল মাথার ওপর চুড়োর মত করে বাঁধা, তাতে আবার ফুলের মালা জড়ানো; কানে নবশশিকলার মত ঝক্‌ঝকে তালপাতার বর্ণাভরণ—বাঙালী মেয়ের এই সাজসজ্জা কার না মন ভোলায়!"

শহুরে

আজ থেকে হাজার বছর আগে কবি রাজশেখর গৌড়দেশের মেয়েদের বেশবাসের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন:

"বুকে তাদের চন্দনপঙ্ক, গলায় সূত্রহার, সিঁথি পর্যন্ত টানা

ঘোমটা, অনাবৃত বাহুমূল, গায়ে অগুরুর প্রসাধন, রং যেন দূর্বাদলের মত শ্যামল সুন্দর—এই হচ্ছে গৌড়দেশের মেয়েদের বেশ।"

পাড়াগাঁয়ে পাড়াগাঁর লোকেরা নগরবাসিনীদের বেশভূষা, চালচলন একেবারেই পছন্দ করত না। সেকালের পাড়াগেঁয়ে মেয়েদের সাজসজ্জার বর্ণনা দিয়েছেন কবি চন্দ্রচন্দ্র :

"কপালে কাজলের টিপ। হাতে চাঁদের আলোর মত শাদা পদ্মডাঁটার বালা, কানে কচি রীঠাফুলের দুল, স্নিগ্ধ চুলের খোঁপায় তিলের পল্লব—পল্লীবাসী বধূদের এই বেশ পথচলতি মানুষের গতিবেগ মন্থর করে আনে।"

ঘরে বাইরে প্রাচীনকালের শহর-গাঁয়ের গরিব গৃহস্থ-ঘরের মেয়েদের ঘরগৃহস্থালির কাজ ছাড়াও বাইরের কাজও করতে হত। মাঠে-ঘাটে খাটাখাটুনি করতে হত, হাটবাজারে যেতে হত, সওদা কেনাবেচা করতে হত, তাছাড়া আবার স্বামীপুত্রের পরিচর্যার ভারও তাঁদেরই ওপর। কর্মব্যস্ত এই সমস্ত মেয়েদের কাব্যময় ছবি এঁকেছেন সাত শো বছর আগের প্রাচীন কবি শরণ :

"এই যে হাটের কাজ সেরে ছুটে চলেছে ঘরের মেয়েরা, অস্তগামী সূর্যের মত তাদের চোখের দৃষ্টি ; তাড়াতাড়ি চলতে গিয়ে বারে বারে তাদের কাঁধের আঁচল খসে পড়ছে, বারে বারে তা টেনে তুলতে হচ্ছে। সেই কোন্ ভোরে ঘর ছেড়ে মাঠের কাজে বেরিয়ে গেছে চাষী, এখন তার ঘরে ফেরবার সময়—এই কথা ভেবে মেয়েরা লাফিয়ে লাফিয়ে পথ সংক্ষেপ করে আনছে, আর ব্যস্তসমস্ত হয়ে হাটে কেনাবেচার দাম আঙুলে গুনছে।"

মিহি কাপড় বাংলাদেশে প্রাচীন কালে নানা রকমের মিহি কাপড় পাওয়া যেত। চুম্‌কি-বসানো, নক্সা-কাটা কাপড়ের বেশ নাম-ডাক ছিল। চতুর্দশ শতকে বাংলাদেশে মেঘ-উদুম্বর, গঙ্গাসাগর, গাঙ্গোর. লক্ষ্মীবিলাস, দ্বারবাসিনী, শিল্‌হটী পট্টাম্বরের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাছাড়া পাওয়া যেত রেশমের কাপড়। তবে সাধারণ লোকের কপালে এসব জুটত না। তাদের পরনে থাকত শাদামাটা কার্পাসের কাপড়, তাও উলিঝুলি ছেঁড়া। কার্পাসের তৈরি মিহি কাপড় শুধু মেয়েরাই কখনও সখনও পরতেন। অনেকে নিজেরাই কাপড়ের সুতো কেটে পাকিয়ে নিতেন।

কর্ণকুণ্ডল ও কর্ণাঙ্গুরী, অঙ্গুরীয়ক, কণ্ঠহার, বলয়, কেয়ূর, শঙ্খবলয়, মেখলা—এসব অলঙ্কার মেয়েপুরুষ সমানে ব্যবহার করত। এছাড়া মুক্তাখচিত হার, মহানীল রক্তাক্ষমালারও উল্লেখ পাওয়া যায়। রাজবাড়ির চাকরদের স্ত্রীরাও নাকি হার, কর্ণাঙ্গুরী, মালা, মল এবং স্বর্ণ বলয় ইত্যাদি পরতেন, দামী পাথরের তৈরি ফুল ইত্যাদিও ব্যবহার করতেন। মুক্তাখচিত হার পরতেন রাজবাড়ির মেয়েরা। সোনারুপোর গহনা ছাড়াও হীরাখচিত নানা সুন্দর অলঙ্কার, রত্নখচিত ঘুঙুর এবং মুক্তা, মরকত, নীলকান্ত মণি, চুনি প্রভৃতি রত্নের ব্যবহার ছিল। অবশ্য সাধারণ মধ্যবিত্ত এবং গরিব গৃহস্থদের ভাগ্যে এসব জুটত না; বড় জোর শঙ্খবলয়, কচি তালপাতার কর্ণাভরণ এবং ফুলের মালা নিয়েই তাদের সন্তুষ্ট থাকতে হত।

অলঙ্কার

উঁচুঘরের বিয়েতে কিভাবে সাজসজ্জা, ধুমধাম হত তার বর্ণনা পাওয়া যায় নৈষধচরিতে। প্রথমেই স্বামীপুত্রবতী মেয়েরা মঙ্গলগীত গাইতে গাইতে বিয়ের কনেকে স্নান করাতেন এবং শুভ্র পট্টবস্ত্র পরাতেন। তারপর সখীরা কপালে পরাতেন মনঃশিলার তিলক, সোনার টিপ, চোখে পরাতেন কাজল, কানে মণিকুণ্ডল, ঠোঁটে আল্‌তা, গলায় সাতলহর মুক্তোর মালা, হাতে শাঁখা ও সোনার বালা, পায়ে আল্‌তা। বিয়ের জায়গায় মেয়েরা আলপনা আঁকতেন, শিল্পীরা নানা রকম রঙে ছোপানো কাপড়ের তৈরি ফুলে নগরের রাস্তাঘাট সাজাতেন, বাড়ির দেয়ালে ছবি আঁকতেন। উৎসবের প্রধান বাজনা ছিল বাঁশি, বীণা, করতাল, মৃদঙ্গ। বর দেখবার জন্যে রাস্তায় নগরের মেয়েরা সার দিয়ে দাঁড়াতেন। মঙ্গলানুষ্ঠান উপলক্ষে বাড়ির দরজার দুপাশে কলাগাছ প্রতিষ্ঠা করা হত। বাসরঘরে আজকের মত তখনও চুপিসারে আড়ি পাতা হত। সেকালে বরকনের গাঁটছড়া বাঁধার রীতিও প্রচলিত ছিল। বাড়ির মেয়েরা বরযাত্রীদের খাইয়ে-দাইয়ে আপ্যায়িত করতেন। ঠাট্টা-রসিকতায় সে যুগের বরযাত্রীরাও কম যেতেন না।

বিয়েবাড়ি

পানাহার

একেবারে আদিম যুগ থেকেই বাঙালী ভাতের ভক্ত। হাঁড়িতে ভাত না

থাকলে হাতপা এলিয়ে যায়। এ হচ্ছে বাংলার ভেড্ডাপ্রতিম আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সভ্যতা ও সংস্কৃতির দান। নৈষধচরিতে এক ভোজসভার বর্ণনায় আছে: পাতে গরম ভাত দেওয়া হয়েছে—তা থেকে ধোঁয়া উঠছে; প্রত্যেকটি কণা তার অভগ্ন, একটা থেকে আরেকটা আলাদা করা যায়; সরু সরু প্রত্যেকটি দানা তার সুসিদ্ধ, সুস্বাদু এবং দুধের মত শাদা, তাতে ভুর ভুর করছে চমৎকার গন্ধ। দুধ আর অন্নপক্ক পায়েসও উঁচুঘরের লোকদের কাছে সামাজিক ভোজে বিশেষ প্রিয় ছিল।

ভাত

বাংলা, আসাম, উড়িষ্যায় যত ডাল ব্যবহার হয়, তার খুব সামান্য অংশই এই তিন প্রদেশে জন্মায়; আগে ফলন আরও কম ছিল। পূর্ব-দক্ষিণ এশিয়ায়, প্রশান্ত মহাসাগরের দেশ ও দ্বীপগুলিতে আজও ডালের ব্যবহার নেই বললেই চলে। সেইজন্যে ডালের চাষও নেই। বাংলার কোন কোন জেলায়, যেমন বরিশাল, ফরিদপুর ও মৈমনসিংহে মাছমাংস ও তরিতরকারি খাওয়ার পর একেবারে শেষ পাতে ডাল খাওয়ার রীতি প্রচলিত আছে। বাংলায় যারা সমাজের নিচের দিকে, আজও তাদের মধ্যে ডালের ব্যবহার খুবই কম। ডালের চাষ ও ডাল খাওয়ার রীতিটা সম্ভবত আর্য-সভ্যতার দান এবং তার চলন হয়েছে মধ্যযুগে।

প্রাচীনকালে বাঙালীরা ডাল খেত, এমন কোন উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায় না। সেকালকার উৎপন্ন জিনিসের তালিকাতেও ডালের বা কোন কলাইয়ের উল্লেখ নেই। ভাতের সঙ্গে সাধারণত শাকশব্জী, তরি-তরকারি খাওয়াই ছিল সেকালকার নিয়ম। একটি প্রাচীন শ্লোকে বলা হয়েছে: যে রোজ কলাপাতায় গরম ভাত, গাওয়া ঘি, মৌরলা মাছের ঝোল আর পাট শাক পরিবেশন করে, তার স্বামীই পুণ্যবান। বাঙালীর নিত্যকার খাদ্যের এই ছিল আদর্শ।

আদর্শ খাদ্য

সামাজিক ভোজে অবশ্য শাকসব্জি, তরিতরকারি লোকে তেমন পছন্দ করত না। একবার এক বিয়েবাড়িতে সবুজ পাত্রে ভাত-তরকারি পরিবেশন করা হয়েছিল। বরযাত্রীদের বিরস মুখ দেখে কন্যাপক্ষের লোকেরা বুঝতে পারলেন শাকান্ন পরিবেশন করা হয়েছে ভেবে বরযাত্রীরা অপ্রসন্ন হয়েছেন। তখন আবার তাঁদের ভুল ভেঙে দিয়ে বলা হল: আসলে পাত্রের রং সবুজ বলেই তাঁরা শাকান্ন বলে ভুল

বিবাহভোজ

করেছেন। এই সব ভোজসভায় এত রকমের তরকারি হত যে গুণে শেষ করা যেত না। লোকে খেতে না পারায় প্রচুর খাবার নষ্ট হত। ওপরে যে বিয়েবাড়ির কথা বলা হয়েছে, তাতে যেসব তরিতরকারি খাওয়ানো হয়েছিল তার মধ্যে ছিল : দই ও রাই সর্ষের তৈরি শাদা কিন্তু বেজায় ঝাল একটা তরকারি ; হরিণ, ছাগ এবং পাখির মাংসের নানা রকমের তরকারি ; মাংসের নয়, কিন্তু দেখতে মাংসের মত, নানা জিনিষ দেওয়া কোন তরকারি ; মাছের তরকারি এবং আরও অনেক রকমের সুগন্ধি ও মশলা দেওয়া তরকারি, নানা রকমের মিষ্টি পিঠে এবং দই ইত্যাদি ; কর্পূর-দেওয়া জলে সুন্দর গন্ধ। খাওয়ার পর দেওয়া হয়েছিল নানা রকমের মশলাদার পান। পানের সঙ্গে মশলা হিসেবে কর্পূর ব্যবহার করা হত। দই, পায়েস, ক্ষীর প্রভৃতি দুগ্ধজাত খাবার চিরদিনই বাঙালীর প্রিয়।

মাছ

নিরামিষ আহারে বাঙালীর কোনদিনই রুচি নেই। এদিক থেকে চীন, জাপান, ব্রহ্মদেশ, পূর্ব-দক্ষিণ এশিয়া এবং প্রশান্ত-সাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীদের সঙ্গেই তার মিল বেশি। এইসব দেশে ভাত আর মাছই হচ্ছে প্রধান খাদ্যবস্তু। বাঙালীর এই মৎস্যপ্রীতি আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি কোনদিনই ভাল চোখে দেখেনি। আর্য-ভারতে মাংসের প্রতি বিরাগ ছিল। বিশেষভাবে খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ-পঞ্চম শতক থেকেই খাওয়ার জন্যে প্রাণিহত্যার বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণ্যধর্মে (বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মে তো বটেই) একটা আপত্তি ক্রমশ দানা বেঁধে উঠেছিল এবং আর্য-ব্রাহ্মণ্য ভারত ক্রমেই নিরামিষ আহারের পক্ষপাতী হয়ে উঠেছিল। বাংলাদেশেও ব্যাপকভাবে এই প্রভাব ছড়িয়েছিল ; কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা যথেষ্ট কার্যকরী হয়ে উঠতে পারেনি। বাংলাদেশের চিরাচরিত আমিষ খাওয়ার প্রথা টলাতে না পেরে ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা শেষ পর্যন্ত তাকেই কিছুটা বিধিনিষেধের মধ্যে ফেলে শাস্ত্রসম্মত করে নিলেন। তাঁরা বললেন, মাছ-মাংস খাওয়া দোষের নয়—কয়েকটা বিশেষ বার বা তিথিতে না খেলেই হল। বৃহদ্ধর্ম-পুরাণের মতে রুই, পুঁটি, শোল এবং শাদা আঁশওয়ালা অন্যান্য মাছ ব্রাহ্মণেরা খেতে পারে। আজকের মতই প্রাচীন বাংলাদেশেও ইলিশ মাছ বাঙালীর বিশেষ প্রিয় খাদ্য ছিল ; ইলিশ মাছের তেল নানা কাজে লাগত। যে সব মাছ গর্তে কাদায় বাস করে, যাদের মুখ আর মাথা সাপের মত, চেহারা যাদের কদাকার, যাদের গায়ে আঁশ নেই—সেই সব মাছ এবং পচা ও শুঁটকি মাছ

ব্রাহ্মণদের খাওয়া বারণ ছিল। বাংলাদেশের লোকে অবশ্য শুট্‌কি মাছ খেতে খুবই ভালবাসত। বাঙালীর মৎস্য-প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায় পাহাড়পুর আর ময়নামতীর পোড়ামাটির বিভিন্ন ফলকে। মাছ কোটা এবং ঝুড়িতে ভরে হাটে মাছ নিয়ে যাওয়ার দৃশ্য কয়েকটি ফলকে খোদাই করা আছে।

শবর, পুলিন্দ প্রভৃতি শিকারজীবী লোকদের কাছে এবং অভিজাত সমাজে মাংসের মধ্যে খুবই প্রিয় ছিল হরিণের মাংস। সমাজের সব স্তরেই ছাগমাংস খাওয়ার প্রথা ছিল। আদিবাসীদের মধ্যে শুকনো মাংস খাওয়ার রেওয়াজ ছিল। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের মতে, শুকনো মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ ছিল। শামুক, কাঁকড়া, মোরগ, সারস-বক, হাঁস, দাত্যূহ পাখি, উট, গরু, শুয়োর প্রভৃতির মাংস ব্রাহ্মণ্য-স্মৃতিশাসিত সমাজে অভক্ষ্য হলেও সমাজের নিচের দিকে এবং আদিবাসী কোমের লোকদের মধ্যে এই সব মাংস অবাধে চলত। পঞ্চনখ প্রাণীদের মধ্যে গোসাপ, খরগোস, সজারু এবং কচ্ছপ খাওয়ার ব্যাপারে কারো কোন বারণ ছিল না। শবর, পুলিন্দ, নিষাদ জাতীয় ব্যাধদের পেশা ছিল হরিণ আর পশুপাখি শিকার। ফাঁদ পেতেও অনেক সময় হরিণ ধরা হত।

মাংস

বেগুন, লাউ, কুমড়ো, ঝিঙ্গে, কাঁকরুল, কচু প্রভৃতি যেসব তরকারি আজও আমরা রান্না করে খাই, তার সবই বাংলার ভেড্ডাপ্রতিম আদিবাসী জনগোষ্ঠীর দান। পরে বিশেষভাবে মধ্যযুগে পর্তুগীজদের চেষ্টায় এবং অন্যান্য নানাসূত্রে আরও নানারকমের তরিতরকারি, যেমন আলু, আমাদের খাদ্যের সঙ্গে যোগ হয়েছে। বাঙালীর শাকসব্জি খাওয়ার অভ্যাস অনেক পুরনো।

তরিতরকারি

ফলের মধ্যে বারে বারে কলা, তাল, আম, কাঁঠাল, নারকেল ও আখের উল্লেখ পাওয়া যায়। কলা বাংলার আদিবাসী জনগোষ্ঠীর লোকদের দান। প্রাচীন বাংলার ছবিতে ফলভারাবনত কলাগাছ প্রচুর দেখতে পাওয়া যায়। পূজা, বিবাহ, মঙ্গলযাত্রা ইত্যাদি অনুষ্ঠানে কলাগাছের খুবই ব্যবহার হত। আখের রস খেতে সেকালকার লোকেও খুব ভালবাসত। আখের রস জ্বাল দিয়ে একরকমের গুড় তৈরি হত। একটি চর্যাগীতিতে তেঁতুলেরও উল্লেখ পাওয়া যায়।

ফল

আশ্বিন মাসে কোজাগর পূর্ণিমার রাত্রে আত্মীয়বন্ধুদের চিঁড়ে এবং

নারকেলের তৈরি নানা রকমের সন্দেশ খেতে দেওয়া হত। ঐদিন পাশা খেলে রাত জাগা ছিল প্রথা। খৈ-মুড়ি খাওয়ার রীতিও প্রচলিত ছিল।

দুধ, ডাবের জল, আখের রস, তালরস ছাড়া মদজাতীয় নানা রকম পানীয় প্রাচীন বাংলায় প্রচলিত ছিল। গুড় থেকে যেসব গৌড়ীয় মদ তৈরি হত, সারা ভারতবর্ষে তার নামডাক ছিল। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা কখনও কখনও মদ্যপান নিষিদ্ধ করলেও তাঁদের নির্দেশ লোকে কতটা মেনে চলত বলা শক্ত। ভাত, গম, গুড়, মধু, আখ এবং তালের রস গেঁজিয়ে নানারকমের মদ তৈরি করা হত। চর্যাগীতির মধ্যে যেভাবে শুঁড়িখানার ঢালাও উল্লেখ পাওয়া যায়, তা থেকে মনে হয় বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যেরা মদ খাওয়া তেমন দোষের বলে মনে করতেন না। শুঁড়িখানায় বসে শুঁড়ির স্ত্রী মদ বিক্রি করতেন, খরিদ্দাররা সেখানে বসেই মদ্যপান করতেন। শুঁড়িখানার দরজায় বোধহয় কোন একটা চিহ্ন আঁকা থাকত, মাতালের দল সেই চিহ্ন দেখে শুঁড়িখানায় সটান হাজির হত। এক জাতের গাছের বাকল শুকিয়ে গুঁড়ো করে তা দিয়ে মদ চোলাই করা হত। মদ ঢালা হত ঘড়ায় ঘড়ায়; বেলের খোলায় করে লোকে মদ খেত।

পানীয়

আমোদ-প্রমোদ

প্রাচীন কালের রাজারাজড়াদের শিকারের খুব শখ ছিল। অন্ত্যজ ও ম্লেচ্ছ শবর, পুলিন্দ, চণ্ডাল, ব্যাধ প্রভৃতি অরণ্যচারী কোমদের কাছে শিকার পেশা এবং নেশা দুই-ই ছিল। পাহাড়পুর ও ময়নামতীর ফলকে শিকারের কিছু কিছু দৃশ্য দেখা যায়। কুস্তি ও নানারকমের দুঃসাধ্য শারীরিক কসরৎ নিম্নস্তরের লোকদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। মেয়েরা জলক্রীড়া ও বাগান করতে ভালবাসত। প্রাচীনকালে পাশা ও দাবা খেলার খুব চলন ছিল। দশম-একাদশ শতকের আগেই বোধহয় বাংলায় দাবা খেলার চলন হয়।

খেলা-ধুলা

সমাজের নিচের কোঠায় এবং মেয়েদের মধ্যে কড়ির সাহায্যে নানা রকমের খেলা, যেমন গুটি বা ঘুন্টি খেলা, বাঘবন্দী, ষোলঘর, দশপঁচিশ, আড়াইঘর

ইত্যাদি অনেককাল থেকেই চলে আসছে। এই সমস্ত খেলা গোটা পূর্ব-দক্ষিণ এশিয়া ও প্রশান্ত-সাগরের বিভিন্ন দ্বীপ ও দেশের সুপ্রাচীন কৌমসমাজের একেবারে মৌলিক গৃহক্রীড়া।

দ্বাদশ শতকে বাজি রেখে লোকে জুয়া খেলত। তাছাড়া বাজি রেখে ভেড়া ও মুরগির লড়াই হত। রাজপরিবারে ও অভিজাত সমাজে হস্তী ও অশ্ব-ক্রীড়ার যথেষ্ট চলন ছিল।

সমসাময়িক সাহিত্যে ও নানা লিপিতে নানাসূত্রে নাচ-গান-বাজনার উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। সমাজের সব স্তরেই এর যথেষ্ট সমাদর ছিল।

নাচ-গান

পুণ্ড্রবর্ধনের কার্তিকের মন্দিরে যে নাচগান হত তা ভরতের নাট্যশাস্ত্র অনুযায়ী এবং নৃত্যগীতমুগ্ধ জয়ন্ত স্বয়ং ছিলেন ভরতানুমোদিত নৃত্যগীতশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। পাহাড়পুর ও ময়নামতীর পোড়ামাটির বিভিন্ন ফলকে, অসংখ্য ধাতু ও প্রস্তরমূর্তিতে নানা ভঙ্গিতে নৃত্যরত মেয়েপুরুষের অনেক ছবি দেখতে পাওয়া যায়। বৃহদ্ধর্ম ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে নটদের সমাজের নিম্নস্তরের বর্ণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এখনও বাঙালী সমাজের নিচের দিকে এমনি একদল গায়ক-গায়িকা দেখতে পাওয়া যায়, যারা গান গেয়ে নেচেকুঁদে নিজেদের পেট চালায়। উঁচুতলার লোকজনদের কেউ কেউ বোধ হয় নটনটীর বৃত্তি গ্রহণ করতেন। জয়দেবের স্ত্রী পদ্মাবতী বিয়ের আগে কুশলী নটী ছিলেন এবং গানবাজনায় তাঁর রীতিমত নামডাক ছিল। পাহাড়পুর ও ময়নামতীর বিভিন্ন ফলকে ও প্রস্তরচিত্রে কাঁসর, করতাল, ঢাক, বীণা, মৃদঙ্গ, বাঁশি, মৃৎভাণ্ড প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের ছবি দেখতে পাওয়া যায়।

ডোম্বীরা যে নৃত্যগীতে পটীয়সী ছিল, চর্যাগীতিতে তার প্রমাণ পাওয়া যায় :

"একটি পদ্ম, তার চৌষট্টি পাপড়ি ; তাতে চড়ে নাচে ডোম্বী।"

লাউয়ের খোলা আর বাঁশের দণ্ডে তার লাগিয়ে বীণাজাতীয় এক রকমের যন্ত্র তাঁরা তৈরি করতেন এবং গান গেয়ে গেয়ে তাঁরা গ্রামে গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়াতেন।

প্রাচীন বাংলার নাচ ও গানের সাহায্যে এক ধরনের নাট্যাভিনয় বোধহয় প্রচলিত ছিল। নাচগানের ভেতর দিয়েই কোন বিশেষ ঘটনাকে ফুটিয়ে তোলা হত।

অভিনয়

"সূর্য লাউয়ে চাঁদ লাগল তন্ত্রী, অনাহত দণ্ড—সব একাকার করে দিলে অবধূতী। ওলো সখি, হেরুক-বীণা বাজছে; শোন্, কী করুণ তন্ত্রীধ্বনি বাজছে। বজ্রাচার্য নাচছে, দেবী গাইছে—এইভাবে বুদ্ধনাটক সুসম্পন্ন হয়।"

যানবাহন

ভেলা, ডিঙ্গি-ডিঙ্গা-ডোঙ্গা প্রত্যেকটি শব্দই এসেছে অষ্ট্রিক ভাষা থেকে। আদিম কাল থেকেই জলপথে নৌকোর ব্যবহার বাংলাদেশে চলে আসছে।

নৌকা

বাঙালী জীবনের সঙ্গে নৌকো যে কত ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে, চর্যাগীতিগুলো দেখলেই তা বোঝা যায়। এইসব চর্যা-গীতিতে গূঢ় ধর্মতত্ত্বকে লোকের কাছে সহজ করে তুলে ধরার জন্যে নৌকো, নৌকোর হাল, গুণ, কেড়ুয়াল, পুলিন্দা, খোল, চক্র বা ঢাকা, খুঁটি, কাছি, সেঁউতি, পাল ইত্যাদি রূপক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। বাঙালীর মন যে নৌ-যানের তারে বাঁধা ছিল, এ থেকে তা বোঝা যায়। নৌকোয় খেয়াপারের মাশুল আদায় হত কড়িতে বা বোড়িতে। নিচু জাতের মেয়েরাও অনেক সময় পাটনীর কাজ করতেন।

"গঙ্গা আর যমুনার মাঝ বরাবর চলেছে নৌকো; মাতঙ্গ-কন্যা ডোম্বী তাতে জলে ডুবে ডুবে অবলীলাক্রমে পার করছে। বাও গো ডোম্বী, বেয়ে চল—পথেই যে সময় বয়ে যায়। সদ্গুরুর পাদপদ্মে যাবো জিনপুর। পাচটি পড়ছে পথে, পিঠে কাছি বাঁধো; সেঁউতিতে জল ছেঁচো; দেখো, যেন সন্ধিতে জল না ঢোকে।"

সরহপাদের একটি গীতে আছে :

"দেহ হল নৌকো, খাঁটি মন তার দাঁড়; সদ্গুরুর বচনে হাল ধরো। চিত্ত স্থির করে নৌকো ধরো। এ ছাড়া পারে যাবার আর উপায় নেই। নৌবাহী নৌকো টানে গুণে; সহজে গিয়ে মেলো, অন্য পথে যেও না। পথে আছে ভয়, বলবান দস্যু; ভবতরঙ্গে সবই টলমল কূল ধরে খরস্রোতে উজিয়ে যায়: সরহ বলে, আকাশে গিয়ে প্রবেশ করে।"

ইত্যাদির পুজো আর উৎসব প্রচলিত ছিল, বাংলাদেশেও তেমনি নানা রকমের ধ্বজাপুজো ছিল। একাদশ শতকের আগে শক্রধ্বজ বা ইন্দ্রধ্বজের পুজো হ'ত। প্রাচীন কালের রাজরাজড়াদের মধ্যে তাম্রধ্বজ, ময়ূরধ্বজ, হংসধ্বজ প্রভৃতি পুজোর চল ছিল। এককে কোম বা গোষ্ঠীর ছিল এককে পশু বা পক্ষী আঁকা ধ্বজা ; সেই ধ্বজার পুজোই ছিল সেই গোষ্ঠীর বিশেষ কোমগত পুজো। যে কোমের যিনি নায়ক, সেই কোমের ধ্বজা অনুযায়ী কারো নাম তাম্রধ্বজ, কারো নাম ময়ূরধ্বজ, কারো নাম হংসধ্বজ। যেসব আদিম পশুপাখির চিহ্ন নিয়ে এইসব ধ্বজা তৈরি হয়েছে, পরে অনেক ব্রাহ্মণ্য পৌরাণিক দেবদেবীর রূপ-কল্পনায় তার ছাপ না পড়ে পারেনি ; যেমন দেবীর বাহন সিংহ, কার্তিকের বাহন ময়ূর, বিষ্ণুর বাহন গরুড়, শিবের বাহন নন্দী, লক্ষ্মীর বাহন প্যাঁচা, সরস্বতীর বাহন হাঁস, গঙ্গার বাহন মকর, যমুনার বাহন কূর্ম। দেবদেবীর পুজোর সঙ্গে এইসব পশুপক্ষী-চিহ্নিত পতাকার পুজো অনেকদিন থেকে চলে আসছে। সাঁওতাল, মুণ্ডা, খাসিয়া, রাজবংশী, গারো প্রভৃতি আদিবাসী কোম আর বাংলার নিচু জাতের লোকদের মধ্যে কোন ধর্মকর্মই ধ্বজা আর ধ্বজাপুজো ছাড়া হয় না বললেই চলে।

ধ্বজা-পুজো

খাসিয়া, মুণ্ডা, সাঁওতাল, রাজবংশী, বুনো, শবর ইত্যাদি কোমের লোকেরা তাদের আদিম পূর্বপুরুষদের মত আজও দেবতার আসনে বসিয়ে গাছ, পাথর, পাহাড়, পশুপক্ষী, ফলফুলের পুজো করে থাকে। বাংলায় বিশেষ ক'রে গাঁয়ের দিকে হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য সমাজের মেয়েদের গাছ-পুজো আজও প্রচলিত। অনেক পুজোয় অনেক ব্রত-উৎসবে গাছের ডাল পুঁতে ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর পুজোর সঙ্গে সেই গাছেরও পুজো করা হয়। আমাদের সমস্ত শুভকাজে লাগে আম্রপল্লবের ঘট, নানান ব্রতে লাগে ধানের ছড়া, কলা-বৌকে পুজো করতে হয়।

এ ছাড়া আছে চাষ-আবাদের সঙ্গে জড়ানো নানা দেবদেবীর পুজো। জমিতে প্রথম লাঙল দেবার, বীজ ছড়াবার আর শালিধান বুনবার, ফসল কাটার আর ফসল তোলার নানা অনুষ্ঠান। আছে নবান্ন, নতুন গাছ কিংবা নতুন ঋতুর প্রথম ফল আর ফসলকে কেন্দ্র ক'রে নানা উৎসব। আখমাড়াই-ঘরের দেবতা ছিলেন পণ্ডাসুর (পুণ্ড্রাসুর) ; পুণ্ড্র বা পুঁড় এক রকমের আখ। উত্তর আর পশ্চিম বঙ্গে আজও পণ্ডাসুর পুজো পান ; লোকে সেখানে তাঁকে পড়াসর (সংস্কৃতে পরাশর) ব'লে জানে।

বাংলার আদিবাসী কোমদের অন্যতম প্রধান উৎসব হল যাত্রা। রথযাত্রা, স্নানযাত্রা, দোলযাত্রা ইত্যাদি আসলে এই আসবাসীদেরই দান। আর্য ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ উচ্চকোটির লোকেরা সচল নৃত্যগীতসহ এই ধরনের লৌকিক ধর্মোৎসব তেমন সুনজরে দেখতেন না; অশোক এর বিরুদ্ধে অনুশাসন প্রচার করেছিলেন। কিন্তু রাজারাজড়াদের এসব অনুশাসনে জনসাধারণের ধর্মোৎসব বন্ধ করা যায়নি। এবং বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য সমাজ ক্রমে তা মেনে নিয়েছে; তারই ফলে রথযাত্রা, দোলযাত্রা, স্নানযাত্রা ইত্যাদি আজও অবাধে চলেছে।

যাত্রা

বাঙালীর জীবনে একটা বড় জায়গা জুড়ে আছে ব্রত-উৎসব। প্রাক্-বৈদিক আদিবাসী কোমদের সময় থেকেই এই ধর্মোৎসব চলে আসছে। আদি বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম এইসব গ্রাম্য লৌকিক ধর্মানুষ্ঠান পছন্দ করত না; কিন্তু পরে যখন আর্যপূর্ব ও অনার্য নরনারীরা ক্রমেই বেশি বেশি সংখ্যায় আর্য-ব্রাহ্মণ্য সমাজে স্থান পেতে লাগলেন, তখন অনেক ব্রত-অনুষ্ঠান ব্রাহ্মণ্য ধর্মের স্বীকৃতি পেল। সেইসব অনুষ্ঠানে বামুন-পুরুতেরা এসে মন্ত্র পড়তে লাগলেন। ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের স্বীকৃতি পায়নি, এমন ব্রতের সংখ্যা আজও কম নয়। বাড়ির মেয়েরাই সে-সব অনুষ্ঠানে পুজো করে থাকেন।

ব্রত

এইসব অসংখ্য ব্রতের মধ্যে কয়েকটি: যেমন, বৈশাখে হয় পুণ্যপুকুর ব্রত, শিবপুজো, চম্পা-চন্দন, পৃথ্বীপুজো, গোকল, অশ্বত্থপট, হরিচরণ, মধু-সংক্রান্তি, গুপ্তধন, ধানগোছানো, যাচা পান, তেজোদর্পণ, থোয়াথুয়ি, রণে এয়ো, দশ পুতুলের ব্রত, সন্ধ্যামণি, বসুন্ধরা ব্রত। জ্যৈষ্ঠে জয়মঙ্গলের ব্রত। ভাদ্রে ভাদুরি, তিলকুজারি ব্রত। কার্তিকে কুলকুলটি, ইতুপুজো। অগ্রহায়ণে যমপুকুর, সেঁজুতি, তুষ্‌তুষ্‌লী ব্রত। মাঘে তারণ ব্রত, মাঘমণ্ডল ব্রত। ফাল্গুনে ইতুকুমার, বসন্ত রায়, উত্তমঠাকুর, সসপাতা ব্রত। চৈত্রে নখছুটের ব্রত। এর অনেকগুলোই গুহ্য যাদুশক্তির পুজো।

এছাড়া আরও অনেক ব্রত আছে; তার কোন্‌টা কোন্‌টা প্রাচীন বাংলায় প্রচলিত ছিল, বলার উপায় নেই। যেমন: ষষ্ঠী, মঙ্গলচণ্ডী, সুবচনী, সুখরাত্রি, পাষাণ-চতুর্দশী, দ্যূত-প্রতিপদ, কোজাগর পূর্ণিমা, ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া, আকাশ-প্রদীপ, অক্ষয়-তৃতীয়া, অশোকাষ্টমী, শিবরাত্রি, অখণ্ড দ্বাদশী, পূর্ণিমা ব্রত, নক্ষত্র ব্রত, দীপদান ব্রত, ঋতু ব্রত, কৌমুদী ব্রত,

কম্বলপাদ বলছেন :

খুঁটি উপ্‌ড়ে কাছি খুলে দাও ; হে কামলি (পুর্ববাংলার মাঝি প্রভৃতি দিনমজুরদের আজও 'কামলা' বলে), সদ্‌গুরুকে জিজ্ঞেস করে নৌকো বেয়ে চল। মাঝনদীতে এসে চারদিকে চেয়ে দেখ ; দাঁড় না থাকলে কে বাইতে পারে ?"

নদনদীবহুল এই বাংলাদেশে মানুষের জীবনযাত্রার সঙ্গে জলপথের যে ঘনিষ্ঠ যোগ, তাকে কেন্দ্র করেই অধ্যাত্মজীবনের রূপ-রূপক গড়ে উঠেছিল। পলিমাটির কাদায় ভরা গঙ্গা-পদ্মা-মেঘনা-লৌহিত্যের দুই তীর ; মাঝখানে থই পাওয়া যায় না। গীতে আধ্যাত্মিকতার বেশে সেই ছবিই প্রকাশ পেয়েছে :

"ভবনদী গভীর গম্ভীর, বেগে বহমান ; তার দুই তীরে কাদা, মধ্যিখানে ঠাঁই নেই।"

শান্তিপাদের একটি গীতে আছে :

"হে মূঢ়, কূলে কূলে ঘুরে মরো না ; সংসারের মাঝখানে আছে সহজ পথ। সামনে পড়ে আছে যে সমুদ্র, তার অন্ত যদি না বোঝা যায়, থই যদি না পাওয়া যায়, সামনে যদি কোন নৌকো বা ভেলা দেখা না যায়, তবে অভিজ্ঞ পথিকের কাছ থেকে পথের দিশা জেনে নাও। শূন্য প্রান্তরে যদি পথের ঠিকানা না মেলে, তবু ভ্রান্তির রাস্তায় এগোনো উচিত নয়। সোজা সহজ পথ ধরে এগিয়ে গেলেই মিলবে অষ্টমহাসিদ্ধি। খেলা করতে করতে বাঁ আর দক্ষিণ ছেড়ে মাঝপথে চলতে হবে। এই সহজ পথে ঘাট-ঝোপ কিছু নেই, বাধাবিঘ্ন কিছু নেই ; চোখ বুঁজেই এই পথে চলা যায়।"

গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যাবার জন্যে প্রাচীনকালে লোকে গোরুর গাড়ি ব্যবহার করত। গোরুর গাড়ি দেখতে ছিল আজকের মতই। গোরুর গাড়ি তৈরি হত পলাশ আর শিমূল কাঠে। বিয়ের পর গোরুর গাড়িতে করে বউ নিয়ে বর বাড়ি ফিরত। প্রাচীনকালে বাংলাদেশে মোষের দইয়ের চলন থাকলেও মোষের গাড়ির কোন উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায় না।

গো-যান

প্রাচ্য ও গঙ্গা-রাষ্ট্রের রাজাদের চার ঘোড়ায় টানা রথ ছিল, গ্রীক

ঐতিহাসিকদের বিবরণ থেকে তা জানা যায়। পাহাড়পুরের একটি পোড়ামাটির ফলকে সুসজ্জিত ঘোড়ার ছবি আছে; এই ধরনের সুসজ্জিত ঘোড়ায় চড়েই অবস্থাপন্ন লোকেরা স্থানান্তরে যাতায়াত করত।

অশ্ব-যান

অসংখ্য লিপিতে হস্তীসৈন্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। গঙ্গারাষ্ট্রের সৈন্যবলের মধ্যে প্রধান ছিল হস্তীবল। পূর্ব ভারতে অনেক প্রাচীন কাল থেকেই হাতি ছিল একটি প্রধান বাহন। বিশেষ করে বাংলাদেশে ও কামরূপে হাতি ধরা ও হাতির চিকিৎসা ইত্যাদি এমনই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, তাই নিয়ে একটি আলাদা শাস্ত্র গড়ে উঠেছিল। এই শাস্ত্রের নাম হস্তী-আয়ুর্বেদ। রাজা-রাজড়া, সামন্ত-জমিদারের দল হাতির পিঠে চড়ে অনেক সময় যাতায়াত করতেন। চর্যাগীতি ও দোহাকোষে অনেক ক্ষেত্রে হাতির রূপক ব্যবহার করা হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায়, হাতির পরিচয় সাধারণ বাঙালী ভালভাবেই রাখত। আজকের মতই সে সময় খেদা পেতে হাতি আর হাতির বাচ্চা ধরা হত। বুনো হাতিকে শক্ত করে বেঁধে রাখা হত। কিন্তু বুনো হাতিকে বেঁধে রাখা যে কত কঠিন ছিল, কাহ্নুপাদের একটি গীত থেকে তা বোঝা যায়:

হাতি

> "বুনো হাতি কোন বাধাবন্ধনই মানে না; সমস্ত শিকলখুঁটি ভেঙে ছিঁড়ে পদ্মবনে গিয়ে প্রবেশ করে।"

পাগল হাতির বর্ণনা পাওয়া যায় মহীধরপাদের একটি গানে:

> "আমার মনের মত্ত হাতি ধেয়ে চলেছে, অনবরত আকাশে সব কিছু ঘুলিয়ে যাচ্ছে; পাপপুণ্যের শিকল ছিঁড়ে, সমস্ত খাম্ভা মাড়িয়ে গগনশিখরে পৌঁছে তবে সে শান্ত হয়েছে।"

উত্তর ও পূর্ব বাংলার পার্বত্য নদীর তীরে তীরে হাতিরা ঘুরে বেড়াত খুশিমত। সরহপাদ বলছেন:

> "মনের হাতিকে ছেড়ে দাও, এ নিয়ে আর কোন প্রশ্ন নয়। গগন-গিরির নদীজল সে পান করুক, তার তটে খুশিমত সে বাস করুক।"

প্রাচীনকালের বাংলায় পাল্কির ব্যবহারও ছিল বলে মনে হয়। ত্রয়োদশ শতকের কেশবসেনের ইদিলপুর লিপিতে একটু প্রচ্ছন্নভাবে হাতির দাঁতের তৈরি বাহদণ্ডযুক্ত পাল্কির উল্লেখ দেখা যায়। বল্লালসেন নাকি এই ধরনের পাল্কিতে ক'রে তাঁর শত্রুদের রাজ-লক্ষ্মীদের বহন করে নিয়ে এসেছিলেন।

পাল্কি

ঘর-গৃহস্থালি

সমসাময়িক সাহিত্যের বর্ণনা এবং বাণগড়, রামপাল, মহাস্থান, দেওপাড়া প্রভৃতি জায়গার ধ্বংসাবশেষ থেকে মনে হয়, অবস্থাপন্ন নগরবাসীরা ইটকাঠের তৈরি ছোট বড় দালানে বাস করতেন, রাজপ্রাসাদও ইটকাঠ দিয়ে তৈরি হত। গ্রামের দিকে ইটকাঠের তৈরি বাড়ি বড় একটা ছিল বলে মনে হয় না ; কোন গ্রামের বর্ণনাতেই তেমন কোন উল্লেখ নেই। গরিব নিম্নস্তরের লোকেরা তো বটেই, এমন কি সম্পন্ন মহত্তর-কুটুম্ব-গৃহস্থরাও সাধারণত মাটি, খড়, বাঁশ, কাঠ ইত্যাদির তৈরি বাড়িতে বসবাস করতেন। মাটির ফলক দেখে মনে হয়, সে সময়ে ঘরের চাল হত খড়ের, বেড়া হত বাঁশের চাঁচারির আর খুঁটি হত বাঁশ কিংবা কাঠের। রাঢ় অঞ্চলে ও উত্তর বাংলায় হত মাটির দেয়াল ; পূর্বাঞ্চলে বাঁশের চাঁচারির বেড়া। আজকের মতন সে সময়েও বাঁশ বা কাঠের খুঁটির ওপর ধনুকের মত বাঁকানো অথবা দুই-তিন থাকে পিরামিডের মত সাজানো চাল বা ছাউনি তৈরি হত।

বাড়িঘর

নদনদী-খালনালায় বাংলাদেশ ভর্তি ; কাজেই এ-পাড়া থেকে ও-পাড়ায় যেতে জল না পেরিয়ে উপায় নেই। সেইজন্যে খুব বেশি রকম সাঁকোর দরকার। বাঁশ কিংবা কাঠের সাঁকোর সঙ্গে বাঙালীর পরিচয় অনেক কালের পুরনো। চর্যাগীতির একটি গানে আছে :

সাঁকো

> "লোকে যাতে নির্ভয়ে পারাপার করতে পারে, তার জন্যে চাটিলপাদ বেশ একটা মজবুত সাঁকো তৈরি করে দিলেন। বড় বড় গাছ চিরে সাঁকোর পাট জোড়া দেওয়া হল, টাঙ্গি দিয়ে তাকে শক্ত করা হল।"

ঘরে আসবাবপত্র হিসেবে যেসব জিনিস ব্যবহার হত, তার কিছু কিছু নমুনা বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থে ও ফলকচিত্রে পাওয়া যায়। বড়লোকেরা প্রাচীন-কালে সোনারুপোর তৈরি থালাবাসন ব্যবহার করতেন। গ্রামের সাধারণ গৃহস্থেরা কাঁসার তৈরি এবং গরিব লোকেরা সাধারণত মাটির তৈরি থালাবাটি ব্যবহার করতেন। পুরনো ধ্বংসাবশেষের মধ্যে এই ধরনের কিছু কিছু ভাঙাচোরা মাটির পাত্র পাওয়া গেছে। নানা প্রাচীন ফলকে মাটির খেলনা, ফুলদানি, খাট, নানা আকারের কলস, বাটি, থালাবাসন, পানপাত্র, মাটির জালা, ঘটি, দোয়াত, দীপাধার, ঘড়া,

আসবাব

জলচৌকি, বই রাখবার জায়গা ইত্যাদির ছবি দেখতে পাওয়া যায়। নানা সুদৃশ্য আলপনা-আঁকা ও সোনার তৈরি বিচিত্র আসবাবপত্রের কথা সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত পড়লে জানা যায়। এসব তৈজসপত্র বড়লোকদের বাড়িতেই শুধু পাওয়া যেত, তাতে সন্দেহ নেই। লক্ষ্মণসেনের রাজপ্রাসাদে সোনারুপোর পাত্রে খাওয়াদাওয়া হত। ত্রয়োদশ শতকের একটি লিপিতে লোহার জলপাত্রেরও উল্লেখ আছে।

জীবনাদর্শ

নাগর সভ্যতা

খৃষ্টীয় তৃতীয়-চতুর্থ শতক থেকেই বাংলাদেশে কিছুটা উত্তর-ভারতীয় নাগর সভ্যতার ছোঁয়াচ লেগেছিল। তার ফলে নগর-জীবনে বেশ কিছুটা নৈতিক শিথিলতা দেখা দিয়েছিল। অবাধ কামবাসনা ও বিলাসব্যসনের স্রোতে সমাজের উচ্চস্তরের লোকেরা যে গা ভাসিয়ে দিত, বিভিন্ন সমসাময়িক সাহিত্যে তার বিবরণ পাওয়া যায়। ত্রয়োদশ শতকের বিভিন্ন লিপিতে দেখা যায়, প্রতি সন্ধ্যায় সভানন্দিনীরা তাদের নূপুরনিক্কণে মজলিশ সরগরম করছে। সভানন্দিনীরা ছিল বিত্তবান নাগর সমাজের একটা বিশেষ অঙ্গ। নগরে ও গ্রামে বড়লোকেরা দাসী রাখত; অস্থাবর সম্পত্তির মত তাদের কেনাবেচা হত। এর ওপর ছিল আবার দেবদাসী প্রথা। দেবদাসীরা সাধারণত নানা কলাবিদ্যায় পারদর্শী হত। পাল আমলে এই প্রথা দেশের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। সেন-বর্মণ আমলে দেবদাসীরা সমাজের উচ্চস্তরের লোকদের মধ্যে রীতিমত প্রভাব বিস্তার করত।

ব্রাহ্মণ্যাদর্শ

সমসাময়িক ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা অবশ্য সমস্ত রকম দুর্নীতি ও অসংযমের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত ছিলেন। ব্রাহ্মণ্য স্মৃতিগ্রন্থগুলি দেখে মনে হয় তাঁরা নৈতিক আদর্শ উঁচুতে তুলে ধরার জন্যে চেষ্টার ত্রুটি করেননি। চিরাচরিত ঔপনিষদিক, পৌরাণিক এবং রামায়ণ-মহাভারতীয় ব্রাহ্মণ্য নৈতিক উচ্চাদর্শকে তাঁরা জনসাধারণের সামনে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। তাঁদের আদর্শ ছিল পাতিব্রত্য, শুচিশুভ্রতা, স্থৈর্য ও সংযম শ্রী, শীলতা ও ঔদার্য, দয়া, দান ও ক্ষমতার নৈতিক আদর্শ। তাঁরা সমস্ত রকমের

ছুর্নীতি, কামপরায়ণতা, মদ্যাসক্তি, চৌর্যবৃত্তি প্রভৃতির কঠোর নিন্দা করতেন এবং এই সব অপরাধের জন্যে তাঁরা সর্বোচ্চ দণ্ড ও প্রায়শ্চিত্তের বিধান দিয়েছিলেন। সেই সঙ্গে তাঁরা সত্য, দান, দয়া, শুচিতা ও সংযম প্রভৃতি গুণ অর্জন করবার উপদেশ দিতেন।

পল্লীসমাজ

গ্রামদেশে ঠিক এ ধরনের ছুর্নীতি ছিল না। গ্রামবাসীরা শহুরে চালচলন মোটেই ভাল চোখে দেখতেন না এবং এদিকে পল্লীপতিদের কড়া নজর ছিল। কবি গোবর্ধনাচার্যের লেখায় আছে :

> "সখি, সোজা পা ফেলে চলো, শহুরে চাল ছেড়ে দাও। আড়চোখে একটু তাকালেও এখানে পল্লীপতি ডাকিনী বলে দণ্ড দেন।"

পল্লীসমাজে জীবনের একটি সহজ অনাড়ম্বর আদর্শ ছিল। সেই আদর্শ রূপ পেয়েছে কবি শুভাঙ্কের কাব্যে :

> "বিষয়পতির লোভ নেই, বাড়িতে গোরু থাকায় গৃহ পবিত্র, নিজের নিজের ক্ষেতে চাষ হয়, অতিথির সেবায় গৃহিণীর ক্লান্তি নেই—এইসব থেকেই তাঁর পুণ্য আমাদের কাছে কীর্তিত হচ্ছে।"

এই ছিল গ্রাম্য কৃষিনির্ভর প্রাচীন বাঙালী সমাজের মধ্যবিত্তের জীবনাদর্শ। কী তাঁরা চরম সুখ বলে মনে করতেন, তার ইঙ্গিত পাওয়া যায় প্রাকৃত-পৈঙ্গলের ছু-একটি পদে :

> "পুত্র পবিত্রমনা, অজস্র ঐশ্বর্য, স্ত্রী ও কুটুম্বিনীরা শুদ্ধচিত্ত, হাঁকডাক শুনে ভৃত্যের দল শশব্যস্ত—এইসব ছেড়ে কোন্ বর্বর স্বর্গে যেতে চায়?"

অন্য একটি পদে আছে :

> "যদি পাই এক সের ঘি, তবে রোজ বিশটা মণ্ডা পাকাই ; এক টাকায় যদি সৈন্ধব মেলে, তবে তার কিছু না থাকলেও সে রাজা।"

গ্রামের গরিবদের কিন্তু ছুঃখের অন্ত ছিল না। এই ছুঃখের টুকরো টুকরো ছবি নানা কবিতা আর গানের মধ্যে ছড়ানো।

> "হাঁড়িতে ভাত বাড়ন্ত, উপবাস রোজকার ঘটনা ; অথচ

ব্যাঙের সংসার বেড়েই চলেছে। ক্ষিধেয় ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের চোখ আর পেট গর্তে ঢুকেছে, শরীর তাদের কঙ্কালের মত শীর্ণ। ভাঙা কলসীতে এক ফোঁটা জল ধরে। পরনে ছেঁড়া উলিঢুলি কাপড়, সেলাই করার ছুঁচও ঘরে নেই, ভাঙা কুঁড়েঘরের খুঁটি নড়ছে, চাল উড়ছে, মাটির দেওয়াল গলে পড়ছে।"

গরিব লোকদের দুঃখের জীবনে একমাত্র আনন্দ ছিল বোধ হয় গ্রামের অবস্থাপন্ন লোকদের বাড়ির পুজোপার্বণ এবং সমাজের নিম্নস্তরের নানা আদিম কৌমগত যৌথ নাচ, গান আর পুজো।

চর্যাগীতির অনেক গীতে গার্হস্থ্য জীবনের কিছু কিছু ছবি পাওয়া যায়।

গার্হস্থ্য জীবন

দেশে চোর-ডাকাতের রীতিমত উপদ্রব ছিল; তার জন্যে কড়া পাহারার দরকার হত, ঘরে তালাও লাগাতে হত। কুক্কুরীপাদ বলেছেন:

"ঘরের কোণেই আঙিনা; হে অবধূতি, মাঝরাতে চোর এসে কানের গহনা নিয়ে গেল। শ্বশুর ঘুমিয়ে; বউয়ের চোখে ঘুম নেই। চোর গহনা নিয়ে গেল, কোথা থেকে আবার তা পাওয়া যাবে?"

সে যুগেও যে আয়নার ব্যবহার হত, তার উল্লেখ কোথাও কোথাও পাওয়া যায়।

বিয়ের সময় বরপক্ষ যৌতুক নিতেন। যৌতুকের লোভে নিচু জাতের মেয়ে বিয়ে করতেও অনেকের আপত্তি হত না। বঙ্গাল দেশের সঙ্গে সম্ভবত পশ্চিম ও উত্তর-বঙ্গবাসীর বিবাহাদি সম্পর্ক প্রচলিত ছিল না।

অন্ত্যজ সমাজ

জনবসতি থেকে দূরে বড় বড় পাহাড়ের মাথার ওপর ছিল শবর-শবরীদের বাস। শবরীদের গলায় গুঞ্জার মালা, কোমরে জড়ানো ময়ূরের পাখ, কানে কুণ্ডল। শবর নেশায় বুঁদ হয়ে থাকেন। কুঁড়েঘরে খাটিয়া তাঁদের শয্যা। তীরধনুক নিয়ে শিকার তাঁদের পেশা। শবরপাদের একটি গীতে আছে—

"পাহাড়ের ওপর আকাশের গা ঘেঁষে শবরীদের বাড়ি। বাড়ির চারধারে কার্পাস গাছে ফুল ফুটে আছে। চিনা ধান পেকে ওঠায় শবর-শবরীরা আনন্দে মাতোয়ারা। চারিদিকে শকুন আর

শেয়ালের বড় উৎপাত ; তাই বাঁশের চাঁচারির বেড়া দিয়ে চিনা ধানের ক্ষেত রক্ষা করতে হয়।”

ডোম, নিষাদদের বাস ছিল গ্রামের বাইরে উঁচু জায়গায়। উচ্চবর্ণের লোকেরা এঁদের ছুঁতেন না। ডোম, নিষাদেরা যাতায়াত করতেন নৌকোয় ; বাঁশের তাঁত, চাঁচারি ইত্যাদি তৈরি ও বিক্রি ছিল তাঁদের জাতব্যবসা। নলের তৈরি পেটিকা ছেড়ে লোকে বাঁশের তৈরি এইসব জিনিস কিনত। আজও বাংলাদেশে এই ধরনের একদল যাযাবর দেখতে পাওয়া যায়। নৌকোয় তাঁদের ঘরবাড়ি; বাঁশের নানা জিনিস তৈরি করে তাঁরা গাঁয়ে গাঁয়ে বিক্রি করেন।

এইসব যাযাবর ডোম, নিষাদ, শবর, পুলিন্দ, বেদে প্রভৃতিদের অন্যতম বৃত্তি ছিল সাপ খেলানো, ভোজবাজি দেখানো ইত্যাদি। সাপের খুবই উপদ্রব ছিল। রাজসভায় জাঙ্গলিক বা বিষবৈদ্য ছিলেন রাজপুরুষদের মধ্যে একজন ; জাঙ্গুলী সাপেরই একটি নাম। সাপের কামড়ে সমাজের বেশ কিছু লোক প্রাণ দিত বলে ওঝা বা বিষবৈদ্যদের সমাজে একটা বিশেষ স্থান ছিল ; এঁদেরই বলা হয় সাপুড়ে। উমাপতি ধরের একটি শ্লোকে সাপ খেলানোর সুন্দর বর্ণনা আছে :

> ”ভাই সাপুড়ে, তোমার এই সাপগুলো নেহাৎ ছোট ; তোমার মুখের মন্ত্র-পড়া ধুলো এদের মাথা নিচু করে দিচ্ছে। এই ফণা-তোলা সাপটা বোধহয় ধাড়ী সাপ, কেননা যে মাটিতে তোমার মত গুণী রয়েছে, সেখানে আছড়েও এর মাথা নোয়ানো যাচ্ছে না।

বেদের দল সাপ খেলা দেখিয়ে ভিক্ষা করে বেড়াত। গোবর্ধন আচার্যের একটি শ্লোকে তার বর্ণনা আছে :

> “হে সখি, সাপ খেলা দেখতে দেখতে বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে তোমার চোখ দুটো কী মধুর দেখাচ্ছে। কেন তুমি পরের জীবন বিপন্ন করছ ? তার চেয়ে তুমি দূরে সরে যাও, আঙিনায় বসে সাপুড়ে নিরাপদে খেলা দেখাক।”

আজও বাংলার গ্রামদেশের মেয়েদের মধ্যে যে সামাজিক রীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠান ও কামনা-বাসনা দেখা যায়, প্রাচীন যুগের বাংলায় মোটামুটি সেই আদর্শই পালিত হত। বাংলার পাল ও সেন-আমলের লিপি দেখে মনে হয় লক্ষ্মীর মত কল্যাণী, বসুন্ধরার মত সর্বংসহা, পাতিব্রত্যে অচঞ্চল নারীত্বই ছিল প্রাচীন বাঙালী নারীর আদর্শ। স্ত্রী হবেন বিশ্বস্ত, সহৃদয়, বন্ধুর মত এবং স্থৈর্য, শান্তি ও আনন্দের উৎস ; স্ত্রী হবেন স্বামীর ইচ্ছাস্বরূপিনী—এই ছিল সেকালের কামনাবাসনা। শামুক যেমন মুক্তো প্রসব করে, তেমনি মুক্তোর মত বীর ও গুণী সন্তানের জন্ম ছিল স্ত্রীর সব থেকে বড় বাসনা। উঁচুতলার শিক্ষিত সমাজে মা আর স্ত্রীকে বিশেষ সম্মান আর মর্যাদা দেওয়া হত। কোন কোন রাজকাজে রাজ্ঞীর অনুমোদন নিতে হ'ত।

প্রাচীন আদর্শ

সংক্রান্তি ও একাদশী তিথিতে, সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণে তীর্থ-স্নান, উপবাস ও দানধ্যানে অনেক মেয়েই অভ্যস্ত ছিলেন। রাজবাড়ির মেয়েরাও এতে অংশ নিতেন অনেক ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী একই সঙ্গে দানধ্যান করতেন। স্ত্রী ও মায়েরা অনেক বিগ্রহ ও মন্দির প্রতিষ্ঠা করতেন। রামায়ণ-মহাভারতের কথা প্রাচীন বাংলার মেয়েদের মধ্যেও পরিচিত ছিল।

দান-পুণ্য

মেয়েরা বোধহয় কখনও কখনও অবস্থাপন্ন অভিজাত পরিবারে ধাত্রীর কাজ করতেন। তৃতীয় গোপালদেব ছোটবেলায় ধাত্রীর কোলে মানুষ হয়েছিলেন। তাছাড়া দরকার হলে সুতো কেটে, তাঁত বুনে কিংবা অন্য কোন হাতের কাজ করে মেয়েরা স্বামীদের রোজগারে সাহায্য করতেন। কখনও কখনও অর্থের লোভে পড়ে স্ত্রীরা স্বামীদের মজুরগিরি করতে পাঠাতেন ; এ ব্যাপারে নাকি স্ত্রীরা নিয়োগ-কর্তাদের কাছ থেকে ঘুষ নিতেও ছাড়তেন না।

মেহনত

একটিমাত্র স্ত্রী গ্রহণই ছিল সেকালকার সাধারণ নিয়ম। অবশ্য রাজারাজড়া, সামন্ত-মহাসামন্ত, অভিজাত সমাজ এবং ব্রাহ্মণদের মধ্যে বহু-বিবাহের প্রচলন ছিল। সবর্ণে বিবাহ সাধারণ নিয়ম হলেও অসবর্ণ বিবাহ যে প্রাচীন বাংলায় একেবারে অপ্রচলিত ছিল না,

বিবাহ

তার প্রমাণ সমতট-রাজ লোকনাথের মাতামহ পারশব কেশব। কেশবের পিতা ছিলেন ব্রাহ্মণ, কিন্তু মা বোধহয় ছিলেন শূদ্রের মেয়ে। কেবল সপ্তম শতকেই নয়, তার পরেও অসবর্ণ বিবাহ কিছু কিছু ঘটেছে।

প্রাচীন বাংলায়ও মেয়েদের কাছে বৈধব্য ছিল জীবনের চরম অভিশাপ। বিধবা হ'লে সিঁথির সিঁদুর শুধু মুছে যেত না, গহনা-গাঁটি, প্রসাধন সব কিছু থেকে বঞ্চিত হতে হত। কন্যা বা স্ত্রী হিসেবে ছাড়া বিষয়সম্পত্তিতে মেয়েদের কোন বৈধ বা সামাজিক অধিকার ছিল না। কিন্তু স্মৃতিকার জীমূতবাহনের বিধান ছিল এই যে, স্বামীর অবর্তমানে অপুত্রক বিধবা স্ত্রী স্বামীর সমস্ত সম্পত্তিতে পূর্ণ অধিকার দাবি করতে পারেন। যেসব স্মৃতিকার বলেছেন যে, বিধবা স্ত্রী শুধু খোরপোষের বেশি কিছু দাবি করতে পারেন না কিংবা বিধবা স্ত্রীর চেয়ে মৃত স্বামীর ভাই ও অন্যান্য আত্মীয়দের দাবী ঢের বেশি বিধিসম্মত, তাঁদের বিধান জীমূতবাহন খণ্ডন করতে চেষ্টা করেছেন। অবশ্য সেই সঙ্গে তিনি একথাও বলেছেন যে, সম্পত্তির বিক্রি, বন্ধক বা দানে বিধবার কোন অধিকার নেই এবং প্রকৃত বৈধব্যজীবন যাপন করলে তবেই মৃত স্বামীর সম্পত্তিতে স্ত্রীর অধিকার বজায় থাকবে। বিধবা স্ত্রীকে আমৃত্যু স্বামীর আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে বাস করতে হবে; নিতান্ত শাদাসিধেভাবে সংযত জীবন যাপন করতে হবে এবং স্বামীর স্বর্গত আত্মার কল্যাণের জন্যে বিধিসম্মত ক্রিয়াকর্ম যথানিয়মে পালন করতে হবে। শ্বশুরবাড়িতে যদি কোন পুরুষ না থাকেন, তাহলে মৃত্যু পর্যন্ত বাপের বাড়িতে বাস করতে হবে। বিধবাদের পক্ষে মাছ, মাংস ইত্যাদি খাওয়া নিষিদ্ধ ছিল। বিয়ে ইত্যাদিতে বিধবাদের উপস্থিতি অশুভ বলে মনে করা হত; বিধবারা সাধারণত উৎসব-অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারতেন না। সতীদাহ ও সহমরণ-প্রথা প্রাচীন বাংলার অন্তত আদিপর্বের শেষদিকে প্রচলিত ছিল। হিন্দু সমাজের নিম্নতম স্তরে বিধবাবিবাহ একেবারে অপ্রচলিত ছিল না।

বৈধব্য

নাগরিক সমাজের উঁচু কোঠার মেয়েরা লেখাপড়া শিখতেন বলে মনে হয়; পবনদূত কাব্যে মেয়েদের চিঠি লেখার উল্লেখ আছে। তাছাড়া শহরের মেয়েরা অন্যান্য নানা কলাবিদ্যাতেও পারদর্শী ছিলেন। বিশেষ করে নাচগানে তাঁরা রীতিমত কুশলী ছিলেন।

বিদ্যাচর্চা

তৃতীয়-চতুর্থ শতকের প্রাচীন বাংলায় রাজবাড়ির অন্দর-মহলের মেয়েদের নিজেদের খুশিমত চলাফেরা করার অভ্যাস ছিল না। পর্দার আড়াল থেকে তাঁরা অপরিচিত পুরুষদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতেন। সমাজের উচ্চস্তরের অন্দরমহলে মেয়েরা অষ্টপ্রহর ঘোমটায় মুখ ঢেকে রাখতেন। সম্ভ্রান্ত বাড়ির মেয়েরা যখন রাস্তায় বেরোতেন, তখন রাস্তার লোকের দৃষ্টি থেকে তাঁরা নিজেদের আড়াল করে রাখতেন। অন্দর-মহলের মেয়েরা বাড়ির ছাদে উঠে খানিকটা যে মুক্তিসুখ ভোগ করতেন তারও ইঙ্গিত আছে। প্রাচীন বাংলার মধ্যবিত্ত ঘরের বউদের কাছে ঘোমটা ছিল কুলমর্যাদার লক্ষণ।

পর্দাপ্রথা

সম্ভ্রান্ত পরিবারে পর্দা আর ঘোমটার ফলাও ব্যবস্থা থাকলেও, সমাজের যে স্তরে মেয়েদের হাটে-মাঠে-ঘাটে খাটাখাটুনি করে পেট চালাতে হত, সেখানে ওসবের তেমন বালাই ছিল না। বাইরে হাড়ভাঙা খাটুনি খাটতে গেলে ঘোমটা রাখা চলে না। কাজেই ঘোমটার প্রতি তাঁদের এতটুকু শ্রদ্ধাও ছিল না।

অনঙ্গ ত্রয়োদশী, রম্ভাতৃতীয়া, মহানবমী, বুধাষ্টমী একাদশী ব্রত, নক্ষত্রপুরুষ, আদিত্যশয়ান, সৌভাগ্যশয়ন, রসকল্যাণী, অঙ্গারক ব্রত, শর্করা ব্রত, অশূন্যশয়ন, অনঙ্গদান ব্রত ইত্যাদি।

ধর্মঠাকুর গোড়ায় ছিলেন আর্যপূর্ব আদিবাসী কোমের দেবতা। পরে বৈদিক-পৌরাণিক, দেশী-বিদেশী নানা দেবতা তার সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে ধর্মঠাকুর হয়েছে। ধর্মঠাকুরের আসল প্রতীক পাদুকা; ধর্মপুজোর পুরুতরা গলায় ঝোলান একখণ্ড পাদুকা কিংবা পাদুকার মালা। আজও ধর্মপুজোর প্রধান পুরুত ডোমেরা, তবে কৈবর্ত, শুঁড়ি, বাগ্দী, ধোপাদের ভেতর থেকেও আজকাল ধর্মপণ্ডিত বা পুরুত হতে দেখা যায়। রাঢ়দেশেই বরাবর ধর্মপুজোর প্রচলন বেশি। এখন কোথাও কোথাও ধর্মঠাকুর হয়ে গেছেন শিব বা বিষ্ণু; সেখানে তিনি বামুনপুরুতের হাতে ছাড়া পুজো নেন না। গাদা গাদা পিঠে আর প্রচুর মদ দিয়ে ধর্মঠাকুরের পুজো হত। মৃতদেহ ও নরমুণ্ড নিয়ে হত ধর্মের গাজনের নাচ। শূন্যপুরাণে বলা হয়েছে, ধর্মঠাকুর ছিলেন শূন্যমূর্তি, তাঁর বাহন শাদা পেঁচা বা শাদা কাক। যে প্রতীকের পুজো করা হ'ত, সেটা হ'ত পাথরের কূর্মবিগ্রহ; তার ওপর আঁকা থাকত পাদুকার চিহ্ন। গোড়ায় ধর্মঠাকুর নিঃসন্দেহে ছিলেন অনার্য দেবতা। পরে তিনি একে একে বৈদিক বরুণ, ঘোড়ায়-টানা রথে-চড়া সূর্য, কূর্মাবতার, কল্কি অবতার ইত্যাদির সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে আজকের ধর্মঠাকুরে পরিণত হয়ে প্রধানত রাঢ় অঞ্চলেই পুজো পাচ্ছেন।

ধর্মঠাকুর

চৈত্র মাসে হয় নীল বা চড়ক পুজো। ধর্মপুজোর মতই এটিও সমাজের নিম্নস্তরের ধর্মানুষ্ঠান। মালদহে গম্ভীরার পুজো বা বাংলার অন্য জায়গায় শিবের গাজন এই চড়কপুজোরই রকমফের। জলভরা একটি পাত্রে রাখা যে প্রতীকটি এই পুজোর কেন্দ্র সেই প্রতীক হল শিবলিঙ্গ; পূজারীদের কাছে তিনি 'বুড়োশিব'। এই পুজোর পুরুত হলেন আচার্য-ব্রাহ্মণ বা গৃহবিপ্র—অর্থাৎ যাঁরা পতিত ব্রাহ্মণ। চড়কপুজোর বিশেষ বিশেষ অঙ্গ হ'ল কুমীরের পুজো, জলন্ত অঙ্গারের ওপর দোলা, কাঁটা আর ছুরির ওপর লাফানো, বাণফোঁড়া, শিবের বিয়ে আর অগ্নিনৃত্য, চড়কগাছ থেকে দোলা এবং দানো-বারাণো বা হাজরা পুজো। দানো বারানো বা হাজরা পুজোর জায়গা সাধারণত শ্মশানে। ধর্মপুজো আর

চড়ক

চড়ক পুজোর মূলে আছে সমাজের ভূতপ্রেত ও পুনর্জন্মবাদের ওপর বিশ্বাস। এর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রাচীন কোম-সমাজে প্রচলিত নরবলি প্রথার কথা মনে করিয়ে দেয়।

হোলী বা হোলাক উৎসব দ্বাদশ শতকের আগেই বাংলায় উত্তর-ভারতের মতই ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। গোড়ায় হোলী ছিল কৃষিসমাজের পুজো।

হোলী

ভাল ফসলের আশায় এই উৎসব হত; নরবলি আর উদ্দাম নাচগান ছিল এর প্রধান অঙ্গ। পরে নরবলির জায়গা নেয় পশুবলি এবং এর সঙ্গে যোগ হয় হোমযজ্ঞ। কিন্তু হোলীর সঙ্গে প্রধানত যে উৎসব-অনুষ্ঠানের যোগ, তা হ'ল মদনোৎসব ও রাধাকৃষ্ণের ঝুলন; কোথাও কোথাও মূর্খতম এক রাজাকে নিয়ে নানারকম ছল-চাতুরী ও তামাসা করা হত। মনে হয় ষোড়শ শতকের পরে কোন সময়ে চৈত্র মাসের মদনোৎসব আস্তে আস্তে হোলীর সঙ্গে মিলেমিশে এক হয়ে যায়। চৈত্রমাসের রাধাকৃষ্ণের ঝুলনলীলাও পরে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় এগিয়ে এসে হোলীর সঙ্গে একাকার হয়ে যায়। রাধাকৃষ্ণকে দোলনায় দুলিয়ে ফুল, কুমকুম, আবীরগোলা জল ছড়ানো হত; তাই থেকে হোলীর সঙ্গে পীচকারির যোগাযোগ। এমনি করে আদিম কৃষিসমাজের বলি আর নাচগানের উৎসব হোলীর রূপ নিয়েছে।

ভারতের প্রায় সব জায়গাতেই বর্ষাকালে মেয়েদের মধ্যে, বিশেষ ক'রে বিধবাদের মধ্যে, অম্বুবাচীর পারণ পালন করবার রীতি আছে।

অম্বুবাচী

এই পারণের তিনদিন বা সাত দিন তাঁরা রান্না-করা কোন খাবার খান না, মাটি খোঁড়েন না, আগুন জ্বালেন না, রান্না করেন না—এমন কিছুই করেন না যাতে পৃথিবীর অঙ্গে কোন আঘাত লাগে।

বাংলা, আসাম আর ওড়িষ্যায় মনসাদেবীর পুজো হয়। এখন সাধারণত যেভাবে এই পুজো হয়, তা প্রতিমা-পুজো নয়—ঘট-মনসা পট-মনসার পুজো

মনসা পূজো

—ধানবোঝাই মাটির ঘটের ওপর সর্পধারিণী মনসার ছবি এঁকে তাঁর পুজো কিংবা শোলা বা কাপড়ের পটের ওপর সর্পধারিণী মনসার কাহিনী এঁকে টাঙানো পটের সামনে পুজো করাই সাধারণ রীতি। কিন্তু প্রায় হাজার বছর আগে বাংলাদেশে মনসার প্রতিমা পুজো হত। বাংলাদেশে মনসাদেবীর যেসব মূর্তি পাওয়া গেছে, তার প্রত্যেকটিতেই মনসাদেবীর সঙ্গে একাধিক সাপের কোলে একটি মানব

শিশুর, একটি ফলের এবং কোথাও কোথাও একটি ভগ্না ঘটের ছবি আছে। পাল আমলের গোড়ার দিকেই দেখা গেল ব্রাহ্মণ্যধর্ম মনসাদেবীকে জাতে তুলে নিতে আরম্ভ করেছে; কিন্তু অনেকদিন পর্যন্ত তাঁকে কোন সুনির্দিষ্ট রূপ দিতে পারেনি। কোন কোন ধ্যানে তাঁর বাহন হাঁস; হাতে তাঁর বই-পুঁথি আর অমৃতকলস। এসব উপকরণ সরস্বতীর, তা বলবার দরকার হয় না।

মনসার সঙ্গেই নাম করা যায় জঙ্গলবাসী, শবরকুমারী রূপিনী বৌদ্ধ জাঙ্গুলী-দেবীর। এই দেবী বীণা বাজান এবং মনসার মত সাপের বিষ ঝেড়ে দিতে পারেন। মনে রাখা দরকার যে, বৈদিক সরস্বতীরও একটা গুণ ছিল—তিনি সাপের বিষ কাটাতে পারতেন এবং সেক্ষেত্রে তিনিও শবর-কন্যা। এরই ওপর নির্ভর ক'রে যেমন মনসাকে, তেমনি জাঙ্গুলী দেবীকেও পরে সরস্বতীর সঙ্গে কোথাও কোথাও অভিন্ন ব'লে কল্পনা করা হয়েছে; ব্রাহ্মণ্য মনসা এবং বৌদ্ধ জাঙ্গুলী যে একই দেবী তাও বলা হয়েছে।

জাঙ্গুলী

প্রাচীন আদিবাসী শবরদের সঙ্গে আর এক বজ্রযানী বৌদ্ধ দেবীর খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ; সেই দেবীর নাম পর্ণশবরী। পরনে তাঁর বাঘের চামড়া আর গাছের পাতা। বজ্র-কুণ্ডলধারিণী এই দেবী অগণিত রোগ, ব্যাধি আর মারী-মড়ক পায়ে মাড়িয়ে চলেন। গোড়ায় তিনি শবরদেরই আরাধ্য দেবী ছিলেন; পরে আর্যধর্মে স্থান পেয়ে তিনি হলেন শবরের ভগবতী বা দুর্গা। বজ্রযানী বৌদ্ধ সাধনায় শবরদের বিশেষ একটা স্থান ছিল।

পর্ণশবরী

আমাদের জীবনযাত্রার নানা ক্ষেত্রে পূর্ব ভারতের শবরদের সুপ্রাচীন ও সুবিস্তৃত সংস্কৃতি ছাপ রেখে গেছে। পাহাড়পুরের অসংখ্য মাটির ফলকে শবর নরনারীর দৈনন্দিন জীবনের নানা ছবি খোদাই করা আছে। বাংলার নানা জায়গায়, উত্তর ও পশ্চিম-দক্ষিণ বাংলায় হিন্দু সমাজের নিচের তলায় শবররা স্থান পেয়েছে। বাংলাদেশে দুর্গাপুজোর দশমী তিথিতে শাবরোৎসব নামে এক উৎসব ছিল। এই উৎসবে লোকে শবরদের মত উলঙ্গ দেহে গাছের পাতা জড়িয়ে, সারা গায়ে কাদা মেখে তাল-বেতালে পুরোদমে নাচগান করত, ঢাক বাজাত। এই উৎসবে শালীনতার বালাই থাকত না।

শাবরোৎসব

বাংলাদেশের লোকধর্মে লক্ষ্মীর দ্বিতীয় একটি পরিচয় আছে। সে লক্ষ্মী হলেন কৃষি-সমাজের মানস-কল্পনার সৃষ্টি। তিনি শস্য-প্রাচুর্যের ও সমৃদ্ধির দেবী। এই লক্ষ্মীর পুজো হল ঘটলক্ষ্মীর পুজো—ধানের ছড়া-ভরা ছবি আঁকা ঘটের পুজো। এর সঙ্গে জড়ানো রয়েছে যেসব ব্রতকথা, যেসব পৌরাণিক কাহিনী, তা থেকে বোঝা যায়—স্তরে স্তরে ধ্যান আর অনুষ্ঠানের ভেতর দিয়ে লক্ষ্মীর এই মানস-মূর্তিই ক্রমে পৌরাণিক লক্ষ্মীতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু বাঙালী হিন্দুর ঘরে ঘরে কৌমসমাজের ঘটলক্ষ্মী আজও অম্লান হয়ে আছে। শারদীয়া পূর্ণিমাতে কোজাগর লক্ষ্মীর পুজো গোড়ায় ছিল কৌম সমাজেরই পুজো। দ্বাদশ শতক পর্যন্ত শারদীয় কোজাগর উৎসবের সঙ্গে লক্ষ্মীদেবীর কোন সম্পর্কই ছিল না।

ঘটলক্ষ্মী

ষষ্ঠীদেবীর কোনো মূর্তিপুজো ব্রাহ্মণ্যধর্মে নেই। ষষ্ঠীদেবীর মানস-কল্পনাই বোধ হয় বৌদ্ধ প্রতিমাশাস্ত্রে এবং ধর্মানুষ্ঠানে হারীতীদেবী হিসেবে রূপ পেয়েছে। ষষ্ঠীপুজোয় আজও কোন মূর্তিপুজো নেই; মেয়েরা সন্তান কামনা করে এবং সন্তানের মঙ্গল কামনা করে এই পুজো করেন। মারীমড়কের হাত থেকে বাঁচার জন্যেও আগে ষষ্ঠী-হারীতীর পুজো করা হত; এখন গর্দভবাহিনী শীতলাদেবী সেই জায়গা দখল করেছেন।

ষষ্ঠীপুজো

এ সব ছাড়াও বাঙালী সমাজে মেয়েদের মধ্যে এবং সাধারণ আর্যব্রাহ্মণ্য পুজো-আর্চার মধ্যে কিছু স্থানীয় লৌকিক অনুষ্ঠান প্রচলিত, তার প্রায় সমস্তই আর্য-পূর্ব কৌম-সমাজের দান। ভূতপ্রেত আর পুনর্জন্মবাদে বিশ্বাস উৎপাদন আর যাদুশক্তির প্রতীককে দেবতার আসনে বসানো, তাদের শুভ-অশুভ ঘটানোর ক্ষমতায় বিশ্বাস—এ সমস্তই এসেছে প্রাচীন আদিবাসীদের ধ্যানধারণা থেকে। সেই সব ধ্যানধারণা আমাদের ধর্মকর্ম আর অভ্যাসে আজও দৃঢ়মূল হয়ে বসে আছে। শ্রাদ্ধানুষ্ঠান, পিতৃপুরুষের তর্পণ ইত্যাদির গোড়ায় আছে আর্যপূর্ব কৌমসমাজের বিশ্বাস। শ্রাদ্ধের সঙ্গে জড়িত বৃষকাষ্ঠ ও তার বিসর্জন, রান্নার পর কাক ডেকে খাওয়ানো, পিণ্ডদান ইত্যাদি সমস্তই আমরা পেয়েছি প্রতিবেশী শবর, পুলিন্দ, সাঁওতাল, কিরাত, মুণ্ডা, কোল, ভীলদের কাছ থেকে। মঙ্গলানুষ্ঠানের শুরুতে আভ্যুদয়িক অনুষ্ঠানে মৃত পূর্বপুরুষদের স্মরণ ও তাঁদের পুজো করবার

প্রথা তাঁদের কাছ থেকেই আমরা পেয়েছি। বাংলাদেশের বিয়েতে হোম, সম্প্রদান আর সপ্তপদী ছাড়া স্ত্রী-আচার, লোকাচার ইত্যাদি সব কিছুই মূলত কৌমসমাজের দান।

প্রাক্-গুপ্ত

জৈন, আজীবক ও বৌদ্ধ ধর্ম—আর্যধর্মাশ্রয়ী কিন্তু বেদবিরোধী, বেদের অপৌরুষেয়ত্বে অবিশ্বাসী এই তিনটি ধর্মমতের মারফৎই বাংলাদেশ প্রথম আর্যধর্মের সংস্পর্শে এল।

জৈন ধর্ম

খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে রাঢ়দেশের মাটিতে পা দিয়ে জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর যেভাবে স্থানীয় লোকদের কাছে নাকাল হয়েছিলেন, তাতে বেশ বোঝা যায় বজ্রভূমি ও সুহ্মভূমির লোকে এদেশে আর্যধর্মের প্রসার মোটেই পছন্দ করেনি। তা সত্ত্বেও জৈনধর্মের অগ্রগতিকে ঠেকিয়ে রাখা যায়নি। খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ-তৃতীয় শতকেই উত্তর বাংলায় তার যথেষ্ট প্রসার হয়েছিল। বৌদ্ধদের চেয়ে জৈনরা বাংলাদেশের বেশি খবরাখবর রাখত। তাম্রলিপ্তি, পুণ্ড্রবর্ধন, কোটিবর্ষ, কর্বাট—খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতকের আগেই বাংলাদেশের এই চারটি অঞ্চলের নামে জৈন গোদাস-গণীয় চারটি শাখার নামকরণ হয়েছিল। আনুমানিক দ্বিতীয় শতকের শিলালিপিতে জানা যায়, রাঢ়া জনপদের অধিবাসী এক জৈন ভিক্ষু মথুরায় একটি জৈনমূর্তি নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠা করিয়েছিলেন।

আজীবিক

জৈনদের মত অতটা না হলেও আজীবিকেরাও বাংলায় কিছুটা প্রভাব বিস্তার করেছিল। আজীবিক ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা মখলিপুত্র গোসাল ছিলেন মহাবীরের সমসাময়িক; তাঁরা দুজনে বজ্রভূমিতে ছ' বছর একসঙ্গে কাটিয়েছিলেন। মহাবীর রাঢ়দেশে এসে বাঁশের বড় বড় লাঠিধারী আজীবিক সম্প্রদায়ের ধর্মপ্রচারক অনেক ভিক্ষুকের দেখা পেয়েছিলেন। পুণ্ডরাজ মহাপৌম আজীবিকদের একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন; পুণ্ডরাজ সম্ভবত পুণ্ড্রবর্ধনরাজ।

বৌদ্ধধর্ম

বুদ্ধদেবের বাংলায় আগমন ঐতিহাসিক সত্য বলে মনে হয় না। কিন্তু সে যাই হোক, মৌর্য সম্রাট অশোকের আগেই প্রাচীন বাংলার কোথাও কোথাও বৌদ্ধধর্ম ছড়িয়ে পড়েছিল। অশোকের বৌদ্ধধর্ম প্রচার অন্তত কিছুটা বাংলাদেশের হৃদয়

জয় করেছিল, তাতে সন্দেহ নেই। খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের মধ্যে পুণ্ড্রবর্ধনে বৌদ্ধধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। সিংহলী থেরবাদী বৌদ্ধদের চেষ্টায় যেসব জনপদ বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল, খৃষ্টীয় দ্বিতীয়-তৃতীয় শতকের একটি শিলালিপিতে সেই সব জনপদের তালিকায় বঙ্গের নাম পাওয়া যায়। মহাযান-সাহিত্যের মতে বৌদ্ধদের প্রাচীন ষোলজন মহাস্থবিরের মধ্যে অন্তত একজন বাঙালী ; তিনি হলেন তাম্রলিপ্তবাসী স্থবির কালিক।

এইভাবে বাংলাদেশে গুপ্তপর্বের আগে অবৈদিক আর্যধর্মের খানিকটা প্রসার হলেও খৃষ্টীয় তৃতীয়-চতুর্থ শতক পর্যন্ত বাংলাদেশে আর্যবৈদিক ধর্মের ও সংস্কৃতির কিছুই প্রসার হয়নি। তা সত্ত্বেও প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য গ্রন্থে কোথাও কোথাও আর্যব্রাহ্মণ্য ধর্মের সঙ্গে স্থানীয় ধ্যানধারণার সংঘর্ষের কথা আভাসে ইঙ্গিতে জানা যায়।

গুপ্ত পর্বে

খৃষ্টজন্মের প্রায় দেড়শো বছর আগে থেকে খৃষ্টজন্মের পর দেড়-দুশো বছর ধরে ভারতীয় ধর্ম, সংস্কার ও সংস্কৃতির প্রবাহে ভূমধ্যীয় যবন ও মধ্য-এশীয় শক-কুষাণদের ঢেউ এসে লাগছিল ; গোড়াতেই তাদের মিলিয়ে মিশিয়ে মূল প্রবাহেব সঙ্গে একই খাতে বইয়ে দেওয়া সম্ভব হয়নি। গ্রামীণ কৃষিসভ্যতার ধীর মন্থর জীবনে এই সমন্বয় ও সংহতির গতিও ধীরমন্থর না হয়ে পারে না। বৌদ্ধধর্মে মহাযানদের উদ্ভব, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধ্যানে অনেক নতুন নতুন দেবদেবী সৃষ্টি ও রূপকল্পনা, সমাজ ও ধর্মানুষ্ঠানে কিছু কিছু নতুন ক্রিয়াকর্ম এই সময়ে দেখা দেয়। ভারতের অর্থনৈতিক জীবনেও বড় রকমের একটা রূপান্তর এই সময়ে দেখা দেয়। খৃষ্টীয় প্রথম শতকের প্রায় শেষাশেষি থেকেই ভূমধ্যসাগরের সামুদ্রিক বাণিজ্যের সঙ্গে ভারতবর্ষ ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়। রোম-সাম্রাজ্যের সমস্ত প্রান্তর থেকে প্রচুর সোনা আমদানি হবার ফলে ভারতবর্ষ কৃষির বদলে শিল্প-বাণিজ্যেব দিকে ঝুঁকে পড়ে ; সারা দেশে সমৃদ্ধ নগর, বন্দর, হাটবাজার গড়ে ওঠে। বিদেশী নানা ধর্ম, সংস্কার সংস্কৃতির ঢেউ, নানা জাতি ও জনের সংঘাত, অর্থ-নৈতিক কাঠামোর বদল—এর ফলে ভারতের বহিরঙ্গেই শুধু নয়, মানস-জীবনেও গভীর আলোড়ন দেখা দেয়। ফলে, খৃষ্টীর দ্বিতীয় শতক থেকেই

দেখা দিল সংহতি ও সমন্বয়ের সজাগ চেষ্টা; কিন্তু ভারতবর্ষের একটা বিরাট অংশ গুপ্তবংশীয় সম্রাটদের রাষ্ট্রবন্ধনে ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বাঁধা পড়বার আগে পর্যন্ত সেই চেষ্টা সর্বব্যাপী হয়ে ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির নতুন রূপান্তর ঘটাতে পারেনি।

গুপ্ত-সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক বন্ধনে বাঁধা পড়ে বাংলাদেশেও সর্বভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির স্রোত সবেগে আছড়ে পড়ল।

বৈদিক ধর্ম

বাংলাদেশের নানা জায়গায় ব্রাহ্মণেরা এসে স্থায়ী বাসিন্দা হতে লাগলেন; এঁরা কেউ ঋগ্বেদীয়, কেউ বাজসনেয়ী, শাখাব্যায়ী, যাজুর্বেদীয়, কেউ বা সামবেদীয়। কারও গোত্র কান্ব বা ভার্গব বা কাশ্যপ, কারও ভরদ্বাজ বা অগস্ত্য বা বাৎস্য বা কৌণ্ডিণ্য। মন্দির তৈরি, বিগ্রহের পুজো ইত্যাদির জন্যে, গ্রামে বসবাসের জন্যে ব্রাহ্মণদের জমি দান করা হতে লাগল। এমনি করে ষষ্ঠ শতকে বৈদিক ধর্ম ও সংস্কৃতির ঢেউ বাংলার পূর্বতম প্রান্তে গিয়ে পৌঁছল।

বৈষ্ণব ধর্ম

লোকায়ত জীবনের দিক থেকে এর চেয়েও বেশি তাৎপর্যপূর্ণ ছিল পৌরাণিক ধর্ম ও সংস্কৃতির বিস্তার। চতুর্থ শতকে বাঁকুড়ায় শুশুনিয়া পাহাড়ের গুহায় খোদাই-করা বিষ্ণুচক্র দেখা যায়। পঞ্চম থেকে সপ্তম শতকের বাংলায় নানা মন্দির ও পুজোর ভেতর দিয়ে বিষ্ণুর কয়েকটি রূপের পরিচয় পাওয়া যায়—যেমন: গোবিন্দস্বামী, কোকামুখস্বামী, শ্বেতবরাহ-স্বামী, প্রদ্যুম্নেশ্বর, অনন্ত-নারায়ণ, পুরুষোত্তম। অষ্টম শতক ও তার পরবর্তী বাংলার বিষ্ণুমূর্তি দেখে মনে হয় পৌরাণিক বিষ্ণু গুপ্তপর্বেই বাংলাদেশে এসে তাঁর নিজস্ব মর্যাদায় সপরিবারে সমস্ত লক্ষণ ও চিহ্ন নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছেন। গুপ্তপর্বের রাজামহারাজারা নিজেদের নামের সঙ্গে 'পরম ভাগবত' পদবীটি ব্যবহার করতেন; এ থেকে মনে হয় তাঁরা সবাই ছিলেন ভাগবতধর্মে দীক্ষিত। এই ভাগবতধর্ম গুপ্তপর্বে ও তার পরে বাংলাদেশে প্রচারিত হয়ে পালপর্বে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

বৈষ্ণব ধর্মের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত কৃষ্ণলীলা ও রামায়ণ কাহিনী যে গুপ্ত-পর্বে ও তার পরে লোকায়ত বাঙালী জীবনে প্রসার লাভ করেছিল, পাহাড়-পুরের বিভিন্ন ফলকে তার নমুনা পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণের গোবর্ধনধারণ, চাণুর ও মুষ্টিকের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ, সদ্যোজাত কৃষ্ণকে নিয়ে বাসুদেবের গোকুলে গমন, জোড়া অর্জুন গাছ উপ্‌ড়ে ফেলা, গোপগোপীদের সঙ্গে খেলা—কৃষ্ণের

বাল্যজীবনের অনেক ছবিই তাতে খোদাই করা আছে। তাছাড়া আছে রামায়ণে বর্ণিত বানরসেনাদের সেতুনির্মাণ, বালী আর সুগ্রীবের যুদ্ধ ইত্যাদির ছবি।

বাংলাদেশে সে সময়ে শৈবধর্মের কিন্তু এতটা প্রসার হয়নি। তবে যেটুকু হয়েছিল, তা পুরোপুরি সমৃদ্ধ পৌরাণিক শৈবধর্ম। শুরুতে বস্তুলিঙ্গ ও মুখলিঙ্গ —শিবলিঙ্গের এই দুই রূপের পরিচয়ই বাংলাদেশে পাওয়া যায়। পঞ্চম শতকে উত্তর বাংলার এক দুর্গম প্রান্তে লিঙ্গরূপী শিবের পুজো প্রবর্তিত হতে দেখা যায়। ষষ্ঠ শতকের গোড়ায় মহারাজ বৈন্যগুপ্তের সহায়তায় পূর্ব-বাংলায় শৈবধর্ম ছড়িয়ে পড়েছে। সপ্তম শতকে গৌড়-রাজ শশাঙ্ক ও কামরূপ রাজ ভাস্কর বর্মা দুজনেই ছিলেন পরম শৈব। ষষ্ঠ শতকের সমাচারদেবের রাজ পরিবারও বোধ হয় শৈব ছিল। খড়্গবংশীয় রাজারা বৌদ্ধ হলেও শৈবধর্মের প্রতি তাঁদের টান ছিল। এই শতকেরই ব্রাহ্মণ রাজা লোকনাথও বোধহয় পরম বৈষ্ণব ছিলেন। এতসব রাজা ও রাজবংশ পেছনে থাকায় বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়তে শৈবধর্মের তেমন মুশকিল হয়নি। পাহাড়পুরের মন্দিরের গায়ে চন্দ্রশেখর-শিবের যে প্রতিকৃতি আছে, তাতে তৃতীয় নেত্র, ঊর্ধ্বলিঙ্গ, জটামুকুট, কোন কোনটাতে আবার বৃষবাহন, ত্রিশূল, অক্ষমালা, কমণ্ডলু ইত্যাদি লক্ষণ দেখে মনে হয় এ থেকেই ক্রমশ পাল ও সেন পর্বে পূর্ণতর শিবমূর্তির উদ্ভব হয়েছে।

শৈব ধর্ম

এই পর্বে বাংলাদেশে শৈব গাণপত্য ধর্মের প্রসার দেখা না গেলেও, গণপতি বা গণেশের প্রতিকৃতি এই পর্বে সুপ্রচুর। বসা ও দাঁড়ানো অবস্থায় গণেশের একাধিক মূর্তি পাহাড়পুরে পাওয়া গেছে। শৈব কার্তিকেয়ের কোন মূর্তি-প্রমাণ এই পর্বে পাওয়া যায় না। অষ্টম শতকে শুধু পুণ্ড্রবর্ধনে কার্তিকেয়ের এক মন্দিরের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু গণেশ বা কার্তিকের অথবা পরবর্তী বাংলায় ইন্দ্র, অগ্নি, রেবন্ত, বৃহস্পতি, কুবের, গঙ্গা, যমুনা ইত্যাদি দেবদেবীকে আশ্রয় করে কোন বিশিষ্ট ধর্মসম্প্রদায় বাংলাদেশে কখনও গড়ে ওঠেনি।

বিভিন্ন সূর্যমূর্তি থেকে দেখা যায়, গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর পর্বে বাংলাদেশে উদীচ্যদেশী সৌরধর্ম কিছুটা ঠাঁই পেয়েছিল এবং বিশিষ্ট একটি সৌর-সম্প্রদায়ও গড়ে উঠেছিল। প্রাচীন ভারতে সূর্যমূর্তি ও সূর্যপূজার যে পরিচয় আমরা পাই, তা উদীচ্যদেশী ইরানী ও শক অভিযাত্রীদেরই

সৌরধর্ম

দান। বৈদিক সূর্যধ্যানের সঙ্গে কিংবা লোকায়ত জীবনের সূর্যধ্যান ও ব্রতাচারের সঙ্গে এই সূর্যের কোন যোগ নেই।

গুপ্ত পর্বে কিন্তু জৈনধর্মের উল্লেখ বা মূর্তি-প্রমাণ বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। কেবলমাত্র দেখা যায়, বট-গোহালীতে (পাহাড়পুরের গায়ে বর্তমান গোয়ালভিটা) একটি জৈন বিহার ছিল। অথচ এর মাত্র দেড়শো বছর পরেই য়ুয়ান-চোয়াঙ বলেছেন: বৈশালী, পুণ্ড্রবর্ধন, সমতট ও কলিঙ্গে দিগম্বর নির্গ্রন্থ জৈনেরা সংখ্যায় প্রচুর। সম্ভবত য়ুয়ান-চোয়াঙ যে সময়ের কথা বলেছেন, সে সময়ে আজীবিকেরা নির্গ্রন্থ সম্প্রদায়ের মধ্যে মিশে গিয়ে জৈনদের সংখ্যা বাড়িয়ে তুলেছিলেন, কিংবা হয়ত অশন-বসন-আচার-অনুষ্ঠানের দিক থেকে আজীবিকদের বিশেষ কোন পার্থক্য দেখতে না পেয়ে সবাইকেই নির্গ্রন্থ জৈন বলে ভুল করেছিলেন।

জৈন ধর্ম

গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্ম খুব বেশি না ছড়ালেও তার নামডাক সব থেকে বেশি। চতুর্থ শতকের বোধ হয় কিছু আগে থেকেই দেখা যায় চীনের বৌদ্ধ শ্রমণেরা বাংলাদেশে, বিশেষত উত্তর-বঙ্গে যাতায়াত করছেন। মহারাজ শ্রীগুপ্ত এইসব চীনা শ্রমণদের ব্যবহারের জন্যে উত্তর-বঙ্গে একটি 'চীন মন্দির' তৈরি করিয়ে তার সংরক্ষণের জন্যে চব্বিশটি গ্রাম দান করেছিলেন। পঞ্চম শতকের গোড়ায় চীনের বৌদ্ধ শ্রমণ ফা-হিয়েন বাংলায় এসেছিলেন এবং তাম্রলিপ্তি বন্দরে দু'বছর বৌদ্ধ সূত্র ও প্রতিমাচিত্র নকল করে কাটিয়েছিলেন। সে সময়ে তাম্রলিপ্তিতে বাইশটি বৌদ্ধ বিহারে অসংখ্য ভিক্ষু বাস করতেন। বৌদ্ধ ধর্মের সমৃদ্ধিও কম ছিল না। সে সময়কার কয়েকটি বৌদ্ধ মূর্তিতে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ষষ্ঠ শতকের গোড়াতেই বাংলার পূর্বতম প্রান্ত ত্রিপুরায় মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

বৌদ্ধ ধর্ম

চীনা শ্রমণদের লেখায় সপ্তম শতকের বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্মের অবস্থা সম্বন্ধে প্রচুর তথ্য মেলে। য়ুয়ান-চোয়াং বাংলায় এসেছিলেন আনুমানিক ৬৩৯ খৃষ্টাব্দে। কজঙ্গলে তখন ছ'সাতটি বৌদ্ধ সংঘারাম, তাতে প্রায় ছ'শো ভিক্ষুর বাস। কজঙ্গলের উত্তর অংশে গঙ্গার কাছাকাছি ছিল নানা কারুকার্য-করা ইটপাথরের তৈরি একটি বড় মন্দির—সেখানে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীদের প্রতিমা। পুণ্ড্রবর্ধনের বিশটি বিহারে ছিল তিন সহস্রাধিক মহাযানী হীনযানী ভিক্ষুর বাস। য়ুয়ান-চোয়াঙ দেখেছেন, সমতটের ত্রিশটি

বিহারে দু'হাজার স্থবিরবাদী শ্রমণের বাস। কর্ণসুবর্ণে দশটিরও বেশি বিহারে সম্মতীয় শাখার দু'হাজার শ্রমণ বাস করতেন। সম্মতীয় বৌদ্ধেরা ছিলেন সর্বাস্তিবাদী। তাম্রলিপ্তিতেও দশটির বেশি বিহারের বাসিন্দা ছিলেন এক সহস্রাধিক শ্রমণ। অথচ তার শ' দুয়েক বছর আগে ফা-হিয়েনের সময় তাম্রলিপ্তিতে বিহারের সংখ্যা ছিল বাইশ। য়ুয়ান-চোয়াঙের পঞ্চাশ বছর পর ই-ৎসিঙ যখন তাম্রলিপ্তিতে আসেন, তখন সেখানে বিহারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে মোটে পাঁচ ছ'টি। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের জীবনযাত্রা তখন কঠোর নিয়মে বাঁধা।

৬৪৪ খৃষ্টাব্দে য়ুয়ান-চোয়াঙের ভারত-ত্যাগ ও ৬৭৩ খৃষ্টাব্দে ই-ৎসিঙের ভারত-আগমনের মাঝখানে আরও যে সব চীনা ভ্রমণকারী ভারতে এসেছিলেন, ই-ৎসিঙ তার মধ্যে ছাপ্পান্ন জনের নাম উল্লেখ করেছেন। উল্লিখিতদের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ছিলেন সেঙ-চি। চীনা শ্রমণদের বিবরণ থেকে মনে হয় বাংলাদেশের অন্যত্র যাই হোক, তাম্রলিপ্তিতে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব-প্রতিপত্তি ক্রমশ কমে যাচ্ছিল। কিন্তু মহারাজ বৈন্যগুপ্তের সময় থেকেই সমতটে মহাযান বৌদ্ধধর্মের প্রসার দেখা যায়। য়ুয়ান-চোয়াঙ যে সময়ে এসেছিলেন, তার চেয়ে ই-ৎসিঙের সময়ে সেখানে শ্রমণের সংখ্যা হয়েছিল দ্বিগুণ—দু হাজার থেকে একেবারে চার হাজার। এর পেছনে ছিল মহাযানী বৌদ্ধ খড়্গবংশীয় রাজাদের সক্রিয় সাহায্য। এই খড়্গ-বংশ ছাড়া পঞ্চম-ষষ্ঠ-সপ্তম শতকের বাংলার আর কোন রাজবংশই বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন না।

পাল-চন্দ্র পর্ব

সপ্তম শতকের মাঝামাঝি থেকে অষ্টম শতকের গোড়ার বেশ কিছুদিন ধরে বাংলার রাষ্ট্রক্ষেত্রে গভীর ও জটিল আবর্ত দেখা গিয়েছিল। জায়গায় জায়গায় ছোট ছোট রাজবংশের ক্ষণস্থায়ী রাজত্ব, ভিন্‌প্রদেশী যুদ্ধাভিযান, জয়-পরাজয়, তিব্বত-কাশ্মীর-নেপালের সঙ্গে নতুন যোগাযোগ, মাৎস্যন্যায় ইত্যাদি সব কিছুর চাপে সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও তেমনি আবর্তের সৃষ্টি হয়েছিল। একেকটি ভৌগোলিক চৌহদ্দির মধ্যে যেমন একেকটি স্বাধীন স্বতন্ত্র রাষ্ট্র,

তেমনি স্থানীয় ভাষা ও লিখনভঙ্গি, স্থানীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির সুস্পষ্ট সূচনা দেখা গেল।

য়ুয়ান-চোয়াঙের সময় থেকেই ভারতবর্ষ জুড়ে বৌদ্ধ ধর্মের অবনতি আরম্ভ হয়। বহু বৌদ্ধ স্তুপ, মন্দির ও সংঘারামের তখন ভগ্নদশা, তাতে লোক থাকে না। বৌদ্ধদের অনেকে দেবপূজক ও তীর্থিকদের প্রভাব মেনে নেন। সর্বত্রই ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের দাপট; বাংলায়ও তার ব্যতিক্রম হয়নি। য়ুয়ান-চোয়াঙের সময়েই তো বাংলাদেশে বৌদ্ধদের যেখানে মাত্র সত্তরটি বিহার-সংঘারাম, সেখানে ব্রাহ্মণ্য দেবমন্দিরের সংখ্যা ছিল তিন শো। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় বৌদ্ধধর্ম ও সংঘ টিঁকে থাকতে পারেনি। সুদীর্ঘ তিন-চার শো বছর ধরে একাধিক বৌদ্ধ রাজবংশের সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতার ফলে পূর্ব-ভারত হয় ভারতীয় বৌদ্ধ ধর্মের শেষ আশ্রয়-স্থল। ফলে, নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বৌদ্ধ ধর্মের পরমায়ু আরও চার-পাঁচ শো বছর বেড়ে গেল।

আর্য-ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মূল কথা বৈদিক ধর্ম ও শ্রৌত সংস্কার। পাল-চন্দ্র পর্বে তার প্রাচীন প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ তো ছিলই, বরং পাল-পর্বের শেষের দিকে এবং সেন-বর্মণ পর্বে তার আরও প্রসার ঘটল। পাল-পর্বের যে ব্রাহ্মণদের ভূমি দান করা হয়েছে তাঁরা অনেকেই বেদ-বেদাঙ্গ মীমাংসা-ব্যাকরণে সুপণ্ডিত। তাঁদের পৌরোহিত্যে বৈদিক হোম, যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান হত। বৌদ্ধ চন্দ্র ও কম্বোজ রাষ্ট্রে তার জন্যে ঋত্বিক নামে একজন পৃথক রাজপুরুষ নিযুক্ত হতেন। ভারতবর্ষের নানা জায়গা থেকে এসে বিভিন্ন গোত্র-প্রবরাশ্রয়ী, বিভিন্ন বৈদিক শাখাধ্যায়ী, বিভিন্ন শ্রৌত-সংস্কার-সম্পন্ন যে সব ব্রাহ্মণেরা বাংলাদেশের বাসিন্দা হয়েছিলেন, তাঁদের আশ্রয় করে পঞ্চম-ষষ্ঠ শতক থেকে বাংলাদেশে বৈদিক ধর্মের স্রোত বইতে শুরু করে। পাল-চন্দ্র-কম্বোজ পর্বেও এই সব আগন্তুক ব্রাহ্মণদের চেষ্টায় সেই স্রোত ক্রমে প্রবল হয়ে ওঠে।

বৈদিক

পাল-চন্দ্র-কম্বোজ পর্বের বিভিন্ন লিপিমালায় দেখা যায় ব্রাহ্মণ্য পুরাণ, রামায়ণ-মহাভারতের গল্প, ভাবনাচিন্তা, উপমা-অলঙ্কারের ছাপ। রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ পাঠ বোধ হয় অনেক ব্রাহ্মণই বৃত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন; তাঁদের বলা হত নীতি-পাঠক। এই পর্বে বাংলায় পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মেরই জয়জয়কার। পুরাণের পৃথু,

পৌরাণিক

ধনঞ্জয়, অম্বরীশ, যযাতি, সগর নলের মত বীর, সত্যযুগের দৈত্যরাজ বলি, ত্রেতাযুগের ভার্গব এবং দ্বাপর যুগের কর্ণের মত দাতা, দেবরাজ বৃহস্পতির মত জ্ঞানী—এঁরা সবাই ছিলেন সেকালের উচ্চ সমাজের ও রাষ্ট্রনায়কদের কাছে আদর্শ চরিত্র। অগস্ত্যের এক গণ্ডূষে সমুদ্র পান, পরশুরামের ক্ষত্রিয়াভিযান, রামেশ্বরে রামচন্দ্রের সেতুবন্ধনের কাহিনী, হুতভুজ ও স্বাহার গল্প, ধনপতি ও ভদ্রার কাহিনী, বিষ্ণুর নাভিপদ্ম থেকে ব্রহ্মার জন্মবৃত্তান্ত এই যুগে সুপরিচিত ছিল। এ ছাড়া আরও অনেক পৌরাণিক কাহিনী ও আদর্শ প্রচলিত হয়েছিল। এই পর্বে বিষ্ণু ভাগবদ্ধর্মের বাসুদেব নন, তিনি হলেন কৃষ্ণ; শ্রীপতি, ক্ষমাপতি, জনার্দন, হরি, মুরারী প্রভৃতি তাঁর অনেক নাম। এই নামের প্রত্যেকটির সঙ্গেই কাব্য ও পুরাণ-কাহিনী জড়িত। হরি-ক্ষমাপতি সমুদ্রগর্ভ-জাত; লক্ষ্মী তাঁর সাধ্বী স্ত্রী। লক্ষ্মীর সতীন বসুধরা বা পৃথিবী। এইসব পৌরাণিক দেবদেবীর প্রতিমারূপ আশ্রয় করে নানা ধর্মসম্প্রদায় ও ধর্মানুষ্ঠান গড়ে উঠেছিল।

বৈষ্ণব ধর্ম

পাল-চন্দ্র-কম্বোজ পর্বের বাংলাদেশে যত প্রতিমা পাওয়া গেছে, তার মধ্যে বৈষ্ণব পরিবারের মূর্তিই সবচেয়ে বেশি। পরিবারে প্রধান স্বয়ং বিষ্ণু; তার দুই পত্নী লক্ষ্মী ও সরস্বতী—কোথাও দেবী বসুমতী; নিচে বাহন গরুড়; বিষ্ণুর বৈকুণ্ঠলোকের দুই দ্বারী জয় আর বিজয়; বিষ্ণু-কৃষ্ণের অবতার; এবং স্বয়ং ব্রহ্মা। এই বিরাট পরিবারের প্রত্যেকটি দেবদেবীর বিশেষ বিশেষ ধরণ ও ভঙ্গি, লক্ষণ ও চিহ্ন ভারতের অন্যান্য জায়গার মতই মোটামুটি এক। আসীন, শয়ান ও স্থানক—বিষ্ণুমূর্তির এই তিন ভঙ্গির মধ্যে বাংলায় বেশির ভাগই স্থানক বা দাঁড়ানো ভঙ্গির মূর্তি। সপরিবারে বিষ্ণু দাঁড়িয়ে আছেন; তাঁর ডাইনে-বাঁয়ে ওপরে-নিচে পরিবারের অন্যান্য দেবদেবী, বাহন, প্রহরী ইত্যাদি। অবতাররূপী বিষ্ণুর প্রতিমা এই পর্বের বাংলাদেশে সুপ্রচুর। বিষ্ণুর দশাবতারের প্রতিকৃতি বাংলার নানা জায়গাতেই পাওয়া গেছে। বগুড়ার চতুর্হস্ত লক্ষ্মীপ্রতিমার এক হাতে বাংলাদেশে সুপ্রচলিত লক্ষ্মীর ঝাঁপি লোকায়ত ধর্মেরই একটি ক্ষীণ প্রতিধ্বনি। মহাযান বৌদ্ধধর্ম ও তার দেবায়তন বাংলাদেশে ইতিমধ্যে জাঁকিয়ে বসেছে; ফলে, এই পর্বের কয়েকটি বিষ্ণুমূর্তিতে বৌদ্ধ প্রতিমার রূপকল্পনার ছাপ না পড়ে পারেনি।

বাংলাদেশে শৈবধর্মেরও লিপি ও মূর্তিপ্রমাণ কম নয়। গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর

কালে আর্যাবর্তের পাশুপতধর্মী ব্রাহ্মণ গুরু ও তাঁদের শিষ্যেরা ক্রমাগত বাংলাদেশে আসছিলেন ; তাঁরাই এদেশে পাশুপত ধর্ম প্রচার করছিলেন। পাল-চন্দ্র-কম্বোজ পর্বেও শিবের পুজোরই বেশি প্রচলন ছিল। শিবের অন্যান্য রূপ-কল্পনার প্রতিকৃতি যা পাওয়া গেছে, তার মধ্যে নৃত্যপর, সদাশিব উমা-মহেশ্বর, অর্ধনারীশ্বর, শিব-বিবাহ মূর্তিই প্রধান, নটরাজ-শিবের প্রতিমা বাংলাদেশে সুপ্রচুর। বাংলার নটরাজ-মূর্তি দক্ষিণ-ভারতের নটরাজ-মূর্তির চেয়ে কিছুটা আলাদা। দক্ষিণ-ভারতের সদাশিব-মূর্তির সঙ্গে বাংলার সদাশিব-মূর্তির খুবই মিল দেখা যায়। মনে হয়, উত্তর-ভারতীয় সদাশিব দক্ষিণ-ভারতে যে রূপ গ্রহণ করেছিলেন, কালক্রমে দক্ষিণাগত রাজবংশ ও সৈন্য-সামন্তেরা বাংলাদেশে সেই রূপই প্রবর্তন করেছিলেন। শিবের বৈবাহিক বা কল্যাণ-সুন্দর যে যুগলমূর্তি বাংলাদেশে পাওয়া গেছে, তার সঙ্গে কিন্তু দক্ষিণ-ভারতের সুপরিচিত বৈবাহিক মূর্তির মিল খুব কম। বাংলার এইসব প্রতিমায় একান্তভাবে বাঙালীরই স্থানীয় বিবাহ-আচার ও রীতিগুলি রূপায়িত হয়েছে। বাংলার বাইরেও এই সময়কার বাঙালী শৈবগুরুদের রীতিমত নামডাক ছিল।

শৈবধর্ম

সপ্তম-অষ্টম শতকের আগেই বাংলাদেশের নানা জায়গায় শক্তিপূজা প্রবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। খুব সম্ভব ব্রাহ্মণ্য অন্যান্য ধর্মের সঙ্গে শক্তিধর্মের স্রোতও বাংলাদেশে প্রবাহিত হয়েছিল এবং এদেশে পরে শক্তিধর্মের একটি বড় ঘাঁটি হিসেবে গড়ে উঠেছিল। পাল-পর্বে শক্তিধর্মের অসংখ্য দেবীমূর্তির রূপ-কল্পনা এসেছে আগম ও যামল গ্রন্থে ব্যাখ্যাত শৈবধর্ম থেকে। কিন্তু কোন কোনটাতে তান্ত্রিক ছোঁয়াচ আছে বলেই মনে হয় ; যেমন, জয়পালের গয়ালিপিতে উল্লিখিত মহানীল-সরস্বতী। পরবর্তী কালের সুবিস্তৃত তন্ত্রসাহিত্যের ও তন্ত্রধর্মের মূলে অংশত আছে আগম ও যামল গ্রন্থের ধ্যানধারণা। তন্ত্রসাহিত্যের অধিকাংশ গ্রন্থই লেখা হয়েছে বাংলাদেশে ; এদেশেই তন্ত্রধর্মের পুরোপুরি বিস্তৃত বিকাশ হয়েছে।

শাক্ত ধর্ম

বাংলাদেশে প্রাপ্ত অধিকাংশ দেবীপ্রতিমার পাদপীঠে উৎকীর্ণ রয়েছে একটি গোসাপের মূর্তি ও কোন কোন প্রতিমার দু'পাশে দুটি কলাগাছ। এই দুটি লক্ষণই লোকায়ত ধর্ম থেকে এসেছে। রুদ্র বা উগ্রতন্ত্রের দেবীমূর্তির

মধ্যে মহিষমর্দিনী দুর্গাই প্রধান। দেবীর কোন কোন মূর্তি-কল্পনায় মহাযানী-বজ্রযানী প্রভাব কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না।

আজকাল, এমন কি মধ্যযুগের বাংলাতেও সূর্য-প্রতিমার স্বাধীন স্বতন্ত্র পুজো দেখতে পাওয়া যায় না। অথচ গুপ্ত পর্ব থেকেই উদীচ্যদেশী ইরাণী মতের সূর্যপূজা বাংলাদেশে ক্রমে ছড়িয়ে পড়েছিল। বাংলার নানা জায়গায় পাওয়া অসংখ্য সূর্য-প্রতিমাই তার প্রমাণ। সেন-পর্বে তো এই ধর্ম রাজবংশের পোষকতাই লাভ করেছিল বিশ্বরূপ ও কেশবসেন ছিলেন পরমসৌর। সূর্যদেবকে সব রোগের আরোগ্যকর্তা বলে মনে করা হত বলেই বোধ হয় সূর্যপূজার এত প্রসার হয়েছিল। পালপর্বে সূর্যদেবকে প্রতিমায় সপরিবারে দেখা যায়।

সৌর ধর্ম

পুরাণ-কাহিনী অনুসারে অশ্বারূঢ়, পরিজনসহ মৃগয়াবিহারী রেবন্ত দেবতার সঙ্গে সূর্যের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। রেবন্ত গোড়ায় ছিলেন পশুজীবী শিকারী কোমের লৌকিক দেবতা এবং লোকায়ত জীবনের সঙ্গেই তাঁর সম্বন্ধ। পরে কোন সময়ে ব্রাহ্মণ্য ধর্মে তিনি স্থান পান এবং অশ্বারূঢ় বলে সূর্যের সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তা হয়। বাংলাদেশে পাওয়া অসংখ্য নবগ্রহ প্রতিমাও সৌরধর্মের সঙ্গে যুক্ত।

বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত ও সৌর সম্প্রদায়ের দেবদেবী ছাড়া আরও অনেক রকমের দেবদেবীর প্রতিমা পাওয়া গেছে, যাঁরা কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের ধ্যানধারণার সৃষ্টি নন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এঁরা লোকায়ত ধর্মেরই সৃষ্টি, পরে ক্রমশ এঁরা ব্রাহ্মণ্য ধর্মে স্থান পেয়েছেন।

পালপর্বের বৌদ্ধধর্ম

পাল-চন্দ্র পর্বের প্রত্যেকটি রাজবংশই মহাযানী বৌদ্ধ। অষ্টম থেকে একাদশ শতক পর্যন্ত বাংলায় বৌদ্ধধর্মেরই জয়জয়কার এবং এইসব রাজবংশের সক্রিয় পোষকতায় এই ধর্ম বাংলা-বিহার ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা ও মর্যাদা পায়।

পাল রাজাদের অনেকেই ব্রাহ্মণ্য রাজপরিবারের মেয়ে বিয়ে করেছিলেন। ফলে, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মধ্যে একটা পারস্পরিক সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল। পালবংশের সবাই ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণ্য মূর্তি ও মন্দিরের পরম পৃষ্ঠপোষক

ছিলেন ; এই সবের জন্যেই তাঁরা ভূমি দান করতেন। তাঁদের ক্রিয়াকর্মে ও ধ্যানধারণায় ব্রাহ্মণ্য প্রভাব স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। প্রথম বিগ্রহপাল যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হয়ে ভক্তিভরে শান্তিবারি গ্রহণ করেছেন, জয়পাল তাঁর পিতার মৃত্যুতে শ্রাদ্ধ করেছেন। ধর্মপাল ও তাঁর পরে এক পালরাজা শাস্ত্রশাসন থেকে দূরে সরে-যাওয়া বর্ণগুলিকে নিজের ধর্ম ও বর্ণসীমায় ফিরিয়ে এনে ব্রাহ্মণ্য-সমাজ সংস্কারে মন দিয়েছিলেন। অথচ পাল, চন্দ্র, কম্বোজবংশীয় রাজারা শত শত বছর ধরে একাগ্রচিত্তে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংঘের সেবায় ও প্রভাববিস্তারে অশেষ সাহায্য করেছিলেন, বৌদ্ধ ধর্ম ও ধ্যানধারণাকে দিগ্বিদিকে প্রসারিত করেছিলেন।

বিহার মহাবিহার

বহুখ্যাত বৌদ্ধ বিহার-মহাবিহারগুলি এই পর্বের বৌদ্ধ ধর্ম ও জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ পরিচয়। ধর্মপালের প্রতিষ্ঠিত বিক্রমশীল-মহাবিহারে তিব্বত থেকে অগণিত বৌদ্ধ জ্ঞানপিপাসুরা আসতেন। সোমপুর মহাবিহারে বাস করতেন মহাপণ্ডিতাচার্য বোধিভদ্র। আচার্য অতীশ দীপঙ্করও কিছুকাল এই বিহারে বাস করেছিলেন। পরে বঙ্গাল-সৈন্যেরা এসে সোমপুর অগ্নিদগ্ধ করে। বাংলাদেশে এ ছাড়াও রাঢ় অঞ্চলে, বরেন্দ্রীতে, দিনাজপুরে, বিক্রমপুরে, ত্রিপুরায়, চট্টগ্রামে কয়েকটি প্রসিদ্ধ মহাবিহার ছিল। এ ছাড়াও ছিল কয়েকটি ছোট ছোট বিহার। এইসব মহাবিহারে বসে অগণিত খ্যাত-অখ্যাত আচার্যেরা অক্লান্তভাবে জ্ঞানসাধনা করে গেছেন এবং অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। সেইসব মূলগ্রন্থের খুব কমই পাওয়া গেছে ; যা পাওয়া গেছে, তার অধিকাংশই তিব্বতী অনুবাদ।

রূপান্তর

অষ্টম ও নবম শতকে মহাযান বৌদ্ধধর্মে নতুন তান্ত্রিক ধ্যানধারণার ছোঁয়াচ লাগে ; ফলে, দশম শতক থেকেই বৌদ্ধ ধর্মে গুহ্য সাধনতত্ত্ব, নীতিপদ্ধতি ও পূজাচারের প্রসার দেখা যায়। কিভাবে তা ঘটেছিল বলা কঠিন। তবে এইসব গুহ্য রহস্যময়, গূঢ়ার্থক মন্ত্র, যন্ত্র, ধারণী, বীজ, মণ্ডল প্রভৃতি সমস্তই এসেছিল আদিম কৌমসমাজের জাদু-শক্তিতে বিশ্বাস থেকে। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম চেয়েছিল তাদের নিজেদের গণ্ডী বাড়াতে ; সে জন্যে আদিম কৌমসমাজের লোকদের টেনে আনার দরকার হয়েছিল। এই দুই ধর্মসম্প্রদায়েরই একেবারে নিচের স্তরে আদিবাসী সমাজের জনসাধারণ নিজেদের ধর্মবিশ্বাস, ধ্যানধারণা দেবদেবী নিয়ে ক্রমশ ঢুকে

পড়ছিল। তাছাড়া বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মেরও চেষ্টা ছিল আদিম ধর্মবিশ্বাস, ধ্যানধারণা ও দেবদেবীদের কিছুটা মেজে-ঘষে জাতে উঠিয়ে নেওয়ার। পূর্ব-ভারতের বৌদ্ধধর্মের এই ধরনের রূপান্তর অষ্টম-নবম শতকেই ধরা পড়েছিল।

বাংলা-বিহারে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের এই বিবর্তনের কারণ বোধহয় এই ছিল যে, সপ্তম শতকের মাঝামাঝি থেকে কাশ্মীর, তিব্বত, নেপাল, ভোটান প্রভৃতি দেশের সঙ্গে মধ্য ও পূব ভারতের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ গড়ে ওঠায় এইসব পার্বত্য দেশের আদিম সংস্কার ও সংস্কৃতির স্রোত বাংলাদেশে বইতে শুরু করে। পরে যাকে আমরা তান্ত্রিক ধর্ম বলি, তার একটা দিক এই যোগাযোগের ফল হওয়া অসম্ভব নয়।

বৌদ্ধ জনসাধারণ শূন্যবাদ বা বিজ্ঞানবাদ, যোগাচার বা মধ্যমিকবাদের গভীর পারমার্থিক তত্ত্ব ও সাধনমার্গের বিচিত্র স্তরের কিছুই বুঝত না, বোঝা সহজও ছিল না। তাদের কাছে জাদুশক্তিতে বিশ্বাস, মন্ত্র ও মণ্ডল, ধারণী ও বীজ অনেক বেশি সত্য ও সহজ বলে মনে হল; তখন সেই ক্রমবর্ধমান ধর্ম-সমাজের দিকে তাকিয়ে এক শ্রেণীর বৌদ্ধ আচার্য মহাযানকে নতুনভাবে গড়বার কাজে মন দিলেন; মন্ত্রই হল তাঁদের মূল প্রেরণা; সেই সঙ্গে ক্রমশ এল ধারণী ও বীজ। এঁদের প্রদর্শিত যান বা পথই হল মন্ত্রযান।

মন্ত্রযান

বজ্রযানের ধ্যান-কল্পনা গভীর ও জটিল। বজ্রযানীদের মতে নির্বাণের পর তিন অবস্থা; শূন্য, বিজ্ঞান ও মহাসুখ। নাগার্জুন হলেন শূন্যতত্ত্বের স্রষ্টিকর্তা। তাঁর মতে দুঃখ, কর্ম, কর্মফল, সংসার সবই শূন্য; শূন্যতার এই পরম জ্ঞানেই নির্বাণ। বজ্রযানীরা এই নির্বিকল্প জ্ঞানের নাম দিলেন নিরাত্মা। নিরাত্মাকে দেবীরূপে কল্পনা করা হল; বলা হল, বোধিচিত্ত যখন নিরাত্মার আলিঙ্গনবদ্ধ হয়ে নিরাত্মাতে বিলীন হয়, তখনই উৎপত্তি হয় মহাসুখের। বোধিচিত্ত হচ্ছে মনের একটা বিশেষ বৃত্তি বা অবস্থা, যার মধ্যে জ্ঞান বা বোধিলাভের সঙ্কল্প রয়েছে। এই বোধিচিত্তই বজ্র, কারণ কঠোর যোগসাধনার ফলে ইন্দ্রিয়শক্তি সম্পূর্ণ দমিত হয়ে বজ্রের মত দৃঢ় ও কঠিন হয়। বোধিচিত্তের বজ্রভাব ঘটলে তবে বোধিজ্ঞান লাভ হয়। চিত্তের এই বজ্রভাবকে আশ্রয় করে সাধনার যে পথ, তাকেই বলে বজ্রযান। বজ্রযানের সমস্ত সাধনপদ্ধতিটাই খুব গুহ্য। তার জন্যে গুরু ছাড়া এর

বজ্রযান

সাধনপদ্ধতি অনুসরণ করা চলে না। বজ্রযানে মন্ত্রের মূর্তিরূপের ছড়াছড়ি ; মন্ত্র-মুদ্রা-পূজা-আচার-অনুষ্ঠানেররও শেষ নেই।

এরই সূক্ষ্মতর স্তর সহজযান। সহজযানে দেবদেবীর স্বীকৃতি যেমন নেই, তেমনি নেই মন্ত্র-মুদ্রা-পূজা-আচার-অনুষ্ঠানের বালাই। বাহ্যানুষ্ঠানের কোন মূল্যই তাঁদের কাছে ছিল না। ব্রাহ্মণদের নিন্দা তো তাঁরা করতেনই, যে সব বৌদ্ধ মন্ত্রজপ, পূজার্চনা, কৃচ্ছ্রসাধনা, প্রব্রজ্যা ইত্যাদি করতেন, সহজযানীরা তাঁদেরও ছেড়ে কথা বলতেন না। সহজযানীরা বলতেন, শূন্যতা হল প্রকৃতি ও করুণা হল পুরুষ ; এই দুইয়ের মিলনে বোধিচিত্তের যে পরমানন্দময় অবস্থা হয়, তাই মহাসুখ। এই মহাসুখই ধ্রুবসত্য ; এর উপলব্ধি হলে ইন্দ্রিয়গ্রাম বিলুপ্ত হয়, সংসারজ্ঞান দূরে যায়, আত্মপরভেদ লোপ পায়, সংস্কার বিনষ্ট হয়। চিত্তের এই অবস্থার নামই সহজ অবস্থা।

সহজযান

বজ্রযানেরই একটি সাধনপন্থার নাম কালচক্রযান। কালচক্রযানীদের মতে, শূন্যতা ও কালচক্র এক ও অভিন্ন। ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান বুকে করে কালের চাকা অবিরাম ঘুরছে ; এই কালচক্র সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী ; এই কালচক্রই বুদ্ধের জন্মদাতা। কালচক্রের এই অবিরাম গতিকে নিরস্ত করাই কালচক্রযানীদের উদ্দেশ্য। প্রাণক্রিয়াকে নিরুদ্ধ করতে পারলেই কালচক্রকে নিরস্ত করা সম্ভব। যোগসাধনার বলে দেহের ভেতরকার নাড়ী ও নাড়ী-কেন্দ্রগুলিকে আয়ত্ত করতে পারলেই, পঞ্চবায়ুকে আয়ত্ত করতে পারলেই প্রাণক্রিয়াকে নিরুদ্ধ করা যায় ; তবেই কালচক্র নিরস্ত হয়। কালচক্রযানীদের সাধন-পদ্ধতিতে তিথি, বার, নক্ষত্র, রাশি, যোগ ইত্যাদির বড় স্থান ; এই জন্যেই তাদের মধ্যে গণিত ও জোতির্বিদ্যার খুব চলন ছিল।

কালচক্রযান

বজ্রযান, সহজযান, কালচক্রযান—এদের সকলেরই মূল যোগাচার ও মধ্যমিক দর্শনে। এদের মধ্যে তফাৎ খুবই অল্প। এই তিন যানের উদ্ভব যেখানেই হোক, বাংলাদেশেই তারা বেড়ে উঠেছিল। আসলে এই তিন যানের ইতিহাসই হল পাল-চন্দ্র-কম্বোজ পর্বের বাংলার বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস। যে যোগের ওপর এই তিন যানের নির্ভর, তা হঠযোগ নামে পরিচিত ; এই যোগ মানুষের দেহের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শারীরজ্ঞানের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

মহাযান ধর্মের এই বিবর্তনের যাঁরা পাণ্ডা ছিলেন সমসাময়িক বৌদ্ধ

ঐতিহ্যে তাঁদের বলা হয় সিদ্ধ বা সিদ্ধাচার্য। এঁদের মধ্যে সরহপাদ বা সরহবজ্র, নাগার্জুন, লুইপাদ, তিল্লোপাদ, নাড়োপাদ, শবরপাদ, অদ্বয়বজ্র, কাহ্নুপাদ, ভুসুকু, কুক্কুরীপাদ প্রভৃতি সিদ্ধাচার্যেরাই প্রধান। এঁরা অধিকাংশই বাংলাদেশের লোক। তিল্লোপাদ বা তৈলিকপাদের বাড়ি চট্টগ্রামে, নাড়োপাদের বাড়ি বরেন্দ্রীতে, ভুসুকুর বাড়ি বিক্রমপুরে, কুক্কুরীপাদের বাড়িও বাংলাদেশেই, লুইপাদ, অদ্বয়বজ্র ও শবরপাদও বোধহয় বাঙালী।

সিদ্ধাচার্য

বাংলার ব্রাহ্মণ্য শক্তিধর্মেও এই রকম একটা বিবর্তন দেখা দিচ্ছিল; সেখানেও ক্রমশ শক্তিধর্মের বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান বাদ দিয়ে দেহসর্বস্ব গুহ্য সাধনপন্থাই প্রধান হয়ে উঠল। উভয় ক্ষেত্রেই অবস্থা যখন এক, তখন বৌদ্ধ মহাসুখবাদ ও গুহ্য সাধন-পন্থার সঙ্গে শক্তি বা ব্রাহ্মণ্য তান্ত্রিক মোক্ষ ও গুহ্য সাধনপন্থার বিশেষ কোন পার্থক্য থাকল না; দুইয়ের মিলনও সহজ হয়ে উঠল। পালপর্বের শেষাশেষি থেকে মোটামুটি চতুর্দশ শতকের মধ্যে তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্ম একেবারে তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও শক্তিধর্মের সঙ্গে মিশে গেল।

তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ্য ও শক্তি-ধর্ম এবং নতুন বৌদ্ধধর্মের গুহ্য সাধনপদ্ধতি মিলে গিয়ে শক্তিধর্মের যে নতুন রূপ দেখা গেল, তার মধ্যে প্রধান কৌলধর্ম। পঞ্চকুল হল প্রজ্ঞা বা শক্তির পাঁচটি রূপ, তাঁদের কর্তা পঞ্চতথাগত। এই কুলতত্ত্ব যাঁরা মেনে চলেন, তাঁরাই কৌল বা কুলপুত্র। এঁদের মতে: কুল হলেন শক্তি, কুলের বিপরীত অকুল হলেন শিব এবং দেহের ভেতরে কুণ্ডলাকারে যে শক্তি সুপ্ত, তিনিই কুলকুণ্ডলিনী। এই কুলকুণ্ডলিনীকে জাগিয়ে শিবের সঙ্গে পরিপূর্ণ এক করাই কৌলমার্গীর সাধনা। এঁরা ব্রাহ্মণ্য বর্ণাশ্রম মেনে চলতেন। কিন্তু একই গুহ্য সাধনবাদ থেকে উদ্ভূত হলেও নাথধর্ম, অবধূত ধর্ম ও সহজিয়া ধর্ম বর্ণাশ্রমকে বৌদ্ধ সহজযানীদের মতই একেবারে স্বীকার করতেন না।

কৌলধর্ম

নাথধর্মের প্রতিষ্ঠাতা মৎস্যেন্দ্রনাথ। তিনি চন্দ্রদ্বীপের একজন জেলে। তাঁর রচিত পাঁচখানি গ্রন্থ তিব্বতে পাওয়া গেছে। তাঁর শিষ্য গোরক্ষনাথ ছিলেন রাজা গোপীচন্দ্রের সময়কার লোক। সিদ্ধ গোরক্ষ-নাথের শিষ্যা গোপীচন্দ্রের মা মদনাবতী বা ময়নামতীর যোগশক্তি সম্বন্ধে বাংলাদেশে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। হাড়িপা বা হাড়িপাদ ছিলেন গোরক্ষনাথের শিষ্য। মানুষের যত দুঃখশোক, তার কারণ

নাথধর্ম

এই অপক্ক দেহ ; যোগরূপ অগ্নিতে এই দেহকে পক্ক করে সিদ্ধদেহ বা দিব্যদেহের অধিকারী হয়ে সিদ্ধি বা শিবত্ব বা অমরত্ব লাভ করাই নাথপন্থার উদ্দেশ্য ; উত্তর ও পূর্ববঙ্গে নাথপন্থীদের যথেষ্ট মর্যাদা ও প্রতিপত্তি ছিল। তান্ত্রিক শক্তিধর্মের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এবং অন্যান্য রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কারণে নাথধর্ম ও সম্প্রদায় বেশিদিন টিঁকে থাকতে পারেনি। ক্রমশ ব্রাহ্মণ-সমাজের তলার দিকে নাথ-সম্প্রদায় কোনরকমে নিজেদের স্থান করে নিতে বাধ্য হলেন। নাথযোগীদের জাত হল 'যুগী', বৃত্তি হল কাপড় বোনা এবং নাথপন্থার শেষ চিহ্ন বেঁচে রইল শুধু নামের পদবীতে।

যে তিনটি প্রধান নাড়ীর ওপর সিদ্ধাচার্যদের যোগসাধন প্রক্রিয়ার নির্ভর, তার প্রধানতমটি হল অবধূতী। অবধূত যোগ এই অবধূতী নাড়ীটির গতি-প্রকৃতির নিখুঁত জ্ঞানের ওপর নির্ভর করত। অবধূত-মার্গীরা সবাই কঠোর সন্ন্যাস-জীবন যাপন করতেন। এ বিষয়েও প্রাচীনতম বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের সন্ন্যাসাদর্শের সঙ্গে তাঁদের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। লোকালয় থেকে দূরে বনের মধ্যে গাছের নিচে তাঁরা বাস করতেন। ভিক্ষান্নে জীবন ধারণ করতেন, পরনে থাকত তাঁদের জীর্ণ চীবর। তাঁরা বর্ণাশ্রম, শাস্ত্র, তীর্থ কোন কিছুই মানতেন না ; কোন কিছুতেই তাঁদের আসক্তি ছিল না ; উন্মাদের মত ছিল তাঁদের আচরণ।

অবধূত ধর্ম

বাংলার সহজিয়া ধর্ম সিদ্ধাচার্যদের সহজযান থেকেই এসেছে। মধ্যযুগীয় বাংলার সহজিয়া ধর্মের আদি ও শ্রেষ্ঠ কবি বড়ু চণ্ডীদাস। তাঁর শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বৌদ্ধ সহজযানের মূলসূত্রগুলি স্পষ্ট।

সহজিয়া

বাংলার বাউলরাই বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের ধ্যানকল্পনা ও সাধনপন্থা বাঁচিয়ে রেখেছেন। নাথধর্ম, অবধূতবাদ বিলুপ্ত ; বৈষ্ণব ধর্ম ও চিন্তার পাল্লায় পড়ে সহজিয়াদের ধ্যানধারণাও অনেক বদলেছে। কিন্তু বাউলরা কারো প্রভাবে পড়েননি। বজ্রযানী-সহজয়ানীদের নাড়ী, শক্তি প্রভৃতি বাউল ধর্মে অপরিহার্য। সহজযানীদের মত মহাসুখ এঁদেরও লক্ষ্য।

গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর পর্বের সব বৌদ্ধপ্রতিমাই মহাযান-বজ্রযান স্তরের। তবে সাধারণ বুদ্ধযানী প্রতিমাও কয়েকটি আবিষ্কৃত হয়েছে। বাংলাদেশে যত মহাযানী-বজ্রযানী মূর্তি পাওয়া গেছে, তার মধ্যে অবলোকিতেশ্বর লোকনাথের প্রতিমাই সব চেয়ে বেশি। বৌদ্ধ বাঙালীর তিনিই ছিলেন সব চেয়ে প্রিয় দেবতা। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের

বৌদ্ধ দেবদেবী

এবং সূর্যের রূপগুণ নিয়ে বৌদ্ধ অবলোকিতেশ্বর লোকনাথ, বিচিত্র তাঁর প্রতিমা-রূপ। তার পরেই যে বোধিসত্ত্ব বাঙালীর খুব প্রিয় ছিলেন, তিনি জ্ঞান-বিদ্যা-বুদ্ধি-প্রতিভার দেবতা বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রী। তাঁরও বহুবিচিত্র রূপ। মহাযান-বজ্রযানের আরও যে কয়টি নিম্নস্তরের দেবতা বাংলার জনপ্রিয় ছিলেন, তাঁদের মধ্যে জম্ভল, হেরুক ও হেবজ্রই প্রধান। জম্ভল হলেন ব্রাহ্মণ্য কুবেরের বৌদ্ধ প্রতিরূপ ; দেবীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন তারা। তারার বিভিন্ন রূপ ; তার মধ্যে খদিরবনী-তারা (খয়ের বনের তারা ?), বজ্র-তারা ও ভৃকুটী-তারাই প্রধান। অন্যান্য দেবীমূর্তির মধ্যে মারীচী, পর্ণশবরী, হারীতী ও চুণ্ডাই প্রধান। এইসব দেবদেবীর পুজোর জন্যে অসংখ্য হারীতী মন্দির বাংলার নানা জায়গায় তৈরি হয়েছিল। কিন্তু কোথায় কার মন্দির ছিল, কোন্ মন্দিরে কে পুজো পেতেন, আজ আর তা বলবার উপায় নেই। এইসব মূর্তি ও মন্দির বেশির ভাগই পাওয়া গেছে উত্তর ও পূর্ব বাংলায়, বিশেষ করে রাজশাহী-দিনাজপুর-বগুড়া জেলায় এবং ফরিদপুর-ঢাকা-ত্রিপুরা জেলায়। বাঁকুড়া-বীরভূমের কয়েক জায়গায় ছাড়া গঙ্গার পশ্চিম তীরে কোথাও বজ্রযানী-তন্ত্রের প্রতিমা পাওয়া যায়নি বললেই চলে। সিদ্ধাচার্যদের অধিকাংশই উত্তর ও পূর্ববঙ্গের লোক, বাঁকুড়া-বীরভূমের যে অংশে মহাযান-বজ্রযান সক্রিয়, সেই অংশেই পরে বৈষ্ণব সহজিয়া ও তান্ত্রিক শক্তিধর্মের প্রসার, প্রভাব ও প্রতিপত্তি।

পাল-পূর্বযুগের বৌদ্ধমূর্তি বিশেষ পাওয়া যায়নি। অধিকাংশ মূর্তিই মোটামুটি নবম্ থেকে একাদশ শতকের—এই তিনশো বছরই বাংলায় বৌদ্ধধর্মের স্বর্ণযুগ। ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর সংখ্যা ছিল এই পর্বে বৌদ্ধ প্রতিমার চেয়ে অনেক বেশি। কিন্তু ধর্মগত ধ্যানধারণায় বোধহয় মহাযানী-বজ্রযানী প্রভাবই ছিল সবচেয়ে জোরালো। তার কারণ, মহাযান-বজ্রযানের সাধনদর্শন। এই সাধনদর্শন সেই সময়ে ও তারপরে ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল।

জৈনধর্ম

য়ুয়ান-চোয়াঙের লেখায় যে সময়কার খবরাখবর পাওয়া যায়, জৈনধর্ম সম্পর্কে তার পরেকার কোন পুঁথি বা লিপি পাওয়া যায় না। বাংলাদেশে তার পরেও যে জৈনধর্ম টিঁকে ছিল—সুন্দরবন, বাঁকুড়া, দিনাজপুরে আবিষ্কৃত পালপর্বের একাধিক জৈনমূর্তি থেকে তা প্রমাণ হয়। ত্রয়োদশ শতকের গোড়ার দিকে চালুক্যরাজ বীরধবলের মন্ত্রী বস্তুপাল যখন জৈন তীর্থগুলি দেখতে বেরিয়েছিলেন, তাঁর সঙ্গে ছিলেন লাট,

গৌড়, মরু, ধারা, অবন্তি এবং বঙ্গের সংঘপতিরা। এ থেকে বোঝা যায়, ত্রয়োদশ শতকেও বাংলায় জৈন বা নিগ্রন্থ সংঘের রীতিমত অস্তিত্ব ছিল। তবে পালপর্ব শুরু হওয়ার পর থেকে জৈনধর্মের প্রভাব কমে আসছিল; কমসংখ্যক মূর্তিই তার প্রমাণ।

একাদশ-দ্বাদশ শতকের সহজযানী গীত ও দোহায় অন্য ধর্মমতের কিছু কিছু উল্লেখ পাওয়া যায়। সহজযানীরা ছিলেন বেদ-বিরোধী; ব্রাহ্মণ, মহাযানী, জৈন-সন্ন্যাসী কাউকেই তাঁরা সুনজরে দেখতেন না। সমসাময়িক কাপালিকদের সঙ্গে তাঁদের আত্মিক যোগ ছিল। কাপালী যোগীরা ছিলেন গায়ে ছাই-মাখা দিগম্বর। তাঁরা হাড়ের মালা পরতেন। বীরনাদে ডমরু বাজিয়ে একা একা ঘুরে বেড়াতেন, পায়ে বাঁধতেন ঘণ্টা-নূপুর, কানে পরতেন কুণ্ডল। আত্মীয়-পরিবারের মায়া কাটিয়ে কাপালী যোগী হতে স্ত্রী-পুরুষ কারো কোন বাধা ছিল না। এই যুগের আরেক শ্রেণীর সাধক রসসিদ্ধ যোগী। মৃত্যুর পর মুক্তিতে তাঁদের বিশ্বাস ছিল না; তাঁরা ছিলেন জীবন্মুক্তির সাধক। রস-রসায়নের সাহায্যে স্থূল জড়দেহকেই সিদ্ধদেহ এবং সিদ্ধদেহকে দিব্যদেহে রূপান্তরিত করা সম্ভব, তবেই শিবত্ব লাভ ঘটে—এই ছিল তাঁদের বিশ্বাস। পরবর্তী নাথসিদ্ধ যোগী সম্প্রদায়েরই এঁরা প্রাচীনতর রূপ। সহজযানীরা এঁদের পছন্দ করতেন না, সাধারণ যোগী-সন্ন্যাসীদের সম্পর্কেও ছিল তাঁদের ঘোরতর অবজ্ঞা।

সহজযানের আদর্শ হল—সহজ সমরস বা সাম্য ভাবনা, আকাশের মত শূন্য চিত্ত। বেদ, আগম, পুরাণ, পূজা, তীর্থ, আশ্রম সবই নিষ্ফল। ধ্যানের মধ্যে মোক্ষ নেই, সহজ ছাড়া নির্বাণ নেই, কায়াসাধনই একমাত্র পথ। শরীরের মধ্যেই অশরীরীর গুপ্তলীলা। ঘরেও থেকো না, বনেও থেকো না। শূন্য নিরঞ্জনই পরম মহাসুখ—সেখানে পাপও নেই, পুণ্যও নেই। সহজযানীরা বৈরাগ্যের সাধক নন; তাঁদের মতে, বিরাগের চেয়ে পাপ আর কিছু নেই, সুখের চেয়ে বড় পুণ্য আর কিছু নেই।

ভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে, গীত ও দোহা মারফৎ প্রচারের দিক থেকে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস এবং কবীর, দাদু, তুলসীদাস, সুরদাস, মীরাবাঈ প্রভৃতি মধ্যযুগের বাংলা ও উত্তর-ভারতের মানবধর্মী মরমীয়া সাধক-কবিদের সঙ্গে এই প্রাচীন সহজযানী সাধক-কবিদের অনেক মিল দেখা

সেন-বর্মণ-দেবপর্ব

পাল-পর্বে এবং তার ঠিক আগে বাংলার সমস্ত রাজবংশই ছিল বৌদ্ধ; কিন্তু পরের যুগে সেন-বর্মণ-দেববংশের রাজারা সবাই ব্রাহ্মণ্যধর্মে বিশ্বাসী। সেন-পর্বের এই দেড়শো বছরে বাংলাদেশ জুড়ে ব্রাহ্মণ্য ধর্মেরই জয়জয়কার। জৈনধর্মের কোন চিহ্ন নেই। বজ্রযানী-সহজযানী-কালচক্রযানী বৌদ্ধেরা নিষ্প্রভ। বৌদ্ধ দেব-দেবীর মূর্তি বিরল। বৌদ্ধ বিহার থাকলেও তাদের সেই অতীত গৌরব ও সমৃদ্ধি আর নেই। অন্যদিকে তেমনি এই যুগে বৈদিক যাগযজ্ঞে পৌরাণিক দেবদেবী আর বিশেষ বিশেষ তিথিনক্ষত্রে স্নান-দান-ধ্যান ক্রিয়াকর্ম, মধ্যদেশ থেকে ব্রাহ্মণাভিযান, রাষ্ট্রে ও সমাজে ব্রাহ্মণাধিপত্য বেড়ে চলেছে। এর সূচনা অবশ্য পাল পর্বের শেষের দিকেই দেখা যাচ্ছিল।

বর্মণ-বংশের রাজারা ছিলেন সবাই পরম বিষ্ণুভক্ত। এঁদের বংশ-বৃত্তান্তে বৈদিক ও পৌরাণিক নামের ছড়াছড়ি। সেন-রাষ্ট্রে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম সবিস্তারে ছড়িয়ে পড়ল; বাংলার স্মৃতি ও ব্যবহার-শাসন এই সময়কারই সৃষ্টি। দেববংশের রাজারাও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কারে বিশ্বাসী; তাঁরা সবাই বিষ্ণুভক্ত। এই তিন রাজবংশের সচেতন চেষ্টাই ছিল বৈদিক ও পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে বাংলায় একচ্ছত্র মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করা। তার জন্যে এইসব রাজ-বংশের রাজারা মধ্যদেশ থেকে ব্রাহ্মণদের আনিয়ে তাদের জমি দান করেছিলেন, ব্রাহ্মণ্য মতে যাগযজ্ঞ-স্নান-তর্পণ-পুজোআর্চার ব্যবস্থা করেছিলেন।

উপনিষদের আশ্রম-তপোবন ছিল এ যুগের আদর্শ। সেন-বংশের আদিপুরুষ সামন্তসেন শেষ বয়সে বানপ্রস্থ নিয়ে গঙ্গাতীরের এক আশ্রমে ছিলেন। এই সমস্ত আশ্রম-তপোবনে থাকতেন ঋষি-সন্ন্যাসীরা,

বৈদিক

যাগযজ্ঞের ঘৃতাহুতি আর ধূপের ধোঁয়ার সুগন্ধে সেখানকার আকাশবাতাস ভরে থাকত। বেদের ব্যাপক চর্চা ছিল; বৈদিক যাগযজ্ঞ ক্রিয়াকর্মের ব্যাপক প্রভাব ছিল। রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণেরা বৈদিক যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠানের রীতিপদ্ধতি জানতেন না বলে বাইরে থেকে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনাবার একটা সচেতন চেষ্টা ছিল বলে মনে হয়। সেন-বর্মণ আমলেই বাংলায় বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণের উদ্ভব দেখা যায়। এই পর্বেই বাংলার ব্রাহ্মণ্য জীবন সর্বভারতীয় শ্রুতি ও স্মৃতির বন্ধনে বাঁধা পড়ল।

জাতকর্ম, নিষ্ক্রমণ, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন, সমাবর্তন, বিবাহ, গৃহপ্রবেশ ইত্যাদি শ্রুতি-স্মৃতির সংস্কার এইভাবে বাঙালী ব্রাহ্মণ্য-সমাজে ছড়িয়েছে। এইসব সংস্কার দেশের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার কাজে ব্রাহ্মণেরা সরাসরি রাষ্ট্রের সাহায্য পেয়েছিলেন।

পালপর্বে যে পৌরাণিক ধর্ম ও সংস্কারের বিস্তার-দেখা যায়, সেনপর্বে তা আরও প্রসারিত হয়েছে। পুরাণের নানা কাহিনী এই পর্বে সুপ্রচলিত ছিল। সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ, উত্থানদ্বাদশী তিথি, উত্তরায়ণ-সংক্রান্তি

পৌরাণিক

ইত্যাদি উপলক্ষে স্নান, তর্পণ ও পূজা, ভূমিদানের ফলাকাঙ্ক্ষা, । দূর্বাতৃণ জলসিক্ত করে দান সমাপন, নীতিপাঠের অনুষ্ঠান ইত্যাদি পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ক্রিয়াকর্ম এই পর্বে ব্যাপকভাবে দেখা যায়। সুখরাত্রি ব্রত, শক্রোত্থান পূজা, হোলাক উৎসব, পাষাণ-চতুর্দশী, দ্যুত-প্রতিপদ, কোজাগর-পূর্ণিমা, ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া, আকাশ-প্রদীপ, দীপান্বিতা, জন্মাষ্টমী, অশোকাষ্টমী অক্ষয়-তৃতীয়া, অগস্ত্যার্ঘ্য, মাঘীসপ্তমী-স্নান ইত্যাদি পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মানুমোদিত ক্রিয়াকর্মেরও অনেক উল্লেখ দেখা যায়।

সেন-বর্মণ পর্বের বাংলাদেশ বৈষ্ণবধর্মের ইতিহাসকে দুটি দিকে সমৃদ্ধ করেছে। একটি হল বিষ্ণুর দশাবতারের বিধিবদ্ধ সমন্বিত রূপ; অন্যটি হল রাধা-কৃষ্ণের ধ্যান ও রূপ-কল্পনা। মধ্যযুগে ও আজকের ভারতবর্ষে

বৈষ্ণব

বিষ্ণুর যে দশাবতারের ঐতিহ্য সকলের কাছে পরিচিত, সেই দশাবতারের প্রথম বিধিবদ্ধ সমন্বিত রূপের সন্ধান পাওয়া যায় এই যুগের কবি জয়দেবের গীতে। রাধা-কৃষ্ণের ধ্যানধারণাও প্রথম এই যুগেই বাংলাদেশে দেখা যায়। জয়দেবের গীতগোবিন্দে তা খুবই স্পষ্ট। সেন-পর্বের কোন সময়ে বোধহয় কৃষ্ণের গোপিনীর মধ্যে একজনকে রাধা বলে কল্পনা করা হয়; তার পেছনে ছিল বোধহয় শক্তিধর্মের ক্রমবর্ধমান প্রভাব। সাধারণভাবে বলতে গেলে বৈষ্ণবের কৃষ্ণ হলেন শাক্তের শিব, সাংখ্যের পুরুষ; আরও ঢালাওভাবে বললে কৃষ্ণকে বলা যায় বজ্রযানীর বোধিচিত্ত, সহজযানীর করুণা, কালচক্রযানীর কালচক্র। আর রাধা হলেন শাক্তের শক্তি, সাংখ্যের প্রকৃতি; আরও ঢালাওভাবে বললে বলা যায়, রাধা হলেন বজ্রযানীর নিরাত্মা, সহজযানীর শূন্যতা, কালচক্রযানীর প্রজ্ঞা। বৈষ্ণবধর্মে এইভাবে সমসাময়িক কালের চেতনার ছোঁয়াচ লাগা মোটেই অসম্ভব নয়।

সেনবংশের কুলদেবতা ছিলেন সদাশিব। শিবের এই রূপকল্পনা সম্ভবত

দক্ষিণ-ভারত থেকে বাংলাদেশে এসেছে। নৃত্যরত শিবের যে পৃথক দুটি রূপের প্রতিমা বাংলাদেশে পাওয়া গেছে, তার একটি নিঃসন্দেহে এই পর্বের সৃষ্টি এবং তাতে দক্ষিণ-ভারতের প্রভাব আছে। শিবের উমা-মহেশ্বরের মূর্তিও এই পর্বে প্রচুর দেখতে পাওয়া যায়। শক্তিপ্রতিমার মধ্যে এই পর্বের কয়েকটি প্রতিমা উল্লেখযোগ্য। উত্তরবঙ্গে প্রাপ্ত একটি চতুর্ভুজ দেবীপ্রতিমার এক হাতে পদ্ম এক হাতে দর্পণ; ডাইনে গণেশ, বাঁয়ে পদ্মকলি হাতে এক নারী; প্রতিমার পাটায় গোসাপের প্রতিকৃতি। তাছাড়া বিভিন্ন প্রতিমায় দেবীর ভুবনেশ্বরী, মহিষমর্দিনী, উগ্রতারা, চামুণ্ডা রূপ। সেন-বর্মন লিপিমালায় তন্ত্রোক্ত শিব-শক্তি ধ্যান-কল্পনার বা আগমান্ত শৈব শাক্ত ধর্মের পরিচয় কিছু নেই। তবে সেই যুগে আগম ও তন্ত্রশাস্ত্র চর্চার কিছু কিছু উল্লেখ আছে। বৌদ্ধ বজ্রযানী সহজযানী কালচক্রযানী সাধনার মতই তন্ত্রোক্ত বামাসাধনা একান্ত গুহ্য ব্যক্তিগত সাধনা। সেই জন্যেই লিপিমালায় তার উল্লেখ বা ব্রাহ্মণ্য প্রতিমায় তার কোন মূর্তি-প্রমাণ না থাকা অসম্ভব নয়।

শৈব ও শাক্ত

বাংলাদেশে গাণপত্য ধর্ম ও সম্প্রদায় বিস্তার লাভ করেছে, এমন কোন প্রমাণ আজও পাওয়া যায়নি। তবে ঢাকা জেলায় মুন্সীগঞ্জে একটি পঞ্চমুখ, দশভুজ গণেশমূর্তির পুজো হয়; এই গণেশের বাহন একটি গর্জমান সিংহ। মূর্তিটি দক্ষিণ-ভারতীয় ছাঁচে গড়া। রামপালের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে মূর্তিটি পাওয়া গেছে। একটি ছাড়া কার্তিকেয়ের আর কোন স্বতন্ত্র মূর্তি পাওয়া যায়নি। এই মূর্তিতে ময়ূর তাঁর বাহন; দু'পাশে তাঁর দুই স্ত্রী—দেবসেনা ও বল্লী।

শাকদ্বীপী মগ ব্রাহ্মণেরাই সূর্য-প্রতিমা ও সূর্য-পুজা ভারতবর্ষে প্রবর্তন করেছিলেন। ক্রমে তা পূর্ব-ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে। বিশ্বরূপসেন ও কেশবসেন দুজনেই ছিলেন সূর্যভক্ত পরমসৌর। সেন পর্বে সূর্যদেবের পুজো কিছুটা প্রসার লাভ করেছিল। বাংলায় একাধিক সূর্য-প্রতিমা পাওয়া গেছে। তার মধ্যে রাজশাহীতে প্রাপ্ত একটি প্রতিমায় সূর্যদেবের দশটি হাত, তিনটি মুখ। তিনটি মুখের দু'পাশের দুটি উগ্র; দশটি হাতের মধ্যে আটটিতে পদ্ম, শক্তি, খটবাঙ্গ, নীলোৎপল এবং ডমরু। এই সূর্যমূর্তিকে বলা হয় মার্তণ্ড-ভৈরব। উদীচ্যবেশী সূর্যপ্রতিমা ও তার পুজো বোধ হয় সেন-বর্মণ পর্বের পর আর

সৌরধর্ম

বেশিদিন চলেনি। পদ্মের ওপর দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে চতুর্ভুজ সূর্যদেবের একটি স্থানক মূর্তি পাওয়া যায়। তাতে তাঁর দু'পাশে দুই স্ত্রী—ঊষা আর প্রত্যুষা ; পায়ের কাছে সামনেই অরুণ-সারথি। এই মূর্তির সঙ্গে সপরিবারে বিষ্ণুর চতুর্ভুজ স্থানক মূর্তির খুবই মিল দেখা যায়। বিষ্ণুর সঙ্গে সূর্যের একটা সুপ্রাচীন বৈদিক সম্পর্ক ছিল ; সেই সুবাদেই বাংলাদেশে বিষ্ণু বোধ হয় সূর্যকে গ্রাস করে ফেলেছিলেন।

সেন-বর্মণ পর্বে বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্ম ও দেবদেবীর প্রভাব ক্রমেই কমে আসছিল। বিহার, মহাবিহার এবং আচার্যদের আগেকার সে প্রতিপত্তি আর ছিল না। এমন কি সাড়ে তিন শো বছর ধরে যে উত্তর ও পূর্ববঙ্গে বৌদ্ধ ধর্ম এতখানি প্রসার লাভ করেছিল, সেখানেও দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকের বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তি খুঁজলে খুব কমই পাওয়া যায়। সেন-বর্মণ রাজবংশ বৌদ্ধ ধর্ম ও সংঘের প্রতি মোটেই শ্রদ্ধা পোষণ করতেন না ; বরং তাঁদের বিরাগ ও ভর্ৎসনায় বৌদ্ধদের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। বেদবিরোধী বৌদ্ধদের পাষণ্ড নাম দেওয়া হল।

বৌদ্ধ ধর্মের পরিণতি

বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের এই দ্বন্দ্ব-সংঘাত অনেক দিনের। ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মনায়কদের তর্কবিতর্কের ইতিহাসই প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ন্যায়শাস্ত্রের ইতিহাস—এক কথায়, ভারতীয় ধ্যানধারণার ইতিহাস। বাংলাদেশেও তার কিছু কিছু প্রমাণ আছে। এক ধর্মের লোক অন্য ধর্মকে যখন আঘাত করতেন, তখন সব ক্ষেত্রে সৌজন্য বা শালীনতা মেনে চলা হত এমন নয় ; তর্কের হার মানেই লজ্জা ও অপমানের একশেষ এবং প্রতিপক্ষের ধর্মমতে দীক্ষিত হওয়া। সহজযানী সরহপাদ মহাযানী শ্রমণদের কঠোর ভাষায় আক্রমণ করে বলেছেন যে, তারা চেলাচামুণ্ডাদের ঠকিয়ে খায় ; দিগম্বর জৈনদের বিদ্রূপ করে বলেছেন, কাপড় না পরলেই যদি সিদ্ধ হওয়া যেত, তাহলে কুকুর-শেয়ালরাও সিদ্ধিলাভের অধিকারী হত। ব্রাহ্মণেরা বৌদ্ধদের বলেছেন 'পাষণ্ড' : বজ্রযানী দেবদেবীদের এক ধরনের মূর্তিকল্পনার মধ্যেও এই সংঘর্ষের প্রমাণ আছে। বজ্রযানী দেবতা প্রসন্নতারা, বজ্রজ্বালানলার্ক, বিদ্যুজ্জ্বালাকরালীর সাধনমন্ত্রে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ইন্দ্রকে বলা হয়েছে মার। দশভুজা মারীচীর পায়ের নিচে শিব লাঞ্ছিত হচ্ছেন। অপরাজিতার মাথায় ইন্দ্রকে ছাতা ধরতে হয়েছে, পরমেশ্বর ইন্দ্রাণী অপদস্থ

হচ্ছেন। অবশ্য বাংলাদেশের প্রতিমায় দেবদেবীর এই লাঞ্ছনা ও অসম্মান বড় একটা দেখা যায় না।

যত কিছু ধর্মের সংঘাত, সমাজে তা ওপরের দিকেই বেশি দেখা গেছে। বিভিন্ন ধর্মের সাধারণ লোকের মধ্যে বরং মিলন আর সমন্বয়ের ভাবটাই বেশি করে ফুটে উঠেছে। পাল-চন্দ্র পর্ব থেকেই বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীদের রূপ-কল্পনায় তার ছাপ পড়েছিল। বৌদ্ধ দেবায়তনে যেমন ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীরা, তেমনি ব্রাহ্মণ্য দেবায়তনে বৌদ্ধ দেবদেবীরা স্থান পাচ্ছিলেন। এমনি করে বৌদ্ধ আয়তনে এসেছে ব্রাহ্মণ্য সরস্বতী, বিঘ্ননাটক প্রভৃতি ; দুই আয়তনেই স্থান পেয়েছে চর্চিকা আর মহাকাল। যোগাসন, লোকেশ্বর-বিষ্ণু, ধ্যানী শিব আসলে ধ্যানী বুদ্ধেরই ছাঁচে গড়া। বৌদ্ধ তারাদেবী তো ব্রাহ্মণ্য দেবায়তনে কালী আর দুর্গারই নামান্তর।

এই মিল-সমন্বয় সত্ত্বেও বৌদ্ধ ধর্ম ও তার দেবায়তন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের কুক্ষিগত হয়ে পড়ছিল। নালন্দার বৌদ্ধ বিহার-মন্দিরে দেখা যায় শিব, বিষ্ণু, পার্বতী, গণেশ, মনসা বৌদ্ধ দেবদেবীদের পাশাপাশি পুজো পাচ্ছেন। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের লোকবল চিরকালই বেশি ; তাছাড়া নিজের মধ্যে গ্রহণ করে নেবার শক্তিও তার বৌদ্ধ ধর্মের চেয়ে বরাবর বেশি। তার সঙ্গে ছিল সেন-বর্মণ রাজাদের একদিকে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতি অনুরাগ ও দাক্ষিণ্য, অন্য দিকে বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি বিরাগ ও তাচ্ছিল্য। সংঘে-বিহারে সিদ্ধাচার্য ও তাদের ভক্ত শিষ্যদের সাধনপদ্ধতি ক্রমশ গূঢ় থেকে গূঢ়তর হওয়ায়, দেহবাদী কায়াসাধনার ক্রমেই অধঃপতন হওয়ায়, তাছাড়া পূজা-প্রতিমা অনুষ্ঠানের দিক থেকে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বাহ্য ব্যবধান ঘুচে যাওয়ায়—লোকের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি আকর্ষণ কমে এসেছিল। বাংলাদেশে আজও তার প্রমাণ পাওয়া যায়। মেয়েরা মাটির তৈরি যে শিবলিঙ্গের পুজো করে থাকেন, তার মাথায় মাটির একটা গুলি দেওয়া হয়, তার নাম বজ্র। বেলপাতা দিয়ে তা সরিয়ে দিলে তবে তিনি শিবে পরিণত হয়ে পুজোর যোগ্য হন।

তা সত্ত্বেও কিন্তু বুদ্ধদেবের প্রতি ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অনুরাগ ও প্রীতি দিন দিন বেড়ে যেতে লাগল। বুদ্ধদেব বিষ্ণুর অন্যতম অবতার বলে আগেই স্বীকৃত হয়ে গিয়েছিলেন ; এই স্বীকৃতি ক্রমশ ভক্তি-ভালবাসায় পরিণত হতে দেরি হয়নি। বেদবিরোধী যজ্ঞবিরোধী বুদ্ধদেব অনায়াসে ব্রাহ্মণ্য-ধ্যানের মধ্যে মিশে গেলেন। বৌদ্ধধর্মের তন্ত্রমার্গী সাধনা ক্রমে ব্রাহ্মণ্য তন্ত্রমার্গী সাধনার সঙ্গে

মিশে গিয়ে একাকার হল। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য প্রতিমার রূপ-কল্পনার পার্থক্যও ক্রমে ঘুচে গেল। লোকায়ত সমাজে বৌদ্ধধর্ম আস্তে আস্তে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের কুক্ষিগত হতে দেরি হল না। বৌদ্ধ বিহারে সংঘারামে এর পরও যে যতিগোষ্ঠী অবশিষ্ট ছিল, তুর্কী আক্রমণের মুখে তাও ধুয়ে মুছে গেল।

সেন-বর্মণ পর্বে বৌদ্ধধর্মের প্রতি ব্রাহ্মণ্য ধর্মের যত বিদ্বেষই থাকুক, ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে কিন্তু যথেষ্ট বনিবনা ছিল। সাম্প্রদায়িক ধর্মের এই পারস্পরিক প্রীতির সম্পর্ক ব্রাহ্মণ্য সমাজের একটি বৈশিষ্ট্য। শাক্ত কিংবা বৈষ্ণব হওয়া সত্ত্বেও পরিবারে পরিবারে কোন বিদ্বেষ নেই। একই পরিবারে কেউ শাক্ত, কেউ বৈষ্ণব, কেউ তারার আরাধনা করেন, কেউ করেন শিবের—তাতে কোনই বাধা নেই। ব্রাহ্মণ্য বাঙালী আজও সমান উৎসাহে বিষ্ণু ও শিব, লক্ষ্মী ও সরস্বতী, সূর্য ও কার্তিকের পুজো করে থাকে। সেন-বর্মণ আমলেও অনেকটা আজকের মতই এই সব স্মার্ত, পৌরাণিক দেবদেবীদের পাশাপাশি নানা লৌকিক ব্রত, অস্মার্ত অপৌরাণিক নানা লৌকিক দেবদেবীর পুজো সমানভাবে প্রচলিত ছিল।

স্মৃতিচিহ্ন

বৌদ্ধধর্মের স্মৃতি আজও আমাদের সমাজের আড়ালে-আবডালে স্থান-নাম ও লোক-নাম হয়ে বেঁচে আছে। 'বুদ্ধ' চলিত বাংলায় 'বুদ্ধু' হয়েছে এবং 'বুদ্ধু' বলতে আমরা বুঝি বোকা বা মূর্খ লোক। এই 'বুদ্ধুই' রূপ-কথায় হয়েছে 'বুদ্ধুভুতুম'। 'সংঘ' হয়েছে বাংলায় 'সাঙ্গাত' বা হিন্দীতে 'সংঘত' (ঘনিষ্ঠ বন্ধু)। প্রাচীন বৌদ্ধ ধর্মরথ, পঞ্চস্তুপী, বজ্রাসন, নবাসন, উপকারিকা হয়েছে যথাক্রমে ধামরাই (ঢাকা জেলা), পাঁচথুপী, বাজাসন, নবাসন, উয়ারি। ফার্সী বার শব্দের অর্থ দেশ, দেয়াল, মণ্ডপ ; উয়ারি বা উপকারিকার সঙ্গে যুক্ত হয়ে 'বারোয়ারি' শব্দটি পরে এসেছে। নেড়ানেড়ী কথাটিও মুসলমান আমলে বাংলায় প্রথমত বৌদ্ধ ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদেরই বোঝাত। বাঙালীর পালিত, ধর, রক্ষিত, কর, ভূতি, গুঁই, দাম বা দাঁ, পান বা পাইন প্রভৃতি অন্ত্যনামও বোধ হয় বৌদ্ধ স্মৃতি বহন করছে।

আদি পর্বের শেষ অধ্যায়ে সর্বত্র স্মার্ত ও পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের

অপ্রতিহত একচ্ছত্র প্রভাব। বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব অবলুপ্তপ্রায়। যেটুকু আছে, তা ছোট ছোট গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। জ্যোতিষ-আগম-নিগম-তন্ত্রের ধ্যানধারণাই এই যুগ ছেয়ে রেখেছে। কিন্তু সাধারণ লোকের মধ্যে লোকায়ত ধর্ম তখনও অবিকল। একদিকে তীর্থ-নক্ষত্র দেখে স্নানাহার, দানপুণ্য, ব্রতাচরণ, তীর্থযাত্রা ইত্যাদি ; অন্যদিকে তার পাশাপাশি সমান তালে চলেছে আদিম ভয়-বিশ্বাসের লৌকিক দেবদেবীর পুজো, প্রতীকের পুজো, লৌকিক ব্রতোৎসব, পার্বণ, নানা রকমের যাত্রা-উৎসব ইত্যাদি।

জ্ঞানবিজ্ঞান : শিল্পসাহিত্য

ভাষা

আর্যভাষাভাষী বৈদিক ঋষিরা ছিলেন যেন সেকালের সাহেব। আমাদের উচ্চারণ শুনে সাহেবসুবোরা যেমন অনেক সময় হাসাহাসি করে থাকে, প্রাচ্যদেশের লোকদের ভাষা শুনে তার চেয়েও সাংঘাতিক ঠাট্টা করতেন সেকালের ঋষিরা। প্রাচ্যদেশের লোকদের তাঁরা 'অচ্ছুৎ,' 'খুনেডাকাত' এসব তো বলেছেনই, এমন কি 'অসুর' বলতেও বাধেনি। পূর্ব-ভারতের লোকদের মুখের ভাষা তাঁদের অনভ্যস্ত কানে খুবই খটোমটো ঠেকত, তাতে নাকি একটুও রসকষ কিংবা সুরের বালাই ছিল না।

আর্যপূর্ব

পূর্ব-ভারতের লোক বলে বাঙালীর গায়েও এই বদনাম এসে লেগেছে। পূর্ব-ভারতের অন্যান্য জায়গার মত বাংলাদেশেরও সব চেয়ে পুরনো ভাষা ছিল অস্ট্রিক-গোষ্ঠীর ভাষা। মন্‌খ্‌মের ভাষা-পরিবারের সঙ্গে তার খুব নিকট সম্বন্ধ ; কোল-মুণ্ডা ভাষা-পরিবারের সঙ্গেও তার কিছুটা আত্মীয়তা ছিল। এই মুণ্ডা-মন্‌খ্‌মের ভাষার ওপর কিছুটা নতুন পলি ফেলেছিল দ্রবিড় ভাষা-পরিবারের স্রোত—বিশেষ করে পশ্চিম আর মধ্য বাংলায়। পূর্ব ও উত্তর বাংলায় দ্রবিড় ভাষার প্রভাব তেমন ছড়ায়নি ; সেখানে মুণ্ডা-মন্‌খ্‌মের ভাষার ওপর আরেকটি তৃতীয় ঢেউ এসে লেগেছিল ; সে ঢেউ হল ভোট-ব্রহ্ম ভাষার —যে ভাষা প্রাচীন কিরাতদের।

বাংলাদেশে আর্যভাষা আমদানি হবার বহু আগে থেকে, খৃষ্টজন্মের শত শত বছর আগে থেকে এমনিভাবে নানা নরগোষ্ঠীকে আশ্রয় করে নানা ভাষার জটিল সংমিশ্রণ শুরু হয়েছিল। কিন্তু গৃহবদ্ধ, পরিবারবদ্ধ সমাজবদ্ধ হলেও সেকালের আদিবাসীদের লিপিবদ্ধ কোন ভাষা ছিল না। এক যুগ অন্য এক অনাগত যুগের কাছে তার বিচিত্র খবরাখবর পৌছে দেয় তার লিপিবদ্ধ

ভাষায়। কিন্তু আর্যপূর্ব বাংলার আদিবাসীদের তেমন কোন লিপি ছিল না। তাই সেই আদিবাসীদের জ্ঞানবিজ্ঞান, শিক্ষাদীক্ষা, আর শিল্প-সাহিত্য-সঙ্গীতের খুব সামান্য খবরই আমরা রাখি। আজও আদিম কৌম সমাজের মধ্যে সেই প্রাচীনতম সংস্কৃতির যতটুকু টিঁকে আছে, তার বেশি জানবার কোন উপায় নেই।

আর্যভাষা

পূর্ব-ভারতে এর পর যে আর্যভাষা ছড়ালো, তার চেহারা কিন্তু হুবহু উত্তর-ভারতের আর্যভাষার মত নয়। পূর্বাঞ্চলের আর্যভাষা ও সংস্কৃতির বাহন হলেন অ্যাল্পো-দীনারীয় নরগোষ্ঠীর লোকেরা; এঁরা ছিলেন অবৈদিক ও ব্রাত্য। এঁদের আর্যভাষা ছিল উত্তর-ভারতীয় আর্যভাষা থেকে আলাদা—তাতে ছিল 'অসুর' ভাষার ছাপ। পূর্বাঞ্চলের আর্যভাষায় বিশেষ অর্থে কয়েকটি ক্রিয়াপদ ব্যবহার করা হত এবং 'র' আর 'ল' গুলিয়ে ফেলা হত। এই সময়ে পূর্ব-ভারতে একাধিক বৈয়াকরণিক ছিলেন, পাণিনির লেখা থেকে তা জানা যায়। কিন্তু সাহিত্য রচনা না হলে কেউ কখনও ব্যাকরণ নিয়ে মাথা ঘামায় না। তাই সহজেই এ কথা আঁচ করা যায় যে, সে যুগে কিছুটা সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু সত্যিই কতটা কী হয়েছিল, তা বলবার মত মালমশলা আজও ঐতিহাসিকদের হাতে নেই।

অবৈদিক প্রাচ্য আর্যভাষা ও সংস্কৃতির দেখাদেখি উত্তর ও মধ্য-ভারতীয় আর্যভাষার স্রোত এসে বাংলাদেশে আছড়ে পড়ল। বোধহয় মৌর্য আমল থেকে গোড়ায় বাংলার উত্তর ও পশ্চিম অঞ্চলে, তারপর ক্রমে পূর্ব ও দক্ষিণ অঞ্চলেও প্রাচ্য-প্রাকৃত এবং উত্তর ও মধ্য-ভারতীয় সংস্কৃতের স্রোত সবেগে বইতে লাগল। মধ্য-ভারতীয় নানা যতি-সন্ন্যাসী, বণিক-সার্থবাহ, সৈনিক-রাজপুরুষেরা এই স্রোতের বাহক হলেন। আর্যপূর্ব ও অনার্য আদিবাসীরা ক্রমশ বৌদ্ধ, জৈন ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের কোলে ঠাঁই নেবার সঙ্গে সঙ্গে আর্যভাষা ও সংস্কৃতি আস্তে আস্তে আর্যপূর্ব ও অনার্য ভাষাগুলিকে নিঃশব্দে নিজের কুক্ষিগত করে নিয়েছে।

গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর পর্ব

বাংলায় গুপ্ত-আধিপত্যের প্রতিষ্ঠা থেকে তার পাঁচ-ছ'শো বছর আগে, পর্যন্ত যে সময়, তার মধ্যে আর্যভাষার কী চেহারা দাঁড়িয়েছিল, জ্ঞানবিজ্ঞানের কতটা কী প্রসার হয়েছিল—কিছুই জানা যায় না। এটা আন্দাজ করা যায় যে, এদেশে আর্যভাষার প্রাচ্য মাগধী প্রাকৃত রূপই ক্রমে ছড়িয়ে পড়ছিল; তবে পণ্ডিতমহলে কিংবা রাজকীয় ক্রিয়াকর্মে পোশাকী ভাষা হিসেবে তার তেমন কদর ছিল না বলে মনে হয়। পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকে গুপ্ত আমলের যে ক'টি লিপি পাওয়া গেছে, তার সবগুলোই মধ্য-ভারতীয় বিশুদ্ধ সংস্কৃতে লেখা। এই পর্বের বিভিন্ন লিপি দেখে মনে হয়, ষষ্ঠ-সপ্তম শতকের আগে বাঙালী-পণ্ডিতেরা সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে ঠিক হৃদয়ের যোগ ঘটাতে পারেননি। কেননা তাঁদের ঐ সময়কার লেখাগুলো সবই নেহাৎ কাঠখোট্টা গদ্যে লেখা।

জ্ঞানচর্চা

য়ুয়ান-চোয়াং তাঁর ভ্রমণ-বৃত্তান্তে সপ্তম শতকের পুণ্ড্রবর্ধন, কামরূপ, সমতট, তাম্রলিপ্তি এবং কর্ণসুবর্ণের লোকদের জ্ঞানস্পৃহা ও জ্ঞানচর্চার খুব প্রশংসা করেছেন। নালন্দার মহাবিহারের সঙ্গেও বাংলার জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষাদীক্ষার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। এই মহাবিহারের মহাচার্য শীলভদ্র ছিলেন বাঙালী। তিনি ছিলেন সমতটের ব্রাহ্মণ্য রাজবংশের সন্তান এবং য়ুয়ান-চোয়াঙের গুরু। তিব্বতী ভাষার অনূদিত তাঁর একটি গ্রন্থের নাম 'আর্য-বুদ্ধ-ভূমি-ব্যাখ্যান'। তিনি সমস্ত শাস্ত্রে ও সূত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর সময়ে নালন্দা মহাবিহারের শ্রমণসংখ্যা ছিল দশ হাজার।

বাংলাদেশের বিভিন্ন বৌদ্ধ বিহার-সংঘারাম ছিল জ্ঞানবিজ্ঞান, শিক্ষাদীক্ষার একেকটি কেন্দ্র। এখানে বৌদ্ধ ধর্মের চর্চা ও বৌদ্ধ শাস্ত্র পাঠ ছাড়াও ব্যাকরণ, শব্দবিদ্যা, হেতুবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, চতুর্বেদ, সাংখ্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা, মহাযান শাস্ত্র, অষ্টাদশ নিকায়বাদ, যোগশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা ইত্যাদি পড়ানো হত। বিভিন্ন দেবমন্দিরে যেসব ব্রাহ্মণ-আচার্য-উপাধ্যায় থাকতেন, তাঁরা ব্রাহ্মণ্য ধর্মশাস্ত্রের চর্চা ছাড়াও নানা পার্থিব দৈনন্দিন সমস্যাগত জ্ঞানবিজ্ঞান শিক্ষাদীক্ষার চর্চাও করতেন। এই একনিষ্ঠ সাধনার ফলও ফলতে শুরু করেছিল। সপ্তম শতকের লিপিগুলিতে দেখা গেল রীতিমত অলঙ্কারময় কাব্যরীতি দানা বেঁধে উঠেছে।

ব্যাকরণ চর্চার জন্যে বাংলার নাম খুব প্রাচীনকাল থেকে। যাঁরা এই দিক থেকে অগ্রণী ছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজন হলেন চন্দ্রগোমী। চান্দ্র-ব্যাকরণ ও তার বৃত্তি বা টীকা তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। তিনি সপ্তম শতক কিংবা তার আগের কোন সময়কার লোক। তিনি বৌদ্ধ; তাঁর অন্যনাম গোমিন্ (এখনকার 'গুঁই'?)। চন্দ্রগোমীর জন্ম বরেন্দ্রীতে। বজ্রযান-সংক্রান্ত তাঁর প্রচুর বই আছে। তাছাড়া তিনি লোকানন্দ নামে নাটক ও শিষ্যলেখধর্ম নামে ছোট কাব্যও রচনা করেছিলেন। কাব্যটির রচনারীতি দুর্বল এবং সংস্কৃত কাব্য অনুসরণ করে মামুলি ছকে লেখা। নালন্দা মহাবিহারে আচার্য স্থিরমতির কাছে তিনি পড়াশুনা করেছিলেন এবং যেমন ব্যাকরণে, তেমনি সাহিত্য, জ্যোতিষ, তর্কশাস্ত্র, চিকিৎসাবিদ্যা ও শিল্পকলায় তাঁর ভাল দখল ছিল।

ব্যাকরণ

দর্শনের আলোচনায়ও বাংলাদেশ পিছিয়ে থাকেনি। আগম-শাস্ত্রগ্রন্থ 'গৌড়পাদকারিকা' এই যুগেরই লেখা। লেখক গৌড়পাদের বাড়ি ছিল গৌড়দেশে। তিনি ছিলেন শুক্লের শিষ্য এবং আচার্য শঙ্করের গুরুর গুরু। শঙ্করের আগে যে বৈদান্তিক মত প্রচলিত ছিল, তার সঙ্গে বৌদ্ধ মাধ্যমিক শূন্যবাদ সূক্ষ্মভাবে মিলিয়ে মিশিয়ে গৌড়পাদ-কারিকার দার্শনিক মতবাদ গড়ে তোলা হয়েছে। পরবর্তী কালের মাধ্যমিক মতবাদী একাধিক বৌদ্ধ আচার্য গৌড়পাদের গ্রন্থ থেকে শ্লোক উদ্ধার করে তাঁদের মতামত ব্যক্ত করেছেন। গৌড়পাদের লেখা আরও দুটি কারিকার মধ্যে একটির নাম সাংখ্য-কারিকা, অন্যটির নাম উত্তরগীতা।

দর্শন

আরেকটি বিদ্যায়ও প্রাচ্য ভারতের এবং বাংলাদেশের কিছুটা নামডাক ছিল; তার নাম হস্তী-আয়ুর্বেদ। পূর্ব-ভারতে হাতির প্রাচুর্য কৌটিল্য এবং গ্রীক ঐতিহাসিকদের চোখ এড়ায়নি। কাজেই ঘোড়ার ডাক্তারের মত সে যুগে হাতির ডাক্তার থাকাও অস্বাভাবিক নয়। তাই হাতির চিকিৎসা সম্বন্ধে আলাদা একটি শাস্ত্রই গড়ে উঠেছিল। হাতির চিকিৎসা সম্বন্ধে চম্পার রাজা রোমপাদের সঙ্গে ঋষি পালকাপ্যের যে সুদীর্ঘ আলাপ হয়েছিল, গ্রন্থাকারে লেখা তাঁদের সেই কথোপকথন হস্ত্যায়ুর্বেদ নামে পরিচিত। পালকাপ্য ও রোমপাদ সম্পর্কে যে গল্প আছে, তা নিছক পৌরাণিক স্বপ্নকল্পনার সৃষ্টি। পালকাপ্য নামে আদৌ কোন লোক ছিলেন কিনা সন্দেহ। দ্রাবিড় ভাষায় পাল অর্থে হাতি, কপি মানেও

হস্তী-আয়ুর্বেদ

হাতি। যাই হোক, এই গ্রন্থটি সম্ভবত ষষ্ঠ-সপ্তম শতকের আগের লেখা নয়; হস্তী-চিকিৎসা-সংক্রান্ত আরও পুরনো কোন গ্রন্থ দেখে ব্রহ্মপুত্রের ধারে কোন জায়গায় বইটি লেখা হয়েছিল।

সপ্তম শতকে বাণভট্ট তাঁর হর্ষচরিতে ভারতের নানা অঞ্চলের সে-সময়কার সাহিত্যের রচনারীতি সম্পর্কে বলেছেন: উত্তর-ভারতে দেখা যায় শব্দ-প্রয়োগের বাহাদুরি, পশ্চিমে দেখা যায় অর্থগৌরব; দক্ষিণ-ভারতে উৎপ্রেক্ষা আর অলঙ্কারের ছড়াছড়ি এবং গৌড়জনদের লেখায় মাত্রা নিয়ে মাতামাতি। সপ্তম-অষ্টম শতকেই গৌড়ী-রীতি সারা ভারতে একটি বিশিষ্ট কাব্যরীতি হিসেবে নাম করেছিল; বৈদর্ভী-রীতির পাশাপাশি ছিল গৌড়ীরীতির স্থান। বিখ্যাত আলঙ্কারিক দণ্ডী কিন্তু গৌড়ীরীতি পছন্দ করতেন না; তাঁর মতে, চড়া গলায় কথা বলা এবং একটু বাড়িয়ে বলা গৌড়জনদের স্বভাব; গৌড়ীরীতির প্রধান লক্ষণ তার অর্থ ও অলঙ্কার-বাহুল্য অনুপ্রাসপ্রিয়তা এবং ঠাসবুনানি। গৌড়ীরীতির আলঙ্কারিক ভামহের বরং কিছুটা টান ছিল। নাটকেও বোধহয় বাংলাদেশ পূর্ব-ভারতের অন্যান্য দেশের মতই একটি বিশিষ্ট রূপ ও রীতির প্রবতন করেছিল।

সাহিত্য

ইতিহাসে এই গৌড়ীরীতির এক সুগভীর তাৎপর্য আছে। ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি থেকেই গৌড়জনেরা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে সচেতন হতে আরম্ভ করেন। এর পর থেকেই গৌড় তার নিজস্ব জনপদকে আশ্রয় করে ক্রমশ এক স্বাধীন স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গড়ে তোলার দিকে অগ্রসর হয়। গৌড়জনের আকাঙ্ক্ষিত সেই স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্রকে সুস্পষ্ট রূপ দেন শশাঙ্ক। সর্বভারতীয় বৈদর্ভী রীতিকে অস্বীকার করে সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে যে স্বাধীন স্বতন্ত্র গৌড়ীরীতি দেখা দিয়েছিল, তার মূলে ছিল গৌড়জনের নিজস্ব প্রতিভা, প্রকৃতি, রুচি ও সংস্কারেরই প্রেরণা।

পাল-চন্দ্র পর্ব

পাল আমলের দু'একশো বছর আগে থেকেই বাংলাদেশে সংস্কৃতের চর্চা পুরোদমে শুরু হয়ে গিয়েছিল। সপ্তম শতকে যে অলঙ্কৃত কাব্যরীতির সূচনা

দেখা গিয়েছিল, পাল আমলের গোড়াতেই তার পুরোপুরি বিকাশ দেখা গেল। দশম-একাদশ শতকের বিভিন্ন লিপিমালা থেকে জানা যায়, বাংলাদেশে অন্যান্য বিদ্যার সঙ্গে বেদ, আগম, নীতি, জ্যোতিষ, ব্যাকরণ, তর্ক, মীমাংসা, বেদান্ত, প্রমাণ, শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, কাব্য সমস্ত কিছুরই চর্চা হত। চারটি বেদেরই কমবেশি পঠন-পাঠন হত। মন্ত্রী, সেনানায়ক ইত্যাদি রাজপুরুষেরাও এইসব শাস্ত্রের অনুশীলন করতেন। যতদূর মনে হয়, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা নিজের বাড়িতে কিংবা বড় বড় মন্দিরে ছোট বড় চতুষ্পাঠী খুলে ছাত্রদের পড়াতেন। কোন বিশেষ শাস্ত্রে কেউ পারদর্শী হতে চাইলে তার জন্যে বিশেষজ্ঞ আচার্য পাওয়া যেত। বাঙালী ছাত্রেরা অনেক সময়ে পড়াশুনার জন্যে ভিন্ন প্রদেশে গিয়ে থাকতেন। ধর্মপ্রচার কিংবা বিদ্যাদানের জন্যে আমন্ত্রিত হয়ে বাঙালী আচার্যেরাও অনেক সময়ে বাংলার বাইরে যেতেন। অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার জন্যে অনেক সময়ে বড়লোকেরা অর্থ ও জমি দান করত। পণ্ডিত, কবি, আচার্যদের ভাগ্যে মাঝে মাঝে পুরস্কারও জুটত।

সংস্কৃত চর্চা

এই পর্বে অর্থাৎ, নবম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে এবং তার পরেও সাহিত্যের ভাষা হিসেবে বাংলাদেশে সংস্কৃত, নানা রকমের প্রাকৃত এবং শৌরসেনী অপভ্রংশ—এই তিন ভাষারই প্রচলন ছিল। তখনও এদেশে বাংলা ভাষার ভিত পাকা হয়ে উঠেনি। যাঁরা শিক্ষিত তাঁরা সকলেই শিল্পসাহিত্যে, জ্ঞানবিজ্ঞানে, শিক্ষাদীক্ষায়, দর্শনবিচারে সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করতেন; প্রাকৃতজনের কথ্য ভাষাকে ব্যাকরণসম্মত, শুদ্ধ ও সংস্কৃত করে তাঁরা নিজেদের বক্তব্য পেশ করবার চেষ্টা করতেন। প্রাকৃতের চর্চা বাংলাদেশে বড় একটা হত না। বাঙালীর প্রাকৃত উচ্চারণ ছিল আড়ষ্ট। তাই ঠাট্টা করে কাব্য-মীমাংসার লেখক রাজশেখর তাঁর বইতে সরস্বতীর মুখ দিয়ে বলিয়েছেন—হয় গৌড়ের লোকেরা প্রাকৃত ছাড়ুক, না হয়ত অন্য কেউ সরস্বতী হোক।

ভাষা

বাংলাদেশে প্রাকৃতের চেয়ে ঢের বেশি প্রচলিত ছিল শৌরসেনী অপভ্রংশ—গোটা উত্তর ভারত জুড়ে, এমন কি মহারাষ্ট্র আর সিন্ধুদেশেও যার প্রবল প্রতাপ ছিল। বাংলাদেশের সহজযানী সিদ্ধাচার্য ও ব্রাহ্মণ্য কবিরাও কেউ কেউ এই ভাষায় কিছু কিছু কাব্য রচনা করেছেন। এই পর্বে লোকায়ত বাঙালী সমাজের লোকভাষা ছিল মাগধী অপভ্রংশের গৌড়-

বঙ্গীয় রূপ। এই রূপই পরে ক্রমশ বাংলা ভাষা হয়ে দেখা দেয়। এই মাগধী অপভ্রংশের স্থানীয় রূপের সঙ্গে শৌরসেনী অপভ্রংশের তফাৎ ছিল উনিশ-বিশ। এই দুই ভাষাই সহজবোধ্য বলে নিরক্ষর লোকদের শিখতে এবং এর একটি ভাষা জানা থাকলে অন্য ভাষাটিও বুঝতে বিশেষ কষ্ট হত না। ধর্মের তত্ত্বকথা সাধারণ মানুষের মনে সহজে পৌঁছে দেবার জন্যে সিদ্ধাচার্যেরা এবং কোন কোন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা এই দুই ভাষাই বেশি বেশি ব্যবহার করতে লাগলেন। মাগধী অপভ্রংশ থেকে গোড়াকার বাংলা ভাষা গড়ে উঠতেই সেই নবজাত ভাষাকেও বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যেরা সাগ্রহে গ্রহণ করলেন। প্রাচীন চর্যাগীতিগুলি আজও বাংলা ভাষার সেই অস্পষ্ট উষাকালকে চিনিয়ে দিচ্ছে।

এই পর্বে সংস্কৃত শুধু নিজেকে কোন রকমে কষ্টেসৃষ্টে প্রকাশ করবার ভাষা মাত্র নয়, তা রীতিমত সূক্ষ্ম ও গভীর ভাব প্রকাশের বাহন হয়ে উঠেছে। কাজেই ধর্ম, দর্শন, অলঙ্কার, ব্যবহার, চিকিৎসাবিদ্যা—যত কিছুই লেখা হচ্ছে, সবই সংস্কৃত ভাষায়। ফলে, জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসার শিক্ষিত উচ্চ স্তরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বাংলাদেশে সংস্কৃতির চর্চা পাল আমলে যথেষ্ট বেড়ে গেল। যতদূর মনে হয়, পণ্ডিত সমাজের বাইরে একটি বৃহত্তর সাধারণ সংস্কৃত-শিক্ষিত সমাজও গড়ে উঠেছিল; তাঁরা এই সময়কার অগণিত বাঙালী কবির সংস্কৃতে লেখা শ্লোক ও কাব্যের সমঝদার ছিলেন। সংস্কৃতে যাঁরা লিখতেন, তাঁদের সমাজ ও ভাব-জগতে বৃহত্তর জনসাধারণের বিশেষ স্থান ছিল না; অবশ্য তাঁদের কারো লেখাতেই জনসাধারণের ভাবনা-চিন্তা, সুখ-দুঃখ ক্বচিৎ কখনও ফুটে ওঠেনি এমন নয়।

এত জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা সত্ত্বেও কিন্তু এই পর্বের বাঙালী লেখক ও তাঁদের লেখা বইপুঁথি সম্পর্কে খবর খুব বেশি পাওয়া যায় না।

প্রাচীন বাংলায় বেদের চর্চা যেটুকু হত, তা সম্ভবত সমাজের উচ্চস্তরে পণ্ডিতদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত। বৈদিক ক্রিয়াকর্ম, যাগযজ্ঞ সম্বন্ধে এই যুগে একটিমাত্র পুঁথির খবর পাওয়া যায়। তার লেখক হলেন

বেদচর্চা

বেদজ্ঞ পণ্ডিত উমাপতি, তাঁর বাড়ি ছিল উত্তর-রাঢ়ে। অধ্যাত্মচিন্তা এবং দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে পুঁথি লিখে ভারতজোড়া খ্যাতি লাভ করেছিলেন ন্যায়কন্দলীর লেখক শ্রীধর ভট্ট। এ ছাড়াও তিনি বেদান্ত ও মীমাংসা-বিষয়ক আরও যে চারখানা পুঁথি লিখেছেন, তার একটিও

এখন পাওয়া যায় না। শ্রীধর-ভট্টের সমসাময়িক ছিলেন উদয়ন। লক্ষণাবলী, কিরণাবলী, কুসুমাঞ্জলি এবং আত্মতত্ত্ববিবেক তাঁরই লেখা। ভাদুড়ী গাঞী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বলে কুলজী-গ্রন্থে উদয়নের যে পরিচয়, তা কতটা বিশ্বাসযোগ্য বলা কঠিন। উদয়ন আদৌ বাঙালী ছিলেন কিনা সন্দেহ।

বাংলাদেশে বেদান্ত-দর্শনের চর্চার চেয়ে ন্যায়বৈশেষিক ও বৌদ্ধ মাধ্যমিক দর্শনের দিকেই ঝোঁক বেশি ছিল। কৃষ্ণমিশ্রের লেখা প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকে আছে—দক্ষিণরাঢ়বাসী এক ব্রাহ্মণ কাশীতে গিয়ে বেদান্তচর্চার বাড়াবাড়ি দেখে বলেছেন : প্রত্যক্ষাদি প্রমাণে যা অসিদ্ধ, যাতে উল্টোপাল্টা কথা বলা আছে—সেই বেদান্ত যদি শাস্ত্র হয়, বৌদ্ধেরা তাহলে কী দোষ করল!

ন্যায়শাস্ত্র ও সাহিত্যে সুপণ্ডিত অভিনন্দ নামে এক লেখকের খবর পাওয়া যায়; তিনি যোগবাশিষ্ঠের সংক্ষিপ্তসার করেছিলেন। তাঁর বাড়ি ছিল গৌড়দেশে।

এই পর্বের দু'জন বৌদ্ধ বৈয়াকরণিক—মৈত্রেয়-রক্ষিত এবং জিনেন্দ্রবুদ্ধি। 'বোধিসত্ত্ব-দেশীয়াচার্য' বলে জিনেন্দ্রবুদ্ধি নিজের পরিচয় দিয়েছেন। জিনেন্দ্র-বুদ্ধির লেখা বিবরণ-পঞ্জিকার ওপর মৈত্রেয়-রক্ষিত তন্ত্রপ্রদীপ নামে একটি টীকা রচনা করেছিলেন। কামধেনু নামে অমরকোষের একটি টীকা রচনা করেছিলেন বৌদ্ধ অভিধানকার সুভূতিচন্দ্র।

ব্যাকরণ-অভিধান

এই যুগে যেসব চিকিৎসাশাস্ত্রবিদ সারা ভারতে নাম করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে চক্রপাণি-দত্ত ছিলেন বাঙালী। তাঁর পিতা ছিলেন গৌড়রাজের একজন কর্মচারী, রন্ধনশালার তদারক করতেন। তাঁদের বাড়ি ছিল বোধহয় বীরভূমে। চক্রপাণির এক ভাইও ছিলেন রোগ-নিদান-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও সুচিকিৎসক। চরকের যে টীকা চক্রপাণি লেখেন, তাঁর নাম আয়ুর্বেদ-দীপিকা; তাঁর লেখা সুশ্রুতটীকার নাম ভানুমতী। ভেষজ গাছ-গাছড়া ও পথ্য সম্পর্কেও তাঁর লেখা দুটি পুঁথি আছে। ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মৌলিকগ্রন্থ হল চক্রপাণি-দত্তের লেখা চিকিৎসা-সংগ্রহ।

আয়ুর্বেদ

ধর্মশাস্ত্র-রচয়িতা হিসেবে জিতেন্দ্রিয় ও বালকের নাম পাওয়া গেলেও মীমাংসা ও ধর্মশাস্ত্র নিয়ে বাংলাদেশে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য লেখা হয়েছিল কিনা সন্দেহ। এই পর্বে সারাবলী নামে একটিমাত্র জ্যোতিষ-গ্রন্থের খবর পাওয়া যায়; এর লেখক কল্যাণবর্মা ব্যাঘ্রতটীর লোক ছিলেন।

এই পর্বের বিভিন্ন প্রশস্তি-লিপিতে বাংলার কাব্য-সাহিত্যের মোটামুটি একটি ছবি ধরা পড়ে। সভাকবিরাই সাধারণত এইসব প্রশস্তি লিখেছেন ; সবই মধ্য-ভারতীয় ছাঁচে ঢালা, তেমন কোন নিজস্বতা নেই। ভট্ট গুরবমিশ্রের প্রশস্তি, ভোজবর্মার বেলাব-প্রশস্তি—সমস্তই এ যুগের কাব্যচর্চার বিশিষ্ট নিদর্শন। কবি মনোরথের লেখা কমৌলি-লিপিতে নৌযুদ্ধের সুন্দর বর্ণনা আছে :

সাহিত্য

> দক্ষিণবঙ্গে তাঁর বিজয়-অভিযানে নৌবহরের হী-হী শব্দে ভয়চকিত হয়ে দিগ্‌গজেরা যে পালিয়ে যায়নি তার কারণ, যাদের যাবার কোন জায়গা ছিল না। তাছাড়া দাঁড়গুলোর উর্ধ্বমুখী আঘাতে উৎক্ষিপ্ত জলরাশি আকাশে যদি স্থির হয়ে থাকত, তাহলে চাঁদের কলঙ্ক যে ঢাকা পড়ে যেত।

বাঙালী কবি গৌড়-অভিনন্দ এবং অভিনন্দ সম্ভবত একই লোক ছিলেন। অভিনন্দের লেখা বিভিন্ন শ্লোক প্রাচীন বহু পুঁথিতে উদ্ধৃত করা হয়েছে। কাদম্বরী-কথাসার নামে একটি গ্রন্থও গৌড়-অভিনন্দ পদ্যে রচনা করেছিলেন। পালবংশীয় কোন যুবরাজের সভাকবি ছিলেন আরেক কবি অভিনন্দ। রামচরিত নামে একটি কাব্যের তিনি রচয়িতা। বাংলাদেশের বাঙালী কবির লেখা এই প্রাচীনতম রামচরিত বা রামায়ণ-কাব্য এই কারণে উল্লেখযোগ্য যে, এতে দেবমাহাত্ম্যের কীর্তন করা হয়েছে—অবশ্য রামচন্দ্রের মুখে নয়, হনুমানের মুখে।

সন্ধ্যাকর নন্দী নামে আরেকজন কবিও এই যুগে একটি রামচরিত লিখেছিলেন। কিন্তু এই কাব্যটি এক অর্থে যেমন রামচন্দ্রের কাহিনী, তেমনি আবার অন্য অর্থে পালরাজ রামপাল ও তাঁর উত্তরাধিকারীদের ইতিহাসও বটে। সন্ধ্যাকরের পিতা ছিলেন রামপালের সান্ধিবিগ্রহিক প্রজাপতি নন্দী। লেখা কবে শুরু হয়েছিল বলা না গেলেও মনে হয় মদন-পালের রাজত্বকালে গ্রন্থটি লেখা শেষ হয়। এই গ্রন্থটির সাহিত্য-মূল্য যত কমই হোক, ঐতিহাসিক মূল্য যথেষ্ট আছে। শব্দ ও ভাষার ওপর সন্ধ্যাকর নন্দীর যে যথেষ্ট দখল ছিল, এই গ্রন্থ থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁর রচনার মৌলিকতা না থাকলেও বাহাদুরি আছে।

চণ্ডকৌশিক নাটকের লেখক ক্ষেমীশ্বর বাঙালী হওয়া অসম্ভব নয়। নাটকটির নান্দী অংশে বলা আছে, মহীপালের রাজসভায় এই নাটকটি

লেখা হয়েছে। এই মহীপাল পাল-রাজ মহীপাল না প্রতীহার-রাজ মহীপাল —সঠিকভাবে তা বলা মুস্কিল। নাটকে বর্ণিত মহীপাল কর্ণাটক সৈন্যদের পরাস্ত করেছিলেন ; কিন্তু পাল-রাজা মহীপাল যেমন একাধিক কর্ণাটক বাহিনীর মহড়া নিয়েছিলেন, তেমনি প্রতীহার-রাজ মহীপালকেও রাষ্ট্রকূট-বাহিনীর সঙ্গে লড়তে হয়েছিল ; এই রাষ্ট্রকূট-বাহিনীকে কর্ণাটক বাহিনী বললে খুব অন্যায় হয় না। কিন্তু চণ্ডকৌশিক নাটকের সবচেয়ে পুরনো যে দুটি পাণ্ডুলিপি আছে, দুটিই পাওয়া গেছে নেপালে। ক্ষেমীশ্বর বাঙালী হোন বা না হোন, বোধহয় তাঁর কর্মক্ষেত্র ছিল বাংলাদেশে—এই নাটকটির প্রচলনও এই দুই দেশেই বেশি ছিল। বিশ্বামিত্র-হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী নিয়ে লেখা এই পঞ্চাঙ্ক নাটকটির লেখা মোটেই উঁচু জাতের নয়। তাই সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে চণ্ডকৌশিকের তেমন আদর নেই।

বরং নীতিবর্মার কীচকবধ কাব্যে মহাভারতের বলিষ্ঠ সরলতা না থাকলেও শ্লেষ ও অলঙ্কারের চমক আছে, বাক্‌ভঙ্গি ও শব্দপ্রয়োগের বাহাদুরি আছে। তাই পরবর্তী নানা সংস্কৃত গ্রন্থে নীতিবর্মার লেখা থেকে উদ্ধৃতি দেখতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন সাক্ষ্যপ্রমাণ থেকে মনে হয়, নীতিবর্মার কর্মক্ষেত্র ছিল বাংলাদেশে এবং তাঁর কাব্যটির প্রচলনও এদেশেই সীমাবদ্ধ ছিল।

একাদশ-দ্বাদশ শতকের আদি বাংলা হরফে লেখা কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয় নামে একটি সংস্কৃত কবিতা সংগ্রহ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি নেপালে পাওয়া গেছে। বইটিতে যে একশো এগারো জন কবির কবিতা আছে, নাম দেখলেই বোঝা যায় তাঁদের মধ্যে অনেকেই বাঙালী এবং তার মধ্যে কয়েকজন আবার বৌদ্ধ। যেমন : গৌড়-অভিনন্দ, ডিম্বোক বা হিম্বোক, কুমুদাকর মতি, ধর্মকর, বুদ্ধাকরগুপ্ত, মধুশীল, বাগোক, ললিতোক, বিনয়দেব, ছিত্তপ, বন্দ্য তথাগত জয়ীক, বিতোক, বিদ্যাকা বা বিজ্জাকা, বিনয়দেব, বীর্যমিত্র, বৈদ্ধোক, শুভংকর, শ্রীধর-নন্দী, রতিপাল, যোগোক, সিদ্ধোক, সোনোক, বা সোন্নোক হিঙ্গোক, বৈদ্যধন্য, অপরাজিত-রক্ষিত প্রভৃতি। এ জাতীয় সংকলন-গ্রন্থ আগে কখনও দেখা যায়নি ; এই পর্বের বাংলাদেশেই বোধহয় এই ধারা প্রথম প্রবর্তিত হয়। এই সময়কার শিক্ষিত বাঙালীরা মহাকাব্য কিংবা পাণ্ডিত্যপূর্ণ নাতিদীর্ঘ নীরস কাব্যের চেয়ে ঢের বেশি পড়তে ভালবাসতেন অপভ্রংশ এবং প্রাকৃত পদ ও ছড়া, সংক্ষিপ্ত সংস্কৃত কবিতা, টুকরো টুকরো

শ্লোক। এইসব সংস্কৃত শ্লোক ও পদের মধ্যে বাংলার প্রাকৃতিক রূপ, সে-যুগের বাঙালীর ধ্যানধারণা, ভাবনাচিন্তা চমৎকার ফুটে উঠেছে। নবম শতকের মাঝামাঝি কয়েকটি লিপিতে রাধাকৃষ্ণের ব্রজলীলার স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়।

দু'একজন মহিলা কবিও ছিলেন—যেমন, ভাবক বা ভাবদেবী ও নারায়ণ-লক্ষ্মী।

পাল-চন্দ্র পর্বের বাংলাদেশের আসল গৌরব বৌদ্ধ জ্ঞানবিজ্ঞান ও শিক্ষা-সংস্কৃতি। সংস্কৃত, অপভ্রংশ ও প্রাচীন বাংলাভাষায় লেখা বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের অগণিত গ্রন্থে তার প্রমাণ রয়েছে। অধিকাংশ মূলগ্রন্থই বিলুপ্ত; কেবল কিছু কিছু তিব্বতী অনুবাদ এখনও টিঁকে আছে। কিন্তু সেই অনুবাদও অনেকাংশে দুর্বোধ্য; দোষটা তিব্বতী অনুবাদের নয়—আসলে যে-সংস্কৃতে মূলগ্রন্থগুলি লেখা হয়েছে, সে-সংস্কৃতে না আছে ব্যাকরণের ঠিক, না আছে শব্দ ব্যবহারের কোন শ্রী-ছাঁদ। বৌদ্ধ আচার্যেরা তো ওসবের কোন ধারই ধারতেন না। তাঁরা বলতেন: বুঝতে পারলেই হল; ছন্দ, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, শব্দ বা পদরীতি যদি অশুদ্ধ কিংবা অপ্রচলিত হয়ও, তাতে কীই বা যায় আসে?

বৌদ্ধ অবদান

তাছাড়া এইসব ধর্মের চারপাশে গণ্ডি দেওয়া থাকত; একমাত্র যাঁরা দীক্ষিত তাঁরা ছাড়া তার ভেতর আর কেউ ঢুকতে পারত না। গুরু ছাড়া এইসব ধর্মের সাধন-রহস্য ভেদ করা যেত না; যাঁরা গুরু এবং যাঁরা দীক্ষিত তাঁরা তাঁদের গুহ্য সাধনা সম্বন্ধে নিজেদের মধ্যে দুর্বোধ্য সন্ধাভাষায় কথাবার্তা বলতেন; সে ভাষা আর কেউ বুঝত না। এ ভাষার দুটো মানে; শুনলে মনে হয় এক, আসল অর্থ কিন্তু অন্য। এই সব ধর্মে যারা দীক্ষিত, একমাত্র তারাই সেই গূঢ় অর্থের খোঁজ রাখে।

মন্ত্রযান, কালচক্রযান আর বজ্রযানে তেমন কোন বাঁধাধরা তফাত কখনও ছিল না। একই বৌদ্ধাচার্য নানা যান সম্বন্ধে পুঁথি লিখেছেন, একই সঙ্গে একাধিক যান তাঁকে গুরু বলে মেনেছে। এই সব ধর্ম, মার্গ ও সম্প্রদায়ের সঙ্গে অন্যান্য লোকায়ত ধর্মেরও কিছুটা মেশাল ছিল। তারই জন্যে পরে এদেরই ভেতর থেকে, এদেরই ধ্যানধারণা নিয়ে বৈষ্ণব সহজিয়া, শৈব নাথযোগী, আউল-বাউল ইত্যাদি ধর্মমত ও সম্প্রদায় গড়ে ওঠে।

বাঙালী বৌদ্ধাচার্য

অষ্টম-নবম শতকের এইসব মহাযানী, কালচক্রযানী, মন্ত্রযানী, বজ্রযানী, সহজযানী আচার্যদের বেশির ভাগই ছিলেন বাঙালী ; কেউ কেউ ছিলেন কামরূপ, ওড্রদেশ, বিহার, কাশ্মীরের লোক। তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্মের লীলাভূমি ছিল পূর্ব-ভারত, বিশেষ করে বাংলাদেশ। কয়েকটি ছাড়া সমস্ত মহাবিহারই ছিল বাংলাদেশে। সেকালে বাঙালীর শিক্ষাদীক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য-সংস্কৃতির বড় বড় ঘাঁটি ছিল জগদ্দল, সোমপুরী, পাণ্ডুভূমি, ত্রৈকূটক, বিক্রমপুরী, দেবীকোট, সন্নগর, ফুল্লহরি, পণ্ডিত, পট্টিকেরক ইত্যাদি বিহার। এইসব বৌদ্ধ আচার্যেরা যেমন একদিকে অবলোকিতেশ্বর, তারা, মঞ্জুশ্রী, লোকনাথ, হেরুক, হেবজ্র প্রভৃতি দেবদেবীর সাধনমন্ত্র, স্তোত্র, সঙ্গীতি, মন্ত্র, মণ্ডল, মুদ্রা, যোগ ধারণী, সমাধি নিয়ে পুঁথি লিখেছেন, তেমনি আবার অন্যদিকে যোগ ও দর্শন, হেতুবিদ্যা ও চিকিৎসাবিজ্ঞান, জ্যোতিষ ও শব্দবিদ্যা সম্বন্ধেও তাঁদের লেখা সুচিন্তিত গ্রন্থ আছে।

বৌদ্ধ আচার্যদের প্রায় সবাই যে বাঙালী ছিলেন, তার পরোক্ষ প্রমাণ আছে। বৌদ্ধ আচার্যদের লেখা অধুনালুপ্ত অসংখ্য পুঁথির মধ্যে একাংশ তিব্বতী ভাষায় অনূদিত হয়েছিল ; ত্রয়োদশ শতকের একজন তিব্বতী লামা এই সমস্ত অনূদিত পুঁথির একটি তালিকা করেছিলেন—সেই গ্রন্থ-তালিকাটির নাম ত্যাঙ্গুর। তাতে মূল গ্রন্থ-লেখকদের কারো কারো জন্মভূমি বলা হয়েছে জাহোরে বা সাহোরে এবং উড্ডীয়ানে। লোকায়ত ঐতিহ্য মতে, এই উড্ডীয়ানেই নাকি বজ্রযানের উদ্ভব। কিন্তু বিভিন্ন গ্রন্থকারের পরিচয় দিতে গিয়ে যেভাবে একই লেখককে একাধারে উড্ডীয়ানবাসী ও বাঙালী, জাহোর বা সাহোরবাসী ও বাঙালী বলা হয়েছে—তা থেকে মনে হয় উড্ডীয়ান ও জাহোর বা সাহোর বাংলাদেশেরই দুটি জায়গার নাম।

অষ্টম-নবম শতক

প্রাচীনতম বজ্রযানী বৌদ্ধ আচার্যদের মধ্যে একজন হলেন শান্তিরক্ষিত। গোপালের রাজত্বকালে তাঁর জন্ম, ধর্মপালের রাজত্বকালে তাঁর মৃত্যু।

তিনি অন্তত তিনটি বৌদ্ধ তান্ত্রিক পুঁথির লেখক ; পুঁথিগুলির নাম—অষ্ট-তথাগতস্তোত্র, বজ্রধর-সঙ্গীত-ভাগবত-স্তোত্রটীকা, পঞ্চমহোপদেশ।

শান্তিরক্ষিত

তিব্বতী ঐতিহ্যে এই বজ্রযানী বৌদ্ধাচার্য শান্তিরক্ষিত ও মহাযানী নৈয়ায়িক দার্শনিক শান্তরক্ষিত একই লোক। নালন্দা মহাবিহারের অন্যতম আচার্য শান্তরক্ষিত সুপ্রসিদ্ধ তত্ত্বসংগ্রহ, বাদন্যায়বৃত্তি-বিপঞ্চিতার্থ এবং মধ্যমকালঙ্কার-কারিকা গ্রন্থের লেখক। তিব্বতী ঐতিহ্য মতে, শান্তিরক্ষিতের ভগ্নীপতি ছিলেন উড্ডীয়ানবাসী রাজকুমার পদ্মসম্ভব। শান্তিরক্ষিতের খ্যাতি ভারতের বাইরেও নাকি ছড়িয়ে পড়েছিল।

সরোরুহবজ্র, কমলশীল, শান্তিরক্ষিত, পদ্মসম্ভব—এঁরা সবাই প্রায় একই সময়ের লোক। সরোরুহবজ্রের অন্য নাম পদ্মবজ্র। তিনি হেবজ্র-তন্ত্রের একজন প্রধান আচার্য, অনঙ্গবজ্রের গুরু এবং ইন্দ্রভূতির গুরুর গুরু। তারনাথের মতে, সরোরুহবজ্রের সমসাময়িক ছিলেন কুক্কুরীপাদ ও কম্বলপাদ। কুক্কুরীপাদের জন্ম বাংলার এক ব্রাহ্মণ পরিবারে ; পরে বৌদ্ধ তন্ত্রধর্মে দীক্ষিত হন। তাঁর অন্য নাম সম্ভবত কুকুর-পা বা কুকুর-রাজ। তা যদি হয়, তাহলে তিনি আটটি তন্ত্রগ্রন্থের লেখক। কম্বলপাদ বা কম্বলাম্বরপদ প্রাচীন বাংলা ভাষায় কম্বল-গীতিকা নামে একটি দোঁহা-গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

সরোরুহবজ্র প্রভৃতি

অষ্টম শতকের শেষ কিংবা নবম শতকের গোড়াকার লোক ছিলেন শবরীপাদ বা শবরপাদ। বাংলার কোন এক পর্বতবাসী ব্যাধ বা শবর পরিবারে তাঁর নাকি জন্ম। তিনি প্রায় দশটি বজ্রযানী গ্রন্থের লেখক। চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ে শবরীপাদের লেখা দুটি বাংলা গান আছে। উড্ডীয়ানের রাজা ইন্দ্রভূতি ও তাঁর বোন কিংবা মেয়ে লক্ষ্মীঙ্করা বাংলাদেশে বজ্রযোগিনী সাধন প্রবর্তন করেন এবং দু'জনেই একাধিক পুঁথি লিখেছিলেন। তন্ত্রের টীকা-রত্নাবলীর লেখক কুমারচন্দ্র বোধ হয় এই যুগের একজন বাঙালী বৌদ্ধ আচার্য ছিলেন। ধর্মপালের সমসাময়িক বৃদ্ধকায়স্থ টঙ্কদাস বা ডঙ্কদাস সুবিশদসম্পুট নামে হেবজ্রতন্ত্রের একটি টীকা লিখেছিলেন। রসায়নাচার্য নাগার্জুন যখন পুণ্ড্রবর্ধনে রসায়ন ও ধাতু নিয়ে গবেষণা করছিলেন, তখন তাঁর প্রধান সহায়ক ছিলেন বরেন্দ্রীর নাগবোধি। নাগবোধি তেরোটি তন্ত্রগ্রন্থের রচয়িতা।

শবরীপাদ প্রভৃতি

এরপর একশো বছরের মধ্যে তেমন কোন বৌদ্ধ আচার্য-পণ্ডিতের দেখা পাওয়া যায় না। দশম শতকের শেষার্ধ থেকে দ্বাদশ শতকের প্রায় শেষ পর্যন্ত বৌদ্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞান সাহিত্য-সংস্কৃতির স্রোতে আবার নতুন ক'রে জোয়ার দেখা গেল।

বজ্রযানী-মহাযানী তান্ত্রিক আচার্যদের সঙ্গে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য ও নাথগুরুদের ধ্যানধারণার তফাত থাকলেও অন্তত গোড়ার দিকে জীবনযাত্রায় ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনায় তেমন কিছু তফাত ছিল না। কাজেই এই পর্বের বাঙালী বৌদ্ধ আচার্য-পণ্ডিতদের কথা বলতে গিয়ে মহাযানী-বজ্রযানী আলাদা করে বলবার দরকার নেই।

জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ জেতারি

জেতারি নামে দু'জন বৌদ্ধ আচার্য ছিলেন। জ্যেষ্ঠ জেতারি সম্ভবত দশম শতকের শেষার্ধের লোক। তাঁর বাড়ি ছিল বরেন্দ্রভূমে। শ্রীজ্ঞান দীপঙ্কর বা অতীশের তিনি অন্যতম গুরু ছিলেন। হেতু-তত্ত্বোপদেশ, ধর্মাধর্মবিনিশ্চয় ও বালাবতারতর্ক নামে বৌদ্ধ ন্যায়ের তিনটি গ্রন্থের তিনি লেখক। বোধিভাগ্য লাবণ্যবজ্রের গুরু কনিষ্ঠ জেতারিও বাঙালী ছিলেন। তিনি ঠিক কোন্ সময়ের লোক বলা যায় না।

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান

বাঙালী বৌদ্ধ মহাচার্যদের মধ্যে দীপঙ্কর-শ্রীজ্ঞানের নাম আজও বাংলাদেশের ঘরে ঘরে শুনতে পাওয়া যায়। তাঁর জন্মভূমি বঙ্গাল দেশের বিক্রমণিপুরে। আনুমানিক ৯৮০ খৃষ্টাব্দে গৌড়রাজ-পরিবারে তাঁর জন্ম। পিতার নাম কল্যাণশ্রী, মার নাম প্রভাবতী। তাঁর ছেলে-বেলাকার নাম ছিল চন্দ্রগর্ভ। যৌবনে তিনি ছিলেন জেতারির শিষ্য; কিছুদিন তিনি পশ্চিম-ভারতের কৃষ্ণগিরি-বিহার থেকে রাহুলগুপ্তের কাছে বৌদ্ধ ধ্যানে দীক্ষা নিয়েছিলেন; সেইখানেই তাঁর নামকরণ হয় গুহ্যজ্ঞানবজ্র। উনিশ বছর বয়সে ওদন্তপুরী-বিহারে আচার্য শীলরক্ষিতের কাছে দীক্ষা নেবার পর তাঁর নাম হয় দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। বারো বছর পর তিনি ভিক্ষুব্রতী হন এবং আচার্য ধর্মরক্ষিতের কাছে বোধিসত্ত্ব ব্রতে দীক্ষিত হন। তারপর তিনি সুবর্ণদ্বীপে চন্দ্রকীর্তির কাছে বৌদ্ধ শাস্ত্র পাঠ করে আরো বারো বছর কাটান। সেখান থেকে তিনি

তাম্রদ্বীপ বা সিংহল হয়ে মগধে ফিরে আসেন। এর পরই তিনি ধর্মপালের আহ্বানে বিক্রমশীল মহাবিহারে মহাচার্যের পদ গ্রহণ করেন। এই বিহারে থাকার সময় তিব্বতের বৌদ্ধ রাজপরিবার থেকে বার বার তাঁর কাছে তিব্বতে যাবার আমন্ত্রণ আসতে থাকে। শেষ পর্যন্ত দীপঙ্কর রাজী না হয়ে পারেনি।

হাতের কাজগুলো সেরে দীপঙ্কর তিব্বতে যাবেন বলে কথা দিলেন। এদিকে বিহারের ভিক্ষুসংঘ তখন নানা রকমের নৈতিক ও মানসিক শৈথিল্যে ভারাক্রান্ত; দীপঙ্কর না থাকলে তাদের সামলানো মুস্কিল। এ অবস্থায় দীপঙ্করকে ছেড়ে দিতে মহাবিহারের অধিনায়ক আচার্য রত্নাকর গোড়ায় কিছুতেই রাজী হননি। কিন্তু যেহেতু দীপঙ্কর কথা দিয়ে ফেলেছিলেন সেই জন্যে আচার্য রত্নাকর তিব্বতী আচার্য বিনয়ধরকে বলেছিলেন: "অতীশ না থাকলে ভারতবর্ষ অন্ধকার। বহু বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানের চাবিকাঠিই তাঁর হাতে; তিনি না থাকলে এই সব প্রতিষ্ঠান ফাঁকা হয়ে যাবে; চারদিকের অবস্থা দেখে মনে হয়, ভারতবর্ষের দুঃসময় ঘনিয়ে আসছে। অসংখ্য তুরস্ক সৈন্য ভারতবর্ষে চড়াও হচ্ছে; আমি খুবই বিচলিত বোধ করছি। তবু আশীর্বাদ করছি, অতীশকে নিয়ে সদলবলে তুমি দেশে ফিরে যাও। সমস্ত প্রাণীর কল্যাণে অতীশের সেবা ও কর্ম নিয়োজিত হোক।"

অধিনায়ক আচার্যের কাছ থেকে অনুমতি পেয়ে অতীশকে নিয়ে যে দলটি তিব্বতে রওনা হল, তাতে ছিলেন তিব্বতী আচার্য বিনয়ধর, তিব্বতী পণ্ডিত গ্যা-টসন্, পণ্ডিত ভূমিগর্ভ, এবং অপরান্তরাজ মহারাজ ভূমিসংঘ। রাস্তায় তাঁরা দু'দুবার ডাকাতের হাতে পড়লেন; গ্যা-টসন্ মারা গেলেন। নেপালরাজ অনন্তকীর্তির সঙ্গে দীপঙ্করের দেখা হয় এবং অনন্তকীর্তির পুত্র পদ্মপ্রভ তাঁর কাছে দীক্ষা নিয়ে তিব্বত যাত্রায় সঙ্গী হন। দীপঙ্কর তিব্বতে পৌছে রাজ-অভ্যর্থনা পেলেন। সারা তিব্বতে ঘুরে ঘুরে তিনি মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করে বেড়াতে লাগলেন। থো-লিং বিহার হল তাঁর ঘাঁটি। দীপঙ্কর প্রায় তেরো বছর তিব্বতে থাকার পর তিয়াত্তর বছর বয়সে আনুমানিক ১০৫৩ খৃষ্টাব্দে মারা যান।

বিক্রমশীল বিহারের একজন নামকরা আচার্য ছিলেন গৌড়ের জ্ঞানশ্রীমিত্র।

জ্ঞানশ্রীমিত্র ও অন্যেরা

গোড়ায় তিনি ছিলেন হীনযানী বৌদ্ধ, পরে মহাযানে দীক্ষা নেন। বৌদ্ধ ন্যায় সম্বন্ধে কার্যকারণভাবসিদ্ধি নামে প্রসিদ্ধ গ্রন্থের তিনি রচয়িতা।

রামপালের সমসাময়িক ছিলেন অভয়াকর গুপ্ত; তাঁর জন্ম ঝারখণ্ডে, বঙ্গাল দেশের এক ক্ষত্রিয় পরিবারে। তিনি প্রায় বিশটি বজ্রযানী গ্রন্থের লেখক। নয়পালের সমসাময়িক ছিলেন হেরুক-সাধনের লেখক দিবাকর চন্দ্র; দীপঙ্কর নাকি তাঁকে বিক্রমশীল বিহার থেকে বার করে দিয়েছিলেন। দিবাকরচন্দ্র নামে এক পণ্ডিত পাকবিধি নামে একটি সংস্কৃত পুঁথি লিখেছিলেন।

অতীশের অন্যতম শিক্ষাগুরু আচার্য রত্নাকরশান্তি অথবা শান্তিপাদ বাঙালী ছিলেন কিনা বলা কঠিন। তবে মহীপাল-জয়পালের সমসাময়িক হেরুক-সাধন-রচয়িতা কুমারবজ্র ছিলেন নিঃসন্দেহে বাঙালী।

উত্তর-বঙ্গের জগদ্দল-বিহারের দু'জন স্বনামধন্য পণ্ডিত হলেন দানশীল ও বিভূতিচন্দ্র। রাজপুত্র বিভূতিচন্দ্র ছিলেন একাধারে গ্রন্থকার, টীকাকার, অনুবাদক ও সংশোধক। বিভূতিচন্দ্র কিছুদিন নেপালে ও তিব্বতে ছিলেন; তিব্বতীতে তিনি অনেক বই অনুবাদ করেছিলেন। প্রায় ষাটখানা তন্ত্রগ্রন্থের তিব্বতী অনুবাদ করেছেন আচার্য দানশীল। কাপট্য-বিহারে অন্যতম বাঙালী আচার্য ছিলেন প্রজ্ঞাবর্মা। তন্ত্রশাস্ত্রের ওপর তিনি দুটি টীকা রচনা করেছিলেন এবং ধর্মকীর্তির হেতুবিন্দুপ্রকরণ নামে ন্যায়গ্রন্থের তিব্বতী অনুবাদ করেছিলেন। জগদ্দল-বিহারের আচার্য মোক্ষাকর-গুপ্ত তর্কভাষা নামে বৌদ্ধ ন্যায়ের ওপর একটি পুঁথি লিখেছিলেন। পুণ্ডরীক নামে উড্ডীয়ানবাসী এক রাজা আর্যমঞ্জুনামসঙ্গীতি-টীকার ওপর বিমলপ্রভা নামে একটি টীকা রচনা করেছিলেন। তাঁর অন্য নাম জ্ঞানবজ্র।

দানশীল, বিভূতিচন্দ্র ও অন্যেরা

সিদ্ধাচার্যদের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ, সেই লুই-পা বা লুইপাদ বোধহয় রামপালের সমসাময়িক। তিব্বতী ঐতিহ্যমতে, তিনিই আদিসিদ্ধ। চর্যাগীতি গ্রন্থে প্রাচীন বাংলায় লেখা তাঁর দুটি দোঁহা আছে। অনেকের মতে লুইপাদ ও মীননাথ বা মৎস্যেন্দ্রনাথ একই লোক। সমস্ত পূর্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গ জুড়ে এবং কামরূপে হঠযোগ, যোগিনী কৌলধর্ম এবং নাথধর্মকে কেন্দ্র করে যেসব সম্প্রদায় শত শত বছর ধরে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করেছে, তাদের প্রত্যেকের কাছেই লুইপাদ ও মৎস্যেন্দ্রনাথ হলেন আদিগুরু এবং একই লোক। মীননাথের অন্যতম পূর্বপুরুষ মীনপাদ। বাংলাদেশে তিনি শিবের অবতার হিসেবে প্রসিদ্ধ।

লুই-পা ও নাথযোগী সম্প্রদায়

বাংলাদেশে প্রচলিত কাহিনী অনুযায়ী মীননাথের শিষ্য গোরক্ষনাথ ছিলেন রাজা গোপীচন্দ্র বা গোবিন্দচন্দ্রের সময়কার লোক। গোরক্ষনাথ সম্পর্কে অনেক গল্প নেপালে, তিব্বতে, মধ্যদেশে মহারাষ্ট্রে, গুজরাটে, পাঞ্জাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। পাঞ্জাবের যোগীরা, বাংলার নাথযোগী, নাথপন্থীরা সবাই গোরক্ষনাথকে গুরু বলে স্বীকার করেন। গোরক্ষনাথের শিষ্য ছিলেন জালন্ধরীপাদ। জালন্ধরীপাদের শিষ্য সিদ্ধাচার্য বিরূ-পা বা বিরূপাদ। তিনি মগধের ক্ষত্রিয়রাজ মহাসিদ্ধ ডোম্বি-হেরুকের অন্যতম গুরু।

তিব্বতী ঐতিহ্যে বলা আছে যে, মহীপালের সমসাময়িক প্রসিদ্ধ সিদ্ধাচার্য তৈলিকপাদ বা তিলো-পা ছিলেন চাট্গাঁর ব্রাহ্মণ; বৌদ্ধধর্মে

তিলো-পা ও নাড়ো-পা

দীক্ষা নিয়ে তাঁর নাম হয় প্রজ্ঞাবর্মা বা প্রজ্ঞাভদ্র। তৈলিক-পাদের প্রধান শিষ্য নাড়ো-পা; তাঁর অন্য নাম জ্ঞানসিদ্ধ ও যশোভদ্র। তিনি জাতে ছিলেন শুঁড়ি। বৌদ্ধ আগমে ছিল তাঁর অসামান্য দখল।

লুই-পা ও গোরক্ষনাথের পরই যাঁর নাম করতে হয়, তিনি হলেন কৃষ্ণপাদ বা কাহ্ন-পা। তিনি ছিলেন নাথপন্থী ও সহজপন্থীদের একজন প্রধান আচার্য। পঞ্চাশটিরও বেশি গ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন; আর্যগীতি

কাহ্ন-পা প্রভৃতি

গ্রন্থে প্রাচীনতম বাংলাভাষায় লেখা তাঁর দশটি গীতি আছে। এছাড়া আরও অনেক সিদ্ধাচার্য ছিলেন। তার মধ্যে মাত্র কয়েকজনের উল্লেখ করা হচ্ছে। যেমন লুই-পা ও নাড়ো-পার শিষ্য দারিক বা দারিপাদ, লুই-পার এক বংশধর কিল-পা; বিরূ-পার এক বংশধর কর্মার বা কর্মরি ছিলেন একজন কর্মকার; বিরূ-পার আরেক বংশধর বীণাপাদ বা বীণা-পা খুব ভাল বীণা বাজাতেন; কাহ্ন-পার বংশধর ধর্মপাদ বা গুণ্ডারীপাদ; কম্বলপাদের একজন বংশধর ছিলেন কঙ্কণ; গর্ভাপাদ বা গর্ভরী-পা হেবজ্রের ওপর একটি গ্রন্থ এবং একটি বজ্রযান টীকা রচনা করেছিলেন।

এই যুগে শুধু বজ্রযানী সাধন, দোঁহা ও গীত রচনাই হয়নি, শুধু তন্ত্রধর্মেরই অনুশীলন হয়নি—এ যুগের আচার্য-পণ্ডিতেরা মহাযানী ন্যায়শাস্ত্র, বিশুদ্ধ বিজ্ঞানবাদী দর্শন নিয়েও আলোচনা করেছেন, কিছু কিছু মৌলিক চিন্তার প্রমাণও দিয়েছেন। ধর্মপালের সমসাময়িক হরিভদ্র, বুদ্ধশ্রীজ্ঞান বা বুদ্ধজ্ঞান-পাদ, জিনমিত্র, শান্তরক্ষিত, রত্নাকরশান্তি, জেতারি, দীপঙ্কর, অভয়াকরগুপ্ত, বোধিভদ্র, বিভূতিচন্দ্র প্রমুখ কেউ কেউ এই ধরনের মৌলিক কাজ করেছেন।

যেসব বিহার-মহাবিহারে বসে জ্ঞানবিজ্ঞানের এই একাগ্র সাধনা চলেছিল, পাল পর্বের আগে বিদেশী পর্যটকদের বিবরণ থেকে তার খানিকটা আভাস পাওয়া যায়। দেশের রাজারাজড়া, শহরের বড়লোকেরা বৌদ্ধ শ্রমণদের জন্যে বিহার তৈরি করে দিতেন এবং তার খরচ-খরচা চালানোর জন্য জমি, বাগান, ঘরবাড়ি দান করতেন। ভিক্ষুদের চাষবাস করার ব্যাপারে বুদ্ধের বারণ ছিল; তাই তাঁরা বিহার বা ভিক্ষুসংঘের জমি বিনা খাজনায় অন্যকে চাষ করতে দিতেন এবং তার বদলে তাঁরা উৎপন্ন ফসলের একটা ভাগ নিতেন। তার ফলে সাংসারিক ব্যাপার নিয়ে তাঁদের মাথা ঘামাতে হত না। বিহারগুলির নিষ্কর জমির আয় থেকে তাঁদের পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যবস্থা হত। তাছাড়া গৃহী ভক্ত ও উপাসকেরা তাঁদের নানারকম জিনিস দান করতেন। ভাতকাপড়ের ভাবনা ভাবতে হত না বলেই তাঁরা একাগ্রমনে ধর্মচর্চা ও জ্ঞানচর্চা করতে পারতেন। অন্যান্য বিষয় ছাড়াও এই সমস্ত বিহারে শব্দবিদ্যা, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ ইত্যাদির অনুশীলন হত। ভিক্ষু-শ্রমণেরা পুঁথি নকল ও অনুবাদ করতেন এবং বৌদ্ধ বজ্রযানী তান্ত্রিক দেবদেবীর ছবি আঁকতে শিখতেন। প্রত্যেক বিহারের নিজস্ব ছোটবড় গ্রন্থাগারও ছিল।

সোমপুরী-মহাবিহার ছিল অষ্টম শতকের বাংলার সব চেয়ে প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ বিহার। রাজশাহীর পাহাড়পুরে তারই ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। এই তিনতলা সুউচ্চ বিহার ওপর দিকে ক্রমশ সরু হয়ে উঠেছে। উত্তর দিকের প্রকাণ্ড চওড়া সিঁড়ি ধাপে ধাপে তিন তলায় উঠে গেছে। দোতলায় মন্দির-প্রকোষ্ঠ; সেখানে বিহারের অধিষ্ঠাতা দেবতার পুজো হত। তিনতলার ওপরে শিখরাকৃতি চূড়া। মন্দিরের চারপাশে চওড়া উঠোন; প্রত্যেক কোণে একটি করে মণ্ডপ। বিহার-মন্দিরের চারদিকে ভিক্ষুদের সবশুদ্ধ ১৭৭টি থাকবার ঘর।

সোমপুরী-বিহার ছাড়াও পাল আমলে আরও কয়েকটি এই রকমের ছোটবড় বিহার ছিল। যেমন: উত্তর বঙ্গে জগদ্দল-বিহার, দেবীকোট বিহার, বিক্রমপুরী-বিহার, চট্টগ্রামে পণ্ডিত-বিহার, ত্রিপুরায় কনকস্তূপ-বিহার ইত্যাদি।

প্রাচীনতম বাংলা ভাষা

নবম-দশম শতক নাগাদ বাংলাদেশে সংস্কৃত ছাড়া আরও দুটি ভাষা প্রচলিত ছিল—একটি হল শৌরসেনী অপভ্রংশ; অন্যটি মাগধী অপভ্রংশের স্থানীয় গৌড়-বঙ্গীয় রূপ—যাকে বলা যায় প্রাচীনতম বাংলাভাষা। একই লেখক এই দুই ভাষাতেই পদ, দোঁহা ও গীত রচনা করতেন। শ্রোতা এবং পাঠকেরাও দুই ভাষাই বুঝতে পারতেন। নবম-দশম শতকের আগে এই লোকায়ত ভাষার কী রূপ ছিল তা জানবার কোন উপায় নেই। একেবারে নতুন গড়ে ওঠবার মুখে বাংলা ভাষার কী রূপ ছিল, তার নমুনাও খুব বেশি নেই। সমাজের শিক্ষিত উচ্চস্তরে সংস্কৃতের ছিল একচ্ছত্র প্রভাব। এমন কি মধ্যযুগে চৈতন্যদেবের সময়েও বেশির ভাগ জ্ঞাণীগুণীরা সংস্কৃত ভাষাতেই জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন-সাহিত্যের চর্চা করেছেন। লোকায়ত ভাষা তখনও তেমন আমল পায়নি। পাল চন্দ্র পর্বে তান্ত্রিক ও বজ্রযানী আচার্যেরা যে এক ধরনের প্রাকৃতধর্মী 'বৌদ্ধ সংস্কৃতে'র প্রচলন করেছিলেন, দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকে তারও ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে একেবারে বিশুদ্ধ ব্যাকরণসম্মত সংস্কৃত লেখা হতে লাগল। ইসলাম-প্রভাবে প্রভাবান্বিত কিছু লোক বোধ হয় বাংলার কোথাও কোথাও সেই প্রাকৃতধর্মী বৌদ্ধ সংস্কৃতের ধারা অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন; সেক-শুভোদয়া গ্রন্থের ভাষায় তার কিছুটা আভাস পাওয়া যায়।

যে বাংলা ভাষা সবে মাত্র গড়ে উঠেছিল, তার প্রতি রাষ্ট্র কিংবা শিক্ষিত উচ্চ স্তরের লোকেরা কোন দরদ কিংবা দাক্ষিণ্য দেখায়নি। তাই সে ভাষার সামান্য কিছু নমুনাও এতদিন আমাদের চোখের আড়াল হয়ে ছিল।

খুব বেশিদিন আগের কথা নয়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল থেকে চারটি প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করে আনেন: চর্যাচর্যবিনিশ্চয়, সরহপাদের দোঁহা, কাহ্নপাদের দোঁহা ও ডাকার্ণব। এই পুঁথিগুলির মধ্যে প্রথমটিতে আছে প্রাচীনতম বাংলা ভাষার নমুনা। শেষের তিনটি শৌরসেনী অপভ্রংশে লেখা। চর্যাচর্যবিনিশ্চয় বা চর্যাগীতির গানগুলিতে যে বাগ্‌ভঙ্গি ও ব্যাকরণরীতি দেখা যায় তা পুরোপুরি বাংলা; বাংলা ভাষায় তা স্বীকৃত ও প্রচলিত। এর মধ্যে এমন অনেক প্রবাদ আছে যা আজও লোকমুখে শুনতে পাওয়া যায়। তাছাড়া বাংলাদেশের নদনদী, নৌকোর নানা উপমা এইসব গানের মধ্যে ছড়ানো। চর্যাগীতির

চর্যাগীতি

কবিরা সবাই সিদ্ধাচার্য এবং সবাই প্রায় বাঙালী। গীতগুলি লেখা মাত্রাবৃত্ত ছন্দে ; পংক্তির শেষে মিল। চর্যাগীতির ছন্দ থেকেই বাংলা পয়ার বা লাচাড়ী এসেছে। যদিও বৌদ্ধ সহজ-সাধনার গূঢ় রহস্য ফুটিয়ে তোলবার জন্যেই গানগুলি লেখা হয়েছিল, তা সত্ত্বেও এর মধ্যে এমন বহু পদ আছে যা ধ্বনি, ব্যঞ্জনা ও চিত্রগৌরবের দিক থেকে অসামান্য। তার নমুনা এ বইয়ের বিভিন্ন অধ্যায়ের একাধিক উদ্ধৃতির মধ্যে পাওয়া যাবে। চর্যাগীতির ভাষা কেমন ছিল, তার কিছুটা আভাস দেবার জন্যে এখানে মাত্র দুটি পদ তুলে দেওয়া হল:

তিন না চ্ছুপই হরিণা পিবই ন পাণী।
হরিণা হরিণীর ণিলয় ণ জাণী॥
হরিণী বোল তঅ সুণ হরিণা তো॥
এ বন চ্ছাড়ি হোহ ভান্তো॥

ভয়ে হরিণ তৃণ ছোঁয় না, জলও খায় না। হরিণ জানে না হরিণীর কোথায় আস্তানা। হরিণী বলে: শোনো হরিণ, এ-বন ছেড়ে ভ্রান্ত হয়ে চলে যাও।

উঁচা উঁচা পাবত তহি বসই সবরী বালী
মোরঙ্গী পীচ্ছ পরহিণ গুঞ্জরী মালী॥
উমত সবরো পাগল মা কর গুলী গুহাড়া তোহোরি।
নিঅ ঘরণী নামে সহজ সুন্দরী॥
নানা তরুবর মৌউলিল রে গঅণত লাগেলী ডালী।
একেলী সবরী এ বন হিণ্ডই কর্ণকুণ্ডল বজ্রধারী॥
তিঅ ধাউ খাট পাড়িলা সবরো মহাসুখে সেজি ছাইলী।
সবর ভুজঙ্গ নৈরামণি দারী পেহ্ম রাতি পোহাইল॥

উঁচু উঁচু পাহাড়, তাতে শবরী বালিকার বাস। পরনে তার ময়ূরপুচ্ছের কটিবাস, গলায় কুঁচের মালা। ওরে উন্মত্ত শবর, পাগল শবর, গোল করিস্‌নে, পায়ে পড়ি তোর। আমি তোরই ঘরণী, নাম আমার সহজ সুন্দরী। গাছে ধরেছে কুঁড়ি, ডালগুলো আকাশ ছুঁয়েছে। কর্ণকুণ্ডল বজ্রধারী শবর একা একা এ-বনে ঘুরে বেড়ায়। শবর পাতে তিন ধাতুর খাট ; মহাসুখে বিছায়শয্যা। শবর ভুজঙ্গ ও নৈরাত্মা স্ত্রী—উভয়ে প্রেমরাত্রি যাপন করে।

সরহ ও কাহ্নের দোঁহা লেখা হয়েছিল পশ্চিম ও উত্তর-ভারতীয় শৌরসেনী

অপভ্রংশে। এর ভাষা ঠিক বাংলা না হলেও প্রাচীনতম বাংলা সাহিত্যের ধারার সঙ্গে তার নিকটসম্পর্ক। চর্যাগীতির মাঝে মাঝে যেমন শৌরসেনী অপভ্রংশ এবং মৈথিলীর প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়, তেমনি দোঁহাগুলির মধ্যেও বাংলা ও মৈথিলীর খানিকটা প্রভাব আছে। সরহপাদের একটি দোঁহায় দিগম্বর জৈন সন্ন্যাসীদের ঠাট্টা করে বলা হয়েছে :

দোঁহা

জই নগ্‌গা বিঅ হোই মুত্তি তা সুণহ সিআলহ।
লোম উপাড়ণেঁ অত্থি সিদ্ধি তা জুবই নিঅম্বহ॥
পিচ্ছী গহণে দিঠ্‌ঠ মোক্‌খ তা মোরহ চমরহ।
উঞ্ছে ভোঅণে হোই জাণ তা করিহ তুরঙ্গ হ॥

উলঙ্গ হলেই যদি মুক্তি পাওয়া যেত, তাহলে কুকুর-শেয়ালেরাও তো মুক্তপুরুষ। লোম উপড়ালেই যদি সিদ্ধিলাভ হত, তাহলে তো যুবতীর নিতম্বও সিদ্ধি লাভ করত ; পুচ্ছ ধারণে যদি মোক্ষ হয়, তাহলে তো ময়ূরের চামরও মোক্ষ পেত। উচ্ছিষ্ট ভোজন করলে যদি জ্ঞান লাভ করা যেত, তাহলে হাতী-ঘোড়ারাও হত জ্ঞানীপুরুষ।

ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যেও যে সে সময়ে বাংলা ভাষার ছোঁয়াচ একেবারে লাগেনি এমন নয়। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে রাধা-কৃষ্ণ কাহিনীর কয়েকটি নামের ক্রমান্বয়ে যে রূপান্তর দেখা যায়, তার মধ্যেই এর ইঙ্গিত স্পষ্ট। সংস্কৃত থেকে প্রাকৃত, প্রাকৃত থেকে অপভ্রংশ মারফৎ প্রাচীন বাংলার এইসব নামের রূপান্তর হয়েছে। যেমন : কৃষ্ণ-কাহ্ন-কানু বা কানাই ; রাধিকা-রাহী-রাই ; অভিমন্যু-অহিবণ্ণু বা অহিমণ্ণু-আইহন-আইমন—আয়ান। এ থেকে এও বোঝা যায় যে, কৃষ্ণ-রাধিকার কাহিনী তুর্কী বিজয়ের অনেক আগেই বাংলাদেশে প্রসার লাভ করেছিল।

রাধা-কৃষ্ণ

শব্দ ও ব্যাকরণের দিক থেকে জয়দেবের গীত-গোবিন্দ সংস্কৃতে লেখা হলেও তার ছন্দ, রীতি, ভঙ্গি ও প্রাণবস্তু সে যুগের লোকায়ত স্থানীয় ভাষার কথাই মনে করিয়ে দেয়। প্রাচীনতম বাংলা ভাষা বা শৌরসেনী অপভ্রংশের সঙ্গে তার সম্পর্ক থাক না থাক, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে তার সম্বন্ধ খুব ঘনিষ্ঠ। কেননা একদিকে যেমন চর্যাগীতি, অন্যদিকে তেমনি গীতগোবিন্দের ধারাতেই বৈষ্ণব-পদাবলী লেখা হয়েছিল।

গীতগোবিন্দ

চতুর্দশ শতকের শেষাশেষি অপভ্রংশ ভাষায় লেখা গীতি-কবিতার একটি সংকলন করা হয়। প্রাকৃত ছন্দের বিভিন্ন রূপ ও প্রকৃতির কিছুটা নমুনা দেওয়াই ছিল এই সংকলনের উদ্দেশ্য। এর মধ্যে একাদশ থেকে

অপভ্রংশ

চতুর্দশ শতকের শৌরসেনী অপভ্রংশে লেখা কয়েকটি এমন পদ আছে যার মধ্যে কিছু কিছু বাংলা শব্দ ও ধরন-ধারন দেখা যায়। যেমন :

সো মহ কন্তা দূর দিগন্তা।
পাউস আএ চেউ চলাএ॥

সেই আমার কান্ত গেছে দূর দিগন্তে; প্রাবৃষ (বর্ষা) আসন্ন, মন আমার স্থির থাকছে না।

একটি শ্লোকে আছে পার্বতীর দরিদ্র সংসারের ছবি :

বাল কুমারো ছঅ মুণ্ডধারী,
উবাঅহীণা মুই এক্ক নারী।
অহংণিসং খাই বিসং ভিখারী
গঈ ভবিত্তী কিল কা হমারী॥

ছয়মুণ্ডধারী আমার শিশুপুত্র ছয় মুখে খায়; একা আমি উপায়হীনা নারী। আমার ভিখারী স্বামী দিনরাত বিষ খায় : কী যে গতি হবে আমার!

ডাক ও খনার যেসব বচন বাংলাদেশে আজও প্রচলিত, তাও সম্ভবত তুর্কী আমলের আগেকার বাংলা সমাজের চল্‌তি প্রবাদ। শুভঙ্করের আর্যাতেও অপভ্রংশের প্রভাব স্পষ্ট।

মধ্য যুগের চণ্ডীমঙ্গল-মনসামঙ্গল কাব্যে চাঁদসদাগর-লখীন্দর-বেহুলা-ধনপতি-লহনা-খুল্লনা-শ্রীমন্ত-কালকেতুর যে গল্প, গোপীচাঁদের গানে রাজা গোপীচন্দ্র-লাউসেন-ময়নামতী বা মদনাবতী-অদুনা-পদুনার যে গল্প—তার অনেক কিছুই সম্ভবত তুর্কী আক্রমণের আগেই বাংলাদেশে প্রচলিত ছিল। মনসা-মঙ্গলে সামুদ্রিক বাণিজ্যের যে সমৃদ্ধির ছবি পাওয়া যায়, সে সমৃদ্ধি মোটেই মধ্য যুগে ছিল না। তাছাড়া তাতে মনসার যে প্রতাপ দেখা যায়, তা নবম-দশম-একাদশ-দ্বাদশ শতকের আগে হওয়াই স্বাভাবিক। মনে হয়, এসব কাহিনী তুর্কী আমলের শত শত বছর আগেই বাংলার লোক-সমাজে প্রচলিত ছিল; পরে মধ্যযুগে সেই সব কাহিনীই এই সব কাব্যে স্থান পেয়েছে। কাঠামোটা পুরনো; শুধু মাত্র তার ওপর মধ্যযুগের পলেস্তারা পড়েছে।

বাংলাদেশে সংস্কৃত সাহিত্যে সোনার ফসল ওঠে দ্বাদশ শতকের সেন-বর্মণ পর্বে। এই পর্বে এসে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতির ভোল একেবারে বদলাতে শুরু করে। বৌদ্ধ জ্ঞানবিজ্ঞান, বৌদ্ধ ধর্ম আর জীবনাদর্শকে কোণঠাসা করে রাস্তা জুড়ে সামনে এসে দাঁড়াল ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি, ব্রাহ্মণ্য ধ্যানধারণা। পালপর্বের শেষের দিকেই তার পদধ্বনি শোনা যাচ্ছিল, সেন-বর্মণ পর্বে তার প্রবল প্রতাপ চোখে পড়ল। বৌদ্ধ সংঘ-বিহার, অবৈদিক-অপৌরাণিক জ্ঞানবিজ্ঞান ও শিক্ষা-দীক্ষার চর্চা দেশ থেকে একেবারে উঠে গেল এমন নয়—টিম্ টিম্ করে ছোট্ট গণ্ডির মধ্যে বেঁচে থাকল। ঠিক একই দশা হল প্রাকৃতধর্মী 'বৌদ্ধ সংস্কৃতে'র, প্রাচীনতম উঠ্তি বাংলা ভাষার আর শৌরসেনী অপভ্রংশের গৌড়-বঙ্গীয় স্থানীয় চেহারার।

সেন-বর্মণ পর্ব

হরিবর্মা, বল্লালসেন, লক্ষ্মণসেন—এই তিন রাজার আমলেই এ-পর্বের যত কিছু গ্রন্থ রচনা। সমস্ত গ্রন্থই প্রায় জ্যোতিষ-মীমাংসা-ধর্মশাস্ত্র-স্মৃতিশাস্ত্র নিয়ে লেখা এবং সেই সঙ্গে কিছু আছে ব্রাহ্মণ্য-ঐতিহ্যে ভরপুর মামুলি রীতিতে লেখা কাব্য-নাটক। ব্যাকরণে, ন্যায়বৈশেষিক দর্শনে, বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদের আলোচনায়, তান্ত্রিক দর্শনে, বাঙালীর নিজস্ব নতুন সাহিত্যরীতির প্রবর্তন ও প্রচলনে এতদিন সারা ভারতবর্ষে যে বাংলাদেশের এত নাম ছিল, সেন-বর্মণ আমলে সেদিকে তেমন কোন চেষ্টা দেখা গেল না। কবিকল্পনার ক্ষেত্রে অবশ্য ত্রয়োদশ শতকের গোড়ার দিকে পর্যন্ত কিছুটা প্রাণবন্ততা ছিল, কিন্তু তারও না ছিল তেমন গভীরতা, না ছিল তেমন বিস্তার।

ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি

বৈদিক শাস্ত্রের চর্চা থাক না থাক, বাংলাদেশে মীমাংসার চর্চা ছিল। ভবদেব ভট্ট ছিলেন এই যুগে ধর্মশাস্ত্রের একজন প্রসিদ্ধ লেখক। তাঁর বাড়ি ছিল রাঢ়দেশের সিদ্ধল গ্রামে। তিনি ছিলেন সামবেদীয় কৌঠুমশাখাধ্যায়ী সাবর্ণগোত্রীয় ব্রাহ্মণ। তাঁর পিতামহ ছিলেন বঙ্গরাজ আদিদেবের সান্ধিবিগ্রহিক, পিতার নাম গোবর্ধন; মা সাঙ্গোকা। ভবদেব নিজে ছিলেন হরিবর্মা এবং সম্ভবত হরিবর্মার পুত্রেরও মহাসান্ধিবিগ্রহিক মন্ত্রী। একদিকে যেমন রাষ্ট্রযন্ত্রে ছিল তাঁর প্রবল প্রতাপ, তেমনি তিনি ছিলেন সে যুগের একজন জাঁদরেল শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। ব্রহ্মাদ্বৈত দর্শনের তিনি প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাতা, কুমারিল-ভট্টের মীমাংসাগ্রন্থের তিনি টীকাকার। বৌদ্ধদের তিনি ঘোরতর শত্রু, পাষণ্ড-বৈতণ্ডিকদের তর্কে পরাস্ত

ধর্মশাস্ত্র

করতে তিনি ওস্তাদ। অর্থশাস্ত্র, আয়ুর্বেদ, তন্ত্র, গণিত, সিদ্ধান্তে তাঁর অসামান্য দখল ; জ্যোতিষে, ফল-সংহিতায় তিনি ছিলেন দ্বিতীয় বরাহ। তাঁর লেখা হোরাশাস্ত্রের কোন পুঁথি আজও পাওয়া যায়নি। ব্যবহারতিলক, প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণ, ছান্দোগ্যকর্মানুষ্ঠান পদ্ধতি (বা দশকর্ম পদ্ধতি)—ধর্মশাস্ত্র-সম্পর্কিত অন্তত এই তিনটি গ্রন্থ তাঁরই লেখা।

ধর্মশাস্ত্র-রচয়িতা জীমূতবাহনের বাড়ি সম্ভবত রাঢ়দেশে। খুব সম্ভব তিনি দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকের লোক। কালবিবেক, ব্যবহারমাতৃকা, দায়ভাগ—অন্তত এই তিনটি গ্রন্থের তিনি লেখক। কালবিবেকে আছে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের নানা পুজো-আর্চা, শুভকর্ম, আচার, ধর্মোৎসব ইত্যাদি পালনের কালাকাল, সৌরমাস ইত্যাদির আলোচনা। ব্যবহারমাতৃকায় আছে ব্যবহারের সংজ্ঞা, বিচারকের গুণাগুণ ও কর্তব্য, নানাবিধ ধর্মাধিকরণ, ধর্মাধিকরণ-সভ্যদের কর্তব্য, বিচারপ্রার্থীর আবেদন, জামীন, প্রমাণ, মানুষী ও দৈবী নানারকমের সাক্ষ্য, বিচার ও রায় ইত্যাদির আলোচনা। মিতাক্ষরা-বহির্ভূত হিন্দু সমাজে দায় বা উত্তরাধিকার, সম্পত্তিবিভাগ এবং স্ত্রী-ধন সম্পর্কে জীমূতবাহনের লেখা দায়ভাগ আজও এ বিষয়ে একমাত্র প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃত।

ধর্মাধ্যক্ষ অনিরুদ্ধ ছিলেন বরেন্দ্রীর অন্তর্গত চম্পাহট্টের লোক। তিনি থাকতেন গঙ্গাতীরে বিহার-পাটকে। তাঁর বিখ্যাত দুটি গ্রন্থ—হারলতা ও পিতৃদয়িত। হারলতায় আছে অশৌচ সম্পর্কে এবং পিতৃদয়িতে আছে শ্রাদ্ধাদি বিষয়ে আলোচনা। বল্লালসেন অনিরুদ্ধের কাছেই পুরাণ ও স্মৃতিশাস্ত্রে শিক্ষা লাভ করেছিলেন।

বল্লালসেন অন্তত চারটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন—আচারসাগর, প্রতিষ্ঠাসাগর, দানসাগর ও অদ্ভুতসাগর। গ্রহতারা, রামধনু, বজ্র, বিদ্যুৎ, মরু, ভূমিকম্প এবং এ ছাড়া অন্যান্য বায়বীয় ও ভৌতিক নানা ইঙ্গিত ও লক্ষণের আলোচনা আছে অদ্ভুতসাগরে। তাঁর এই অসম্পূর্ণ বিরাট গ্রন্থটির লেখা শেষ করেন তাঁর পুত্র লক্ষ্মণসেন।

হলায়ুধের পূর্ববর্তী ছান্দোগ্যমন্ত্রভাষ্যের লেখক গুণবিষ্ণু বাঙালী কিংবা মৈথিলী ছিলেন। হলায়ুধ ছিলেন প্রথম যৌবনে রাজপণ্ডিত, পরিণত যৌবনে লক্ষ্মণসেনের মহামাত্য এবং প্রৌঢ় বয়সে ধর্মাধ্যক্ষ, আবস্থিক ও মহাধর্মাধ্যক্ষ। হলায়ুধও ছিলেন এই পর্বের একজন সেরা পণ্ডিত ও জবরদস্ত লোক। তার পিতা বৎস-গোত্রীয় ব্রাহ্মণ ধনঞ্জয়, মা উজ্জ্বলা। ধনঞ্জয় ছিলেন ধর্মাধ্যক্ষ।

হলায়ুধের দুই বড় ভাই ঈশান ও পশুপতি; ঈশান আহ্নিক-পদ্ধতি এবং পশুপতি শ্রাদ্ধপদ্ধতি ও পাকযজ্ঞ নামে গ্রন্থের লেখক। হলায়ুধের পাঁচটি গ্রন্থ: ব্রাহ্মণসর্বস্ব, মীমাংসাসর্বস্ব, বৈষ্ণবসর্বস্ব, শৈবসর্বস্ব ও পণ্ডিতসর্বস্ব।

দর্শনগ্রন্থ রচনার চেষ্টা দেখা না গেলেও এই পর্বে ব্যাকরণ ও কোষগ্রন্থ, রচনার কিছুটা চেষ্টা হয়েছিল। কোষকার পুরুষোত্তমের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ত্রিকাণ্ডশেষ।

ব্যাকরণ ও কোষগ্রন্থ।

অমরকোষে যা বাদ পড়ে গিয়েছিল পুরুষোত্তম তাঁর এই গ্রন্থে তা পূরণ করেছিলেন। তিনি আরও অন্তত তিনটি পুঁথি লিখেছিলেন—হারাবলি, বর্ণদেশনা ও দ্বিরূপকোষ। সাধারণত অব্যবহৃত প্রতিশব্দ ও সমশব্দের সংগ্রহ হারাবলিতে। শেষোক্ত দুটি বই বিভিন্ন শব্দের বানান সম্পর্কে।

দুজনেই বৌদ্ধ ও সমসাময়িক, দুজনেরই নাম এক হলেও বৈয়াকরণিক পুরুষোত্তমদেব ও কোষকার পুরুষোত্তম এক লোক কিনা ঠিক বলা যায় না। একাদশ শতকের শেষভাগে অমরকোষের টীকায় বহু জায়গায় বাঙালী বৈয়াকরণিক ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর উল্লেখ পাওয়া যায়।

সর্বানন্দের টীকাসর্বস্ব গ্রন্থ বাংলার গৌরব। প্রচুর বাংলা দেশী শব্দের এইটিই সবচেয়ে প্রাচীন গ্রন্থ। এর যা কিছু পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে, সবই দক্ষিণ ভারতে।

এই পর্বে জ্ঞানবিজ্ঞানের যেটুকু চর্চা হয়েছে, সবই সমাজের ওপরতলায়। ধর্মশাস্ত্র নিয়ে যাকিছু লেখা হয়েছে সবই ব্রাহ্মণবর্ণের দিকে তাকিয়ে। ব্যাকরণ ও কোষগ্রন্থেও মোটামুটি ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাদীক্ষারই ছাপ দেখতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থার মত বিহারে-সংঘারামে এই শিক্ষা সংঘবদ্ধভাবে দেওয়া হত না। একা একা ব্যক্তিগতভাবে গুরুর বাড়িতে গিয়ে শিক্ষা নিতে হত। পঠন-পাঠনের বিষয়গুলিও খুব সীমাবদ্ধ—শুধুমাত্র বোধহয় মীমাংসা, স্মৃতি, গৃহ্যসূত্র, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ আর ফলসংহিতা। না শস্ত্রবেদ, না আয়ুর্বেদ, না দর্শন, না অর্থশাস্ত্র। যে ন্যায়শাস্ত্রে বাংলার এত নাম, তাও এই পর্বে গড়ে ওঠেনি। এই পর্বের দৌড় টীকা-টিপ্পনী পর্যন্ত।

কাব্য-নাটক

সে তুলনায় সংস্কৃত গীতিকাব্যে এ যুগের বাঙালী কবিদের দান শুধু সংখ্যা নয় কাব্যের দিক থেকে কিছুটা উল্লেখযোগ্য।

নৈষধচরিতের লেখক শ্রীহর্ষ বাঙালী কিনা এ নিয়ে নানা পণ্ডিতের নানা মত আছে। তবে কাব্যের গৌড়ী-রীতি দেখে মনে হয় তিনি বাঙালী ছিলেন। তাঁর অনুপ্রাসপ্রিয়তা, শব্দ নিয়ে লেখা, 'য' আর 'জ' গুলিয়ে ফেলা

ছাড়াও তাঁর কাব্যে বাঙালী জীবনের নানা আচার-ব্যবহার রুচি ও অভ্যাসের ছবি ফুটে উঠেছে। তাছাড়া টীকাকারেরা সবাই তাঁকে বাঙালী বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু নৈষধচরিতে বহ্বাড়ম্বরই বেশি। সূক্ষ্মচিন্তা ও গভীর জীবনদর্শনের পরিচয় এ কাব্যে নেই। নবসাহসাংক-চরিত, স্থৈর্যবিচার-প্রকরণ, অর্ণব-বর্ণনা, শিবশক্তি-সিদ্ধি, ছন্দ-প্রশস্তি, শ্রীবিজয়-প্রশস্তি এবং দর্শন বিষয়ে খণ্ডন-খণ্ড-খাদ্য নামে গ্রন্থগুলি তিনি রচনা করেছিলেন। বেণীসংহার-রচয়িতা ভট্ট-নারায়ণ এবং অনর্ঘরাঘব-রচয়িতা মুরারী মিশ্রকে অনেকে বাঙালী বলে দাবি করে থাকেন।

এই সময়কার বাঙালী কবিমনের সত্যিকার পরিচয় পাওয়া যায়, ১২০৬ খৃষ্টাব্দে সংকলিত সদুক্তিকর্ণামৃত গ্রন্থটিতে। এর সংকলয়িতা-সম্পাদক হলেন লক্ষ্মণসেনের অন্যতম মহাসামন্ত শ্রীবটুদাসের পুত্র শ্রীধরদাস। পাঁচটি প্রবাহে এই গ্রন্থটি বিভক্ত; প্রত্যেকটি প্রবাহে কয়েকটি করে 'বীচি' বা তরঙ্গ, প্রত্যেকটি বীচিতে পাঁচটি করে শ্লোক। এই সংকলনে ৪৮৫ জন কবির রচনা আছে; এর মধ্যে বহুসংখ্যক হলেন বাঙালী। গৌড়-বঙ্গীয় এইসব বাঙালী কবিদের শ্লোকে আছে সে সময়কার বাংলাদেশের জলমাটি, মানুষের স্পর্শ— রাজসভায় লেখা স্তুতি-প্রশস্তিতে বা কাব্যে যা আদৌ পাওয়া যায় না। এই সংকলনে যেসব বাঙালী কবি স্থান পেয়েছেন, তাঁদের মধ্যে আছেন শরণ, উমাপতি-ধর, জয়দেব, গোবর্ধনাচার্য, ধোয়ী-কবিরাজ, লক্ষ্মণসেন, কেশবসেন, জলচন্দ্র, যোগেশ্বর, বৈদ্য গঙ্গাধর, বেতাল, ব্যাস-কবিরাজ, কেবট, পপীপ চন্দ্রচন্দ্র, গাঙ্গোক, বিশ্বোক, শুঙ্গোক, মধু প্রভৃতি।

সেন-রাজসভায় পঞ্চরত্ন ছিলেন কবি শরণ, ধোয়ী, গোবর্ধন, উমাপতি-ধর ও জয়দেব।

শরণ ও ধোয়ী-কবিরাজের প্রত্যেকের ২০টি করে শ্লোক আছে সদুক্তি-কর্ণামৃত গ্রন্থে। অল্প সময়ের মধ্যে দুরূহ শ্লোক বাঁধতে পারতেন বলে শরণের প্রশংসা করেছেন কবি জয়দেব। প্রসিদ্ধ পবনদূত-কাব্যের লেখক ধোয়ী-কবিরাজ। কালিদাসের মেঘদূতের অনুসরণে পরবর্তীকালে যত দূতকাব্য লেখা হয়েছে, তার মধ্যে পবনদূত-কাব্য প্রাচীনতম।

দেওপাড়া-প্রশস্তির এবং সম্ভবত সাধাইনগর লিপিরও রচয়িতা ছিলেন সেন রাজসভার অন্যতম সভাকবি উমাপতি-ধর। লক্ষ্মণসেন থেকে শুরু করে বিজয়সেনের আমল পর্যন্ত তিন পুরুষ ধরেই তিনি সেন-রাজসভার

সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বখ্‌ত্‌-ইয়ারের নবদ্বীপ আক্রমণের পর লক্ষ্মণসেন যখন পূর্ববঙ্গে পালিয়ে গেলেন, সেন-রাজসভায় বয়োবৃদ্ধ এই কবিটি তখন চক্ষুলজ্জার বালাই না রেখে বিজয়ী ম্লেচ্ছরাজের স্তুতিবাদ করে শ্লোক রচনা করেছিলেন। আর্যা-সপ্তশতীর কবি হিসেবে গোবর্ধনাচার্যের নাম সে সময়ে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই কাব্য রচনার কাজে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন তাঁর দুই ভাই উদয়ন ও বলভদ্র। গোবর্ধন সুদক্ষ কবি ও সুপণ্ডিত ছিলেন বলেই আচার্য উপাধি লাভ করেছিলেন।

এ-যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি জয়দেব। সারা ভারতে তাঁর যেমন নাম, তেমনি সম্মান। জয়দেবের পিতার নাম ভোজদেব, মার নাম রামাদেবী। কেন্দুবিল্ব (বর্ধমানে অজয়-নদের তীরে কেঁদুলি গ্রাম) তাঁর জন্মস্থান। স্ত্রীর নাম বোধহয় পদ্মাবতী। তিনি ছিলেন গীতবাদ্য-নিপুণা। জয়দেবের প্রিয় বন্ধু এবং গানের দোহার ছিলেন পরাশর। উত্তর-ভারতে জয়দেবের সম্পর্কে নানা জনশ্রুতি আছে। জয়দেবের গীতগোবিন্দ এত জনপ্রিয় হবার প্রধান কারণ তাঁর গীতগুলির ভাষা একদিকে প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যের ভাষা, অন্যদিকে সে সময়কার অপভ্রংশ ভাষা-কাব্যের ভাষা—জয়দেব এই দুটি ভাষাকে মিলিয়েছিলেন। তাঁর আখ্যান কিংবা বর্ণনা ভাবে, ভাষায়, শব্দে সংস্কৃত কাব্যের ধারা অনুসরণ করে চলেছে, কিন্তু গীতাংশের পুরো আবহাওয়াটা অপভ্রংশ ও ভাষা-কাব্যের—ছন্দ ও মিলের দিক থেকেও। লোকায়ত চলিত ভাষা-সাহিত্য থেকেই এই রূপটি তিনি গ্রহণ করেছিলেন। জয়দেবের সময়ে সংস্কৃত কাব্য ও নাট্য সাহিত্যের দশা ছিল বদ্ধ ডোবার মত। জয়দেবই বোধহয় প্রথম সেই সাহিত্যে লোকায়ত চলিত সাহিত্যের গান ও গীতিনাট্যের খাত কেটে নতুন স্রোত বইয়ে দিলেন।

একাদশ-দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকের বাংলাদেশে নাটক লেখার চলন ছিল বলেই মনে হয়। লোকায়ত সমাজে এই গান ও অভিনয় নিয়ে এক ধরনের যাত্রা হত। এইযুগে যেসব নাটক লেখা হয়েছে, তার অধিকাংশেরই আখ্যান-বস্তু রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ থেকে নেওয়া। বাঙালী নাট্যকারদের লেখা এইসব নাটকগুলির মধ্যে কয়েকটির নাম পাওয়া যায়: কীচকভীম, প্রতিজ্ঞা-ভীম, শর্মিষ্ঠা-পরিণয়, রাধা, সত্যভামা, কেলি-রৈবতক, উষাহরণ, দেবীমহাদেব, উর্বশী-মর্দন, নলবিজয়, মায়া-মদালসা, উন্নত চন্দ্রগুপ্ত, মায়া-কাপালিক, মায়া-শকুন্ত, জানকী-রাঘব, রামানন্দ, কেকয়ী-ভারত, অযোধ্যা-ভারত, বালিবধ, রামবিক্রম, মারীচ-বঞ্চিতক ইত্যাদি।

নাচ-গান-ছবি

লোকায়ত ধারা

মানুষ যখন গুহায় বাস করত, তখন সে পাথরের গায়ে ছবি এঁকেছে, শুকনো পাতায় আগুন জ্বালিয়ে তার চারপাশে তালে তালে সুখদুঃখের গান গেয়েছে, নেচেছে। হাজার হাজার বছর পেরিয়ে আজও গুহার গায়ে সে সব ছবি, আদিবাসী সমাজের নৃত্যগীতে আজও সেই সব ছন্দ, সেই সব সুরের প্রতিধ্বনি বেঁচে আছে। চোখে দেখে কানে শুনে সব সময়ে আমরা তা চিনতেও পারি না; নৃতাত্ত্বিক গবেষণায় তা ধরা পড়ে। বাংলাদেশে ইতিহাসের গোড়ার যুগে যারা আলাদা আলাদা জনপদ বেঁধে বাস করত, তাদের শিল্পীমনের খুব কম খবরই আমরা রাখি। ওপরতলার সংস্কৃতির নিচে তার পুরো ইতিহাস আজও চাপা পড়ে আছে। আদিম লোকায়ত বাঙালীর নাচ-গান-ছবির যে দু'চারটি নমুনা আজও আমাদের চারিপাশের ধুলোকাদার মধ্যে মুখ গুঁজে পড়ে আছে, সেদিকে তাকালে প্রাচীনতম বাঙালীর শিল্পী-মনের কিছুটা আভাস মেলে।

আদিম জনপদবাসী বাঙালীর গান কেমন ছিল, রাগ-রাগিণী-সুর-তান-লয়-মান কী ছিল কিছুই আমরা জানি না, কেউ তা লিখেও রাখেনি। গ্রামের দিকে

নাচ-গান

লোকে আজও যে বাউল, যে ভাটিয়াল, যে ঝুমুর গান গায়—তার মধ্যে আছে বাঙালীর সেই লোকায়ত ধারার সুস্পষ্ট হদিশ। বীরভূমে রায়বেঁশেদের নাচ আর গানে, জেলায় জেলায় গ্রাম্য লাঠিয়ালদের নাচের ধরনে, নিম্নস্তরের মেয়েদের নৃত্যগীতে সাঁওতাল, কোল, হো, মুণ্ডা, শবর, গারো, কোচ, খাসিয়াদের মধ্যে যে সুর আর তাল, যে ভাব আর ভঙ্গি আজও দেখা যায়, তার মধ্যেও বয়ে চলেছে সেই একই প্রাচীন লোকায়ত ধারা। এই সব লোক-সঙ্গীত আর লোক-নৃত্য সমাজের ওপরতলার কাছে বারবার তাচ্ছিল্য আর অবজ্ঞা কুড়িয়েছে; কিন্তু তবু তার উৎস শুকিয়ে যায়নি।

সেই লোকায়ত ধারা আজও প্রাণবন্ত হয়ে শুধু যে বেঁচে আছে তাই নয়, সমাজের উঁচু কোঠার আনাচে কানাচেও সে তার স্রোত বইয়ে দিয়েছে।

লোকশিল্প

সেই লোকায়ত ধারা আজও দেখা যায় নানা ব্রত-উৎসব আর মঙ্গলানুষ্ঠানের আল্পনায়, কাঁচা বা পোড়া মাটির তৈরি পুতুল আর খেলনায়, মনসা বা গাজীর পটে, মাটি-লেপা বেড়ায় আর ঘরের দেয়ালে অথবা সরার গায়ে নানা রঙের রকমারি ছবি আর নক্সায়, কাঁথার ওপর সেলাই-করা হাতের কাজে, ঘরের মধ্যে শিকে ঝোলানোর কায়দায়, খুঁটি আর খড়ের তৈরি ধনুকের মত চালা ঘরে, বাঁশ আর বেতের শিল্পে, নানা রকমের হাতের কাজে।

ইট-কাঠ-পাথর

কিন্তু বাঙালীর আদিযুগের এই সব শিল্প-নিদর্শনের একটিও আমাদের পাবার উপায় নেই। যে সব মালমশলা দিয়ে তা তৈরি হত, তার সবই কমবেশি ঠুন্‌কো ধরনের। চালের গুঁড়োয় আল্পনা মুছে যেতে ক'দিনই বা লাগে? কাঠ-খড়-বাঁশ-মাটির আয়ুই বা কতদিন? রাজারাজড়া, বড়লোকেরা সামান্য যে কয়েকটি মন্দির-বিহার তৈরি করিয়েছেন, তারও প্রায় সমস্তটাই ইট—শুধু দরজায়, জানলায়, খিলানে, সিঁড়িতে, আনাচে কানাচে পাথরের ছিটেফোঁটা। সে ইমারত ধ্বসিয়ে দিতে খুব বেশি শতাব্দীর দরকার হয় না। ইটের তৈরি মন্দির-বিহারের যে দু'চারটি আধ-ভাঙা নমুনা আজও বাংলাদেশে টিঁকে আছে, তার মধ্যে পড়ে পাহাড়পুরের মন্দির-বিহার, দক্ষিণ বাংলার জটার-দেউল, বরাকরের মন্দির, সাত-দেউলিয়ার মন্দির, বহুলারার মন্দির। প্রাচীন বাংলার বিলুপ্ত মন্দির-বিহারের চেহারার কিছুটা ধারণা পাওয়া যায় পাথরের তৈরি সে-সময়কার দেব-মূর্তির ফলকে আর রঙে-রেখায় আঁকা কয়েকটি পাণ্ডুলিপি-চিত্রে।

পাথরের তৈরি মূর্তি ছাড়া আর কোন মালমশলায় তৈরি মূর্তি শতাব্দীর পর শতাব্দী পেরিয়ে টিঁকে থাকা সম্ভব নয়। বাংলাদেশে পাথর পাওয়া মুস্কিল। রাজমহল পাহাড় কিংবা ছোটনাগপুরের পাহাড় থেকে পাথর আনিয়ে এখানকার শিল্পীকে দিয়ে সেই পাথরের মূর্তি গড়ানোর খরচ বড় সোজা নয়। অবস্থা যাদের রীতিমত ভাল, একমাত্র তাদের পক্ষেই তা সম্ভব। বাংলার সাধারণ মানুষ তাই নিজেদের জীবনযাত্রার সহজ আবেগের ছবি পাথরের মূর্তিতে ধরে রাখতে পারেনি। তাই বাংলায় পুরনো প্রস্তর-শিল্পের একমাত্র নিদর্শন হল জৈন, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর বিগ্রহ, মন্দির-বিহারের

সাজসজ্জা। তাতে সর্বভারতীয় মনের প্রভাবই বেশি, বিশিষ্ট বাঙালী মনের প্রভাব খুবই কম। কাঠের ওপর খোদাই করা কিংবা আঁকা শিল্পের নিদর্শন খুবই কম; কারণ পাথরের চেয়ে কাঠের ওপর শিল্পকাজ অনেক বেশি হলেও কাঠ বেশি দিন টেঁকে না।

বাংলাদেশ পলিমাটির দেশ। এদেশে তাই নদীর আঁটালো মাটিতে গড়া খেল্‌নার ছড়াছড়ি। মুহূর্তে মুহূর্তে সে খেল্‌না ভেঙে গুঁড়িয়ে যায়; কিন্তু তবু যেটা থেকে যায়, সেটা তার শ্রীছাঁদ। তাই শতাব্দীর পর শতাব্দী পার হয়ে আজও আমাদের ব্রত-অনুষ্ঠানের মাটির তৈরি নানা মূর্তিতে, গ্রামের কুমোরদের মাটির তৈরি নানা পুতুল আর খেল্‌নায় আজও আমরা লোকশিল্পের সেই মৃত্যুঞ্জয়ী রূপ দেখতে পাই। বাঙালী বাড়ির ছোট ছোট ছেলেমেয়ে কাদা ছেনে যে মূর্তিকে রূপ দিতে চেষ্টা করে, তার মধ্যে লোকায়ত মনের ছাপ ফুটে ওঠে।

মাটির মূর্তি

এ ছাড়াও আরও এক ধরনের মাটির জিনিস লোকে তৈরি করত—ঘরের কুলুঙ্গি, দেয়াল, মঞ্চ সাজাবার জন্যে। তা দিয়ে মন্দির-বিহারের বাইরের দিকটা অনেক সময় ঢেকে দেওয়া হত। এসব জিনিস আজ তৈরি করে কাল ভেঙে দেবার জন্যে নয়। তাই এগুলোকে টেঁকসই করার জন্যে ছাঁচে ঢেলে নেবার পর আগুনে পুড়িয়ে নেওয়া হত। পোড়া মাটির এই সব ফলকে থাকত সাধারণ মানুষের আটপৌরে জীবনের রেখাচিত্র, লোকায়ত কথা আর কাহিনীর ছবি। তাতে দেবদেবীর মূর্তি বিশেষ আমল পেত না।

প্রাচীন বাংলার লোকায়ত চিত্রশিল্পের কোন চিহ্নই আজ আর পাওয়া যায় না। অষ্টাদশ আর উনবিংশ শতকের বাংলায় যে সব পটের ছবি পাওয়া যায়, তারও মূল নিশ্চয়ই আছে প্রাচীন কৌম সমাজে; সাম্প্রতিক গবেষণায় তার কিছু কিছু আভাসও পাওয়া গেছে। ব্রাহ্মণ্য যুগে সমাজের ওপরতলার যে সব ছবির কথা আমরা কিছু কিছু জানি, তার সবই তো পুঁথিচিত্র।

নাচ-গান

দশম-একাদশ শতকের অনেক আগেই বাংলাদেশে ভারতীয় সঙ্গীতের ঢেউ এসে লেগেছিল। এ কথা অনুমান করা যায় যে, চর্যাগীতিতে জয়দেবের

গীতগোবিন্দে এবং লোচন-পণ্ডিতের রাগরঙ্গিনী গ্রন্থে রাগ ও তালের নাম থেকে। চর্যাগীতির বিভিন্ন রাগের নাম পটমঞ্জরী, গবড়া-গউড়া, অরু, গুর্জরী-কাহ্নগুর্জরী, দেবক্রী, দেশাখ, কামোদ, ধনসী-ধানশ্রী, রামক্রী,

রাগ-রাগিনী বলাড্ডী-বরাড়ী, শবরী, মল্লারী, মালসী, গবুড়া, বঙ্গাল, ভৈরবী। গবড়া আর গউড়ী একই রাগ; এটি বোধ হয় সাহিত্যে গৌড়ী রীতির মতই, সঙ্গীতে গৌড়ী রাগ এবং তার সঙ্গে মালসী বা মালশ্রী মিশিয়ে যে মিশ্র রাগ, তারই নাম মালসী-গবুড়া। এদেশী কাহ্ন বা কৃষ্ণভক্তরা যে ঠাট বা কাঠামোতে মার্গসঙ্গীতের গুর্জরী রাগ গাইতেন, হয়ত তাই ছিল কাহ্ন-গুর্জরী রাগ। রামক্রী নিঃসন্দেহে পরবর্তী কালের রামকেলি রাগ। মার্গসঙ্গীতে দেশী রাগকে জাতে তুলে হয়ত দেশাখ আখ্যা দেওয়া হয়েছে। শবরদের মধ্যে প্রচলিত রাগকে মার্গসঙ্গীতে স্থান দিয়ে তার নাম দেওয়া হয়েছে শবরী; লোকায়ত বঙ্গাল রাগকেও এমনিভাবে মার্গসঙ্গীতের জাতে ওঠানো হয়েছে। এর অনেক রাগই আজ একেবারে বিলুপ্ত। এদের ঠাট বা কাঠামো কী ছিল কিছুই বলা যায় না। আজকের দেশ-রাগের মধ্যে বোধ হয় দেশাখ রাগেরই রূপান্তর ঘটেছে।

চর্যাগীতিতে প্রথম পদের পরের পদটি ধ্রুবপদ বা বাংলা ধুয়া। প্রত্যেকটি পদ গাইবার পরই এই ধ্রুবপদটি গাইতে হত। এই ধ্রুবপদই বর্তমানে উত্তর-ভারতীয় সঙ্গীত-পদ্ধতির 'স্থায়ী' পদ। চর্যাগীতিতে এই ধ্রুব-

ধ্রুবপদ পদটিতেই সহজ-সাধনের সূত্রটি ধরে দেওয়া হয়েছে—যাতে বার বার গাইবার ফলে সূত্রটির দিকে শ্রোতাদের নজর পড়ে। উত্তর-ভারতীয় সঙ্গীত-পদ্ধতিতে 'স্থায়ী'র কাজও তাই।

জয়দেবের গীতিগোবিন্দে যেসব রাগ ও তাল ব্যবহার করা হয়েছে, তার মধ্যে কিছু ছিল লোকায়ত রাগ। এই গ্রন্থের অন্যান্য রাগের মধ্যে বসন্ত-ভৈরব-বিভাস আজও সুপরিচিত। বাংলাদেশে সে-সময়ে

দক্ষিণী-প্রভাব প্রচলিত কর্ণাট-রাগের উল্লেখ যেমন গীতিগোবিন্দে, তেমনি লোচন-পণ্ডিতের লেখাতেও পাওয়া যায়। সেন-রাজবংশের মারফৎই সম্ভবত এই দক্ষিণী কর্ণাটী প্রভাব শুধু বাংলার গীতবাদ্যেই নয়, নৃত্যভঙ্গির মধ্যেও ঢুকে পড়েছিল। তার প্রমাণ, সে-সময়কার বাংলার রাজসভায় ও বড়লোকদের মজলিশে দেবদাসী নৃত্য, বাররামাদের নৃত্য প্রভৃতির যথেষ্ট প্রচলন ছিল।

নাটক

প্রাচীন পুঁথিতে বুদ্ধনাটক আর তুম্বুরুনাট্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সব নাটকের রূপ বা প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছু বলবার কোন উপায় নেই। তবে তার সঙ্গে যে নাচ, গান আর বাজনাও থাকত পুঁথিতে তার উল্লেখ পাওয়া যায়।

সঙ্গীত-শাস্ত্র

প্রাচীন বাংলায় সঙ্গীত-শাস্ত্রের আলোচনা-গ্রন্থ লোচন-পণ্ডিতের রাগ-তরঙ্গিনীতে এই বিষয়ে আরও একাধিক গ্রন্থের উল্লেখ আছে। সে সময়ে বাংলাদেশে সঙ্গীত-শাস্ত্রের যে ভাল রকম চর্চা হত, তা বুঝতে কষ্ট হয় না। লোচন-পণ্ডিত ছিলেন বল্লাল-সেনের আমলের লোক। সঙ্গীত-শাস্ত্র সম্পর্কে আরেকটি প্রাচীন গ্রন্থ শার্ঙ্গ-দেবের সঙ্গীত-রত্নাকর।

নাচ

নাচের নানা লোকায়ত রূপের আভাস পাওয়া যায় পাহাড়পুর আর ময়নামতীর পোড়ামাটির ফলকে; সমাজের ওপরতলায় কী ধরনের নাচ প্রচলিত ছিল, তা বোঝা যায় এই সময়কার বিভিন্ন পাথর-ফলকে খোদাই-করা দেবদেবী, অপ্সরা, গন্ধর্ব-নারী, মন্দির-নর্তকীর নাচের ভঙ্গিমায়।

মাটি-কাঠ-পাথর

ষষ্ঠ-সপ্তম শতকের আগেকার বাংলার খোদাই-শিল্পের নমুনা খুবই কম পাওয়া গেছে। প্রাচীন কালে ঠুন্‌কো মালমশলা দিয়ে শিল্পসৃষ্টি হওয়ার ফলে এই বন্যা-বৃষ্টি-গ্রীষ্মের দেশে সেগুলো বেশিদিন টেঁকেনি। ভারতবর্ষে আমরা পাথর কুঁদতে শিখেছি মৌর্য-আমলের সময়-সময়। বাংলাদেশে সে শিক্ষা এসে পৌছুতে অন্তত কয়েকশো বছর লেগেছে। বাংলাদেশে পুরনো যেসব নমুনা পাওয়া গেছে, তার বেশির ভাগই হয় পোড়ামাটির, নয় ছোট ছোট টুকরো পাথরের।

পোড়ামাটি

খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে শুরু করে খৃষ্টোত্তর দ্বিতীয়-তৃতীয় শতক পর্যন্ত গোটা গঙ্গা-যমুনা উপত্যকা ও মধ্য-ভারত জুড়ে পোড়ামাটির যে শক-কুষাণ শিল্পরীতি প্রচলিত ছিল বাংলাদেশে পোখরণায় (বাঁকুড়া জেলা), তমলুকে, মহাস্থানে আবিষ্কৃত প্রাচীন পোড়ামাটির

ফলকে তার কিছুটা চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়। তার সঙ্গে অবশ্যই স্থানীয় লোকায়ত ধারারও মেশাল আছে।

গুপ্তপর্বে এই শিল্পরীতির বদল হল। শক-কুষাণ ঢঙে তৈরি ভারী, শক্ত, স্থূল, একান্ত পার্থিব, সূক্ষ্ম অনুভূতিবিহীন বুদ্ধ-বোধিসত্ত্বের মূর্তি ক্রমে ক্রমে বদ্‌লে গুপ্ত আমলের শিল্পীর হাতে সূক্ষ্ম, মার্জিত, চিকণ, ধ্যানকেন্দ্রিক, যোগগর্ভ বুদ্ধ-বোধিসত্ত্বের মূর্তি, বিষ্ণুর মূর্তি হয়ে দেখা দিল। তার মধ্যে সারনাথের বুদ্ধ-বোধিসত্ত্বের বিভিন্ন মূর্তির প্রভাব খুবই স্পষ্ট ; কিন্তু সেই সঙ্গে তাতে ফুটে উঠেছিল পূর্ব-ভারতের আবেগ-প্রাধান্য এবং স্থানীয় বৈশিষ্ট্য।

গুপ্ত-মূর্তিকলার স্বর্ণযুগ যখন শেষ, পাল আমলের নতুন শিল্প যখন স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়নি—সেই যুগের কয়েকটি মূর্তিও বাংলাদেশে পাওয়া গেছে। অষ্ট ধাতুর তৈরি সর্বাণী মূর্তির দেহ-টান-করা আড়ষ্ট ভঙ্গি এবং কাঠামোর বিন্যাসে পাল-শিল্পরীতির পূর্বাভাস চোখে পড়ে। পাহাড়পুরের মন্দিরের গায়েও সেই সময়কার কিছু কিছু মূর্তি দেখা যায়।

অষ্টম শতকের মাঝামাঝি যেখানে পাহাড়পুরের বৌদ্ধ বিহার-মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হয়, তার আগেও বোধহয় সেখানে কোন ব্রাহ্মণ্য-মন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল। তার কিছু কিছু প্রতিমা-নিদর্শন হয়ত এই বিহার-মন্দিরে ভিত্তির গায়ে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এই মন্দিরটির দেয়াল ও ভিত সাজানোর জন্যে বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন শিল্প-রীতিতে তৈরি ৬৩টি প্রস্তরফলক ব্যবহার করা হয়েছে। তার মধ্যে তিনটি ধারা দেখতে পাওয়া যায়।

পাহাড়পুর

এক ধরনের ফলকে আছে ব্রাহ্মণ্য সমাজের অবসরপুষ্ট উচ্চতর বর্ণ ও শ্রেণীগুলির শিল্পসৃষ্টি ও রুচিবোধ। এই ফলকগুলি ষষ্ঠ শতকের বলেই মনে হয়। সম্ভবত ঐ সময়কার কোন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ থেকে এগুলি সংগ্রহ করা হয়েছিল। গুপ্ত শিল্পরীতি এই সমস্ত ফলকে খুবই স্পষ্ট।

আরেক ধরনের ফলক আছে, যাতে এই শিল্পরীতিরই স্থূল, রূঢ়, শিথিল, গুরুভার, প্রাকৃত চেহারা ধরা পড়ে। এরও বিষয়বস্তু ব্রাহ্মণ্য দেবদেবী এবং তাদের মূর্তিরূপও ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র অনুযায়ী ; গড়ন স্থূল, গুরুভার আকাঠ আড়ষ্ট চেহারা। রেখায় সূক্ষ্মতা নেই, মুখচ্ছবিতে কোন লাবণ্য নেই। ষষ্ঠ-সপ্তম শতকে এগুলি তৈরি। পরবর্তী পাল আমলের ফলকগুলির শিল্পরীতির পূর্বাভাস তাতে চোখে পড়ে।

তৃতীয় ধারাটি একেবারে স্বতন্ত্র। তাতে খোদাই করা আছে নানা কাহিনী। যেখানে পৌরাণিক কাহিনী নেওয়া হয়েছে সেখানেও লোকায়ত জীবনের রূপই ফুটে উঠেছে। এ ছাড়াও আছে সাধারণ মানুষের আটপৌরে জীবনের ছবি। তাদের পরনে সাদাসিধে পোশাক, গায়ে গহনাগাঁটির বালাই নেই। চালচলন, মুখের ভাব স্থূল—অনেক ক্ষেত্রে অমার্জিত। দাঁড়ানোর ভঙ্গি বলিষ্ঠ, কিন্তু আড়ষ্ট। চোখে মুখে সরল অনাবিল হাসি। কোথাও ঢেকে রাখা নেই, কম করে বলা নেই—প্রত্যেকটি ছবিতে আছে লৌকিক জীবনের প্রাণপ্রাচুর্য আর গতিময়তা। শিল্পরূপের দিক থেকে তা যত স্থূল, অমার্জিত ও অসম্পূর্ণ ই হোক, তাতে আছে গভীর মানবিক বোধ, জীবনের অকুণ্ঠ বিস্তার আর অফুরন্ত প্রাণরস।

এ ছাড়া আছে অসংখ্য পোড়ামাটির ফলক। শুধু পাহাড়পুর নয়, ময়নামতী বিহারের ধ্বংসস্তূপেও এমনি অসংখ্য পোড়ামাটির ফলক পাওয়া গেছে।

মাটির এই সমস্ত ফলকে সেকালের লোকায়ত কৃষি-জীবনেরই স্পষ্ট ছাপ পড়েছে। সুদৃশ্য মাটির ফলক দিয়ে মন্দিরের গা ছেয়ে দেবার জন্যে গ্রাম্য শিল্পীদেরই ডাক পড়েছিল। তাঁরা যে জীবনে অভ্যস্ত, সেই জীবনকেই তাঁরা তাল-তাল মাটিতে রূপ দিয়েছিলেন। তাই মন্দিরের গায়ে দেখা দিয়েছে গ্রামের কাদা-মাটি-মাখা সহজ অনাড়ম্বর মানুষের বিচিত্র জীবনের মিছিল। সমসাময়িক জীবনের কোন কিছুই এই শিল্পীদের চোখ এড়ায়নি। পৌরাণিক কাহিনী থেকে শুরু করে চারপাশের প্রাণিজগৎ; মানুষের উদয়াস্ত খাটাখাটুনি, দুঃখবেদনা, তামাসা-ফুর্তি; নানা অভ্যাস, সংস্কার; ভিক্ষুক, সন্ন্যাসী, দেবদেবী—কিছুই বাদ নেই। এ শিল্প একান্তই লৌকিক শিল্প, ব্রাহ্মণ্য সমাজের প্রথাবদ্ধ প্রতিমা-শিল্পের সঙ্গে তার কোন যোগ নেই। রাজারাজড়া আর উঁচু জাতের লোকদের পয়সায় যেসব মন্দির-বিহার তৈরি হয়েছিল, সেখানে মন্দিরের গা সাজাতে গ্রামের এই সব ছোট জাতের অবহেলিত শিল্পীদের ডাক পড়ল কেমন করে? যে মৃৎশিল্প অভিজাতদের শিল্পের পাশে কোনদিনই ঠাঁই পায়নি, ব্রাহ্মণ্য মন্দিরে বিহারে কেমন করে তার স্থান হল? ভালবেসে নয়, নেহাৎ দায়ে পড়েই লৌকিক শিল্পকে সেদিন মন্দিরের গায়ে জায়গা ছেড়ে দিতে হয়েছিল। কারণ, বাংলাদেশে এত পাথর নেই যা দিয়ে বিরাট মন্দিরের গা ঢেকে দেওয়া যায়। কাজেই মাটির ফলক ছাড়া গতি ছিল না। সে শিল্প শুধু গ্রামের মানুষদেরই

মৃৎশিল্প

আয়ত্তে। মাটির টানে তাই গ্রামের অবহেলিত লৌকিক শিল্পীদের না এনে উপায় ছিল না।

পাল-সেন পর্ব

সপ্তম শতকের শেষার্ধ থেকেই ভারতের রাষ্ট্রীয় ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস নতুন বাঁক নিতে শুরু করে। আঞ্চলিক আদর্শ ও ধারণা ভারতীয় জীবনের নানা দিকে দানা বেঁধে উঠতে লাগল। পাল-পর্বে এই লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল।

এ যুগে শিল্পীরা ছিলেন সমাজের নিচুতলার লোক ; তাঁরা সবাই ছিলেন পেশাগত শ্রেণী, গণ বা নিগমভুক্ত। এই আমলের কয়েকজন কৃতী শিল্পীর নাম জানা যায়। ধীমান ও তাঁর পুত্র বিটপাল দুজনেই খোদাইয়ের কাজে, ধাতব মূর্তি-শিল্প আর চিত্রকলার ক্ষেত্রে বিশিষ্ট শিল্পীগোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এঁরা ছাড়া আর কোন শিল্পীর নামই রাজকীয় দলিলপত্রে কিংবা ঐতিহ্যে বাঁচিয়ে রাখা হয়নি। পাথরের ফলকে ও তাম্রপট্টে খোদাইকর হিসেবে আর যাঁদের নাম পাওয়া যায়, তাঁদের মধ্যে আছেন : ভাস্কর, তাতট, মংকদাস, বিমলদাস, বিষ্ণুভদ্র, মহীধর, শশীদেব, কর্ণভদ্র, তথাগতসার, রাণক শূলপাণি।

পাল-সেন আমলের সমস্ত মূর্তিই প্রায় সূক্ষ্ম কিংবা কিছুটা মোটা দানার কষ্টিপাথরে তৈরি ; ধাতব মূর্তিগুলো পিতল কিংবা অষ্টধাতুর। সোনা-রুপোর মূর্তিও দু'একটি পাওয়া গেছে। কাঠের মূর্তি ও অলংকরণ রচনার নমুনাও কিছু কিছু আছে। পাথর ও ধাতুর তৈরি প্রায় সমস্ত মূর্তির পেছনেই একটি করে চালচিত্র। দেবদেবীর চেহারায় পার্থিব ও দৈব দু'রকম ভাবেরই প্রকাশ দেখা যায়। মূর্তির হাত-পা, নাক-মুখ-চোখ হুবহু মাপসই করার দিকে যেমন বাড়াবাড়ি রকমের ঝোঁক ছিল না, তেমনি আবার প্রতিমার অলংকার ও সাজসজ্জায় দেখা যায় নিখুঁত কারুকাজ। এই আমলের মূর্তিতে যে দেহভঙ্গি ও মুদ্রা দেখা যায়, তার বীজ বোনা হয়েছিল গুপ্তপর্বের শিল্পকলায়। এই পর্বের মূর্তিশিল্পে একদিকে যেমন একটি সাধারণ ধারা ফুটে উঠেছে, তেমনি আবার তারই মধ্যে আছে বহু বৈচিত্র্য। প্রতিমা গড়তে গিয়ে নানা জাত, নানা জনের, নানা ভিন্‌প্রদেশী মানুষের মুখের আদল এসে গেছে। প্রত্যেক শিল্পীর নিজের রুচি, নিজের গঠনরীতি তাতে অনিবার্যভাবেই নিজস্ব ছাপ ফেলেছে।

আঁকা ছবি

বাংলাদেশে পাল যুগের আগেকার কোন আঁকা ছবির নমুনা কোথাও এখনও পাওয়া যায়নি। চতুর্থ শতকে তাম্রলিপ্তিতে ছবি আঁকার অভ্যাস যে ছিল, তার আভাস পাওয়া যায় ফা-হিয়েনের লেখায়। তাছাড়া সেকালকার ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গাতেও বোধ হয় লোকায়ত শিল্পে পটচিত্র, ধূলিচিত্র ইত্যাদি লোকের একেবারে অজানা ছিল না। তা থেকেই হয়ত এসেছে অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকের বাংলার জড়ানো পটের ছবি, আল্পনা, ফরিদপুর-যশোহর-বীরভূম-মেদিনীপুর-কালীঘাটের বিচ্ছিন্ন পট।

পুঁথিচিত্র

আঁকা ছবির যে সব প্রাচীনতম নমুনা পাওয়া গেছে, তার সবই একাদশ-দ্বাদশ শতকের ; প্রায় প্রত্যেকটিই পাণ্ডুলিপি-চিত্র—তালপাতায় কিংবা কাগজে হাতের লেখা পুঁথি সাজাবার জন্যে আঁকা। ফলে, খুব কম জায়গার মধ্যে ক্ষুদে ক্ষুদে করে আঁকতে হয়েছে। ছোট হলেও তার ভাব, পরিকল্পনা, রং-রেখা সব কিছুই সুবৃহৎ প্রাচীর-চিত্রের মত। এই সব পুঁথিচিত্র এ-পর্যন্ত বিশ-বাইশখানার বেশি পাওয়া যায়নি। এর মধ্যে একটি পুঁথি কাগজের। কাগজের ওপর লেখার মাঝখানে সমান্তরাল করে তাতে ছবি আঁকা হয়েছে। এর বেশির ভাগ পাওয়া গেছে নেপালে, কিছু বাংলাদেশে, বাদবাকি পাওয়া গেছে বাংলার বাইরে। একটি ছাড়া বাকি সব ছবিই বৌদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধে। এই সময়ে তামার পাটায় আঁকা এই ধরনের তিনটি ক্ষুদে ছবিরও খবর পাওয়া যায়। পুঁথিচিত্রে যে সব রং ব্যবহার করা হয়েছে, তার মধ্যে আছে হরি-তালের হলুদ, খড়িমাটির শাদা, গাঢ় নীল, প্রদীপের শীষের কালো, সিঁদুরের লাল এবং সবুজ। রং কোথাও গাঢ়, কোথাও পাতলা। চিত্রবিন্যাসের রীতিতে আছে ভাস্কর-রীতির অনুসরণ। মূলপ্রতিমা পার্শ্বপ্রতিমাগুলির চেয়ে বড় এবং তার পেছনে অলংকৃত পটভূমি।

প্রাচ্য-ভারতীয় চিত্রকলার রীতি ও আদর্শের সঙ্গে পশ্চিম-ভারতীয় চিত্রাঙ্কনের রীতি ও আদর্শের মিল খুব স্পষ্ট। তেমনি আবার তফাতটাও স্পষ্ট। পশ্চিম-ভারতীয় ছবিতে রেখা অত্যন্ত বেশি তীক্ষ্ণ আর উজ্জ্বল, কোণগুলো প্রায় জ্যামিতিক চিত্রের মত সূক্ষ্ম ; ভগ্ন কিংবা ভঙ্গুর রেখায় আবেগ নেই, প্রাণ নেই। প্রাচ্য-ভারতীয় ছবিতে আছে অপরূপ লালিত্য, রেখার মধ্যে আছে আবেগ সঞ্চারিত করবার ক্ষমতা।

প্রাচীন বাংলার স্থাপত্য-শিল্পের ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা করবার মত মালমশলা নেই। সেকালের সাহিত্যে কুটির, প্রাসাদ, বিহার, মন্দিরের অনেক উল্লেখ আছে; মন্দিরের মধ্যে ভূ-ভূষণ, পর্বতশৃঙ্গস্পর্ধী, স্বর্ণকলসশীর্ষ, মেঘবর্ত্মা-বরোধী প্রভৃতি নাম পাওয়া যায়। কিন্তু দু'চারটি মন্দির কিংবা তাদের ধ্বংসাবশেষ ছাড়া আজ আর তার কিছুই খুঁজে পাওয়া যায় না। একে সেগুলো ইট-কাঠ-বাঁশের তৈরি—তার ওপর মানুষের লোভ আর লুটপাটের স্পৃহার কবলে তাদের পড়তে হয়েছে।

'বাংলো-বাড়ি' ব'লে ইঙ্গ-ভারতীয় সমাজে যার এত নাম, আসলে তারই প্রাচীন চেহারা এককালে ভারতীয় স্থাপত্যে গৌড়ীয় বা বাংলা রীতি হিসেবে পরিচিত ছিল। গরিবের কুঁড়ে ঘর থেকে বড়লোকের দোতলা-তিনতলা পর্যন্ত সবই এই গৌড়ীয় রীতিতে তৈরি হত। আজও গাঁয়ের দিকে সেই বাংলা-রীতিতে তৈরি বাঁশ বা কাঠের খুঁটির ওপর চৌকোণা নক্সার ভিত্তিতে মাটির দেয়াল বা বাঁশের চাঁচারীর বেড়ায় ঘেরা ধনুকের মত আকারের দোচালা, চৌচালা, আটচালা ঘর দেখতে পাওয়া যায়।

বাংলা-রীতি

প্রাচীন বাংলায় ধর্মগত বাস্তু তিন রকমের: স্তূপ, বিহার ও মন্দির। স্তূপ ও বিহার সাধারণত বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের সঙ্গে জড়িত, বিশেষভাবে বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে। জৈন বিহার বলতে একটিমাত্র ছিল উত্তর-বঙ্গের পাহাড়পুরে; একটি স্তূপও বোধহয় উত্তরবঙ্গে ছিল। আর সমস্ত স্তূপ ও বিহারই ছিল বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে জড়িত।

ধর্মগত বাস্তু

বৈদিক আমলেও দেহাস্থি পুঁতে ফেলার জন্যে শ্মশানের ওপর মাটির স্তূপ তৈরি হত। এই স্থাপত্যরূপকে বিশেষভাবে গ্রহণ করেন বৌদ্ধরা। বৌদ্ধ ঐতিহ্যে তিন রকমের স্তূপ: (১) শারীর ধাতু স্তূপ—এই শ্রেণীর স্তূপে বুদ্ধদেবের ও তাঁর শিষ্যদের দেহাবশেষ রাখা হত ও পুজো করা হত; (২) পরিভোগিক স্তূপ—এই শ্রেণীর স্তূপে বুদ্ধদেবের ব্যবহার করা জিনিষপত্র রাখা হত ও পুজো করা হত; (৩) নির্দেশিক বা উদ্দেশিক স্তূপ—বুদ্ধদেবের ও বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত কোন জায়গা বা ঘটনাকে চিহ্নিত বা উদ্দেশ্য করে এই শ্রেণীর স্তূপ তৈরি হত। পরের

স্তূপ

যুগে স্তূপমাত্রই বুদ্ধ ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রতীক হয়ে বৌদ্ধসমাজের কাছে পুজো পায়। তাছাড়া বৌদ্ধ তীর্থস্থানে পুজো দিতে এসে নৈবেদ্য বা নিবেদন হিসেবে ছোটবড় স্তূপ তৈরি করে ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা একটা রীতি হয়ে দাঁড়ায়। এদের বলা হয় নিবেদন-স্তূপ।

সব স্তূপই গড়নের দিক থেকে এক। একেবারে গোড়ায় স্তূপ বলতে গোলাকার একটি বেদীর ওপর অর্ধচন্দ্রাকার একটি অণ্ড ছাড়া কিছু বোঝাত না। তার ঠিক ওপরেই থাকত হর্মিকা; এই হর্মিকা-বেষ্টনীর মাঝখানে একটি ভাণ্ডের মধ্যে থাকত শারীর বা পরিভোগিক ধাতু। পরবের দিন ধাতুসহ ভাণ্ডটি নামিয়ে ভক্তদের দেখানো হত এবং সামনে নিয়ে গণযাত্রা করা হত। রৌদ্র-বৃষ্টি থেকে রক্ষা করার জন্যে হর্মিকার ঠিক ওপরে থাকত একটি ছত্রাবরণ। পরে প্রত্যেকটি অঙ্গ আরও বিস্তারিত করে আরো লম্বা, আরও উঁচু করার দিকে ঝোঁক দেখা যায়। সেই সঙ্গে তোরণ, বেষ্টনী এবং নানা অলংকার যোগ হতে থাকে। সপ্তম-অষ্টম শতক থেকে নিচু গোলালো বেদীটি একটি গোল এবং লম্বিত মেধিতে পরিণত হয়। তার ওপরকার অণ্ডটিও সেইমত ক্রমশ উঁচু হয়। বেশি উঁচু করার জন্যে বেদীর নিচে একটি চৌকোণা ভিতও কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায়। হর্মিকার ওপরকার ছত্র ক্রমশ যেমন আকারে ছোট হয়ে এল, তেমনি সংখ্যায় অনেক বেড়ে গেল। ক্রমে স্তূপ আর স্তূপ থাকল না, সমস্ত অঙ্গ মিলিয়ে লম্বিত ও কৌণিক একটি শিখর হয়ে উঠল। শেষ পর্যন্ত স্তূপের যে চেহারা দাঁড়াল, তারই ধ্বংসাবশেষ আমরা বাংলা দেশে দেখতে পাই; তার সবগুলোই নিবেদন-স্তূপ। স্তূপ-স্থাপত্যের দিক থেকে বাংলাদেশের কোন বিশেষত্ব নেই। তার কারণ, মহাযান-বজ্রযান বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে স্তূপের সম্বন্ধ ছিল খুবই কম।

বিহার

পাহাড় কুঁদে তৈরি গুহাই ছিল আদিম বৌদ্ধ বা জৈন বিহার। তাকে স্থাপত্য বলা চলে না। তাতে বুদ্ধি বা সৌন্দর্যবোধের বিশেষ স্থান নেই। তা ছাড়াও অবশ্য ইট-পাথরের ভিত আর কাঠামোর ওপর বাঁশ, কাঠ দিয়ে বিহার তৈরির চেষ্টাও ছিল। মাঝখানে বিরাট উঠোন; তার চারপাশে ছোট ছোট কুঠুরি; একেকটি দিকের মাঝখানে কুঠুরিটা বড়। উঠোনের একদিয়ে কুয়ো এবং স্নান-আচমনের জায়গা। বিহারে ঢোকবার একটিমাত্র দরজা। বৌদ্ধ ও জৈন সংঘে যত লোক বাড়তে লাগল, সমৃদ্ধি দেখা দিল—ততই ইটের তৈরি আরও বড় বিহার

দরকার হল। একতলা বিহারেও যখন কুলালো না, তখন দোতলা তিন-তলা এমনকি ন'-তলা বিহার পর্যন্ত তৈরি হল। বিহার আর ভিক্ষুদের শুধু আস্তানা হয়েই থাকল না, জ্ঞানবিজ্ঞান ধর্মকর্ম সাধনার বিরাট কেন্দ্র হয়ে উঠল।

বাংলাদেশেও এমনি ছোট বড় অনেক বিহার ছিল। তার কিছু কিছু ধ্বংসাবশেষ আজও দেখতে পাওয়া যায়।

রাজশাহীর পাহাড়পুরে অন্তত দুটি বিহার ছিল; বটগোয়ালী বা গোয়ালভিটায় ছিল জৈন বিহার; তার ভূমি-নক্সা ও আকৃতি-প্রকৃতি কেমন ছিল আজ আর জানার উপায় নেই। বৌদ্ধ ধর্মপাল-মহাবিহারটির নক্সা ও আকৃতি-প্রকৃতি আজও দেখতে পাওয়া যায়। সমচতুষ্কোণ এই মহাবিহারটি প্রত্যেক দিকে প্রায় ন'শো ফুট লম্বা। চারদিকে শক্ত চওড়া পাঁচিল। পাঁচিলের গা ঘেঁষে ভেতরের দিকে সারি সারি প্রায় ১৮০টিরও বেশি কুঠুরি। সম্ভবত বিহারটির একাধিক তলা ছিল।

বিহার-মন্দিরে ঢুকবার তোরণ ছিল উত্তর দিকে। সমতল ভূমি থেকে পর পর সুপ্রশস্ত ধাপ বেয়ে ওপরে উঠে একটি প্রকাণ্ড দরজা পার হলে সামনেই অনেক থামওয়ালা একটি সুপ্রশস্ত কুঠুরি। সোজা সেটা পার হয়ে গেলে দক্ষিণ দিকের মাঝখানে কিছুটা ছোট একটি দরজা। সেটা পার হলে থামওয়ালা কিছুটা ছোট আরেকটি কুঠুরি; তারপরই চারদিকের সারি সারি কুঠুরি ঘিরে টানা লম্বা বারান্দা। ধাপে ধাপে নামলে সামনেই বিরাট উঠোন, তার মাঝখানে উঁচু মন্দির। প্রবেশের প্রধান তোরণ ছাড়াও উত্তর দিকের প্রায় পূর্বতম প্রান্তে আরেকটি ছোট তোরণ। পূর্বদিকে মাঝের বড় কুঠুরিটার ভেতর দিয়েও বোধ হয় বিহারের বাসিন্দাদের জন্যে একটি খিড়কি-দরজা ছিল। দক্ষিণ ও পশ্চিম দিক একেবারেই বন্ধ। অধিকাংশ কুঠুরিতে সমৃদ্ধ অলংকরণযুক্ত বেদী দেখে মনে হয়, পরে কোন সময়ে ভিক্ষুর সংখ্যা কমে গেলে কুঠুরিগুলো পুজোর ঘর হিসেবে ব্যবহার করা হত।

বিহার-মন্দিরটির কাজ চালানোর জন্যে প্রধান প্রবেশপথের পাশেই একটি দপ্তরখানা ছিল। প্রত্যেকটি তলা, প্রত্যেকটি কুঠুরি আর উঠোনের জল নিকাশের জন্যে নালার ব্যবস্থা ছিল—সেই জল গিয়ে জমা হত বিহারের ভেতরেই ছোট্ট একটি দীঘিতে। সারি সারি কুঠুরির মাঝখানে মাঝখানে, চওড়া উঠোনের নানা জায়গায় ছোট ছোট মন্দির, নিবেদন-স্তূপ, কুয়ো, স্নান-আচমন ও খাবার জায়গা।

প্রাচীন বাংলায় মন্দির ছিল অগণিত। কিন্তু শুধুমাত্র একাদশ শতকের কয়েকটি ভাঙা আধ-ভাঙা মন্দির ছাড়া আর সবই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। অথচ ভারতীয় স্থাপত্যের ইতিহাসে মন্দির-নির্মাণই বাংলার যা কিছু বৈশিষ্ট্য। বাংলার মন্দিরই যবদ্বীপ ও ব্রহ্মদেশের বিশিষ্ট মন্দির-স্থাপত্যের আসল প্রেরণা।

মন্দির

প্রাচীন বাংলায় মন্দির-স্থাপত্যে চারটি রীতি প্রচলিত ছিল : (১) ভদ্র বা পীড় দেউল। এই রীতিতে মাথার ওপরকার চাল বা ছাদ ক্রমে ছোট হয়ে পিরামিডের মতন ধাপে ধাপে ওপরের দিকে উঠে গেছে। এই রকম ধাপ আছে তিনটি, পাঁচটি কিংবা সাতটি। সব চেয়ে ওপরের ধাপের মাথায় আমলক বা চূড়া। (২) রেখ বা শিখর দেউল। মাথার ওপরের দিকে উঠে গেছে। শিখরের ওপর আমলক বা চূড়া। (৩) স্তূপযুক্ত পীড়া বা ভদ্র দেউল। এই ধরনের দেউলে ক্রমশ ছোট হয়ে আসা পিরামিডাকৃতি চালের ওপর আবার একটি স্তূপ। স্তূপের ওপর চূড়া। (৪) শিখরযুক্ত পীড়া বা ভদ্র দেউল। এই ধরনের দেউলের ক্রমশ ছোট হয়ে আসা পিরামিডাকৃতি চালের ওপর আবার একটি শিখর। শিখরের ওপর চূড়া।

ভারতীয় বাস্তুশাস্ত্রে ‘সর্বতোভদ্র’ নামে এক শ্রেণীর মন্দিরের উল্লেখ আছে। এই ধরনের মন্দির চতুষ্কোণ ; চারদিকে চারটি গর্ভগৃহ। সেই গৃহে প্রবেশের চারদিকে চারটি তোরণ। শাস্ত্রমতে এই মন্দিরের পাঁচটি তলা থাকত। প্রত্যেক তলায় ষোলটি কোণ। প্রত্যেক তলা ঘিরে প্রদক্ষিণ পথ ও প্রাচীর। সমস্ত মন্দিরটি অসংখ্য ছোট ছোট শিখর ও চূড়া দিয়ে সাজানো হত। পাহাড়পুরের বিরাট মন্দিরটি এই সর্বতোভদ্র মন্দিরের একটি উজ্জ্বল নিদর্শন। পোড়ামাটি, ইট ও কাদার গাঁথুনি দিয়ে এই মন্দিরটি তৈরি।

আগে যে চার রকমের মন্দিরের কথা বলা হয়েছে, তার কোনটার মধ্যেই পড়ে না বাংলাদেশে এমন মন্দিরের কথাও জানা গেছে। যেমন, দিনাজপুর জেলার বৈগ্রামের মন্দির।

উড়িষ্যার ভুবনেশ্বরে বা পুরী-কোণারকে, মধ্য-ভারতের খাজুরাহোতে, ব্রহ্মদেশের পাগানে, যবদ্বীপের প্রাম্বানাম-পানতরমে, কাম্বোজের আঙ্কোর থোমে বা দক্ষিণ-ভারতের কাঞ্চীপুরে যে সুবিস্তৃত মন্দির-নগরী গড়ে উঠেছিল, প্রাচীন বাংলায় তেমন কোন বিরাট মন্দির-নগরীর পরিচয় পাওয়া যায় না। দু'চারটি ছাড়া সমস্ত মন্দিরই ছিল ছোট ছোট।

প্রবহমান

বাঙালীর মুখের দিকে তাকালে দূর অতীতের কত বিস্মৃত মুখ মনে পড়ে। জঙ্গল হাসিল করে এদেশে যারা প্রথম ঘর বাঁধে, মাটির বুক চিরে যারা প্রথম ফসল ফলায়—তাদের মুখ। যে বিচিত্র কোম, বিচিত্র নরগোষ্ঠীর মানুষ আসমুদ্র-হিমাচল এই নদীমেখলা বাংলার টানে প্রথম বাঁধা পড়েছিল—তাদের মুখ। বাঙালীর দেহমন থেকে তাদের ছাপ কখনও মুছে যায়নি।

একেকটি জায়গায় ছিল আদিবাসী কোমের আস্তানা। এক কোমের সঙ্গে আরেক কোমের মুখ দেখাদেখি ছিল না। নিজেদের চারপাশে তারা গড়ে তুলেছিল নানা বিধিনিষেধের দেয়াল। যার যার গণ্ডিটুকুর মধ্যে শুধুমাত্র তারা নিজেদের নিয়ে নিজেরা থাকত। কিন্তু কালক্রমে নানা রাষ্ট্রীয় আর অর্থনৈতিক ঢেউয়ের আঘাতে ভেঙে পড়ল তাদের ছোট ছোট এলাকার সেই বেড়া। সভ্যতা এগিয়ে গেল। এক কোম আরেক কোমের সঙ্গে মিলে মিশে আরও বড় এলাকা জুড়ে গড়ে উঠল আরও বড় একেকটি কোম, একেকটি জন—বঙ্গ-গৌড়-পুণ্ড্র-রাঢ়-সুহ্ম। তারপরও কিন্তু ছোট ছোট কোমের নিজস্ব সত্তা, নিজস্ব চেতনা মুছে যায়নি। প্রাচীন বাংলায় বরাবর তা টিঁকে থেকেছে—সমাজের বর্ণ, বৃত্তি আর শ্রেণীর মধ্যে, ধনদৌলতের উৎপাদন আর বিলি-বণ্টনে, গ্রাম আর শহরের পাড়ায় পাড়ায়, রাষ্ট্রের কাজেকর্মে, এমন কি যুদ্ধবিগ্রহে ধর্মকর্মে—এক কথায়, জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে আজও আমাদের ধ্যানধারণায়, অভ্যাসে, ক্রিয়াকর্মে তার স্মৃতি জড়িয়ে আছে। হাজার হাজার বছর পরেও সেই কৌমজীবনের জের আমরা আজও টেনে চলেছি।

কৌমচেতনা

একেকটি অঞ্চল জুড়ে ছোট ছোট বিভিন্ন কোমের মিলনে যেসব জনপদ গড়ে উঠেছিল, পরে শশাঙ্কের সময় থেকেই সেইসব বিচ্ছিন্ন জনপদকে একটি বৃহত্তর দেশখণ্ডের মালায় গেঁথে দেবার চেষ্টা হয়েছে। তা সত্ত্বেও সে চেষ্টা প্রাচীন বাংলায় খুব বেশি সফল হয়নি। স্থানীয়

আঞ্চলিক চেতনা

জনপদের সত্তাকে প্রাচীন বাঙালী বৃহত্তর দেশসত্তায় কিছুতেই মিলিয়ে দিতে চায়নি। রাঢ়, পুণ্ড্র, সুহ্ম, বরেন্দ্র, বঙ্গ, হরিকেল, সমতট—আলাদা আলাদা জনপদের গণ্ডি দিয়ে নিজেদের সত্তা আর চেতনাকে আড়াল করে রেখেছে। শশাঙ্ক কিংবা পাল-সেন রাজারা কখনও এই গণ্ডি ভেঙে দিয়েছেন; কিন্তু যখনই সুযোগ মিলেছে, তখনই বিভিন্ন জনপদ নিজেদের চারপাশে বিচ্ছিন্নতার দেয়াল তুলতে দেরি করেনি।

তার কারণ, প্রাচীন বাঙালী অচল অনড় মাটির টানে বাঁধা। মাঝখানে কয়েক শতাব্দী বাদ দিলে চাষবাস আর জমিজমাই তার বরাবরের নির্ভর।

কৃষি-নির্ভরতা

যে সমাজে ব্যবসাবাণিজ্যই ধনদৌলতের বড় উপায়, সেখানে মানুষ গ্রাম আর গোষ্ঠী, ঘর আর পরিবার ছেড়ে দিনের পর দিন দেশে-দেশান্তরে কাটায়। গ্রাম আর গোষ্ঠীর বন্ধন আল্গা হয়ে পড়ে; ছোট্ট গণ্ডি ভেঙে গিয়ে দেখা দেয় বৃহত্তর চেতনা। প্রাচীন বাংলার কৃষি ও ভূমিনির্ভর সমাজে তা হবার উপায় ছিল না।

রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও সেই একই সংকীর্ণ আঞ্চলিক চেহারা চোখে পড়ে। কৌমতন্ত্র আস্তে আস্তে রাজতন্ত্রকে জায়গা ছেড়ে দিয়েছে; কিন্তু রাজতন্ত্রের লেজুড় হয়ে দেখা দিয়েছে সামন্ততন্ত্র। এই সামন্তরা প্রায় সবাই বড় বড় রাজ্যের মধ্যেকার একেকটি অঞ্চলের কৌম সর্দার বা নায়ক। সে অঞ্চলে সামন্তরাই সর্বেসর্বা; আঞ্চলিক চেতনার ওপর ভর করেই তাদের এত প্রতাপ, এত প্রতিষ্ঠা। দেশ বা প্রান্তের রাজা বা সম্রাট সে অঞ্চলের লোকের কাছে দূরাগত ধ্বনিমাত্র।

বাংলাদেশের সমস্ত কোম একই সঙ্গে একই সময়ে সভ্যতার অধিকার পায়নি। তাই বাংলার বুক জুড়ে সভ্যতা আর সংস্কৃতির চেহারা কখনই এক

পাশাপাশি

নয়। বাংলার এক অংশে যখন একদল মানুষ লাঙলের কাঠের ফলা দিয়ে কিংবা হাত-খুরপি দিয়ে ধাপে ধাপে ঢালু পাহাড়ের গা কেটে ধান ফলাচ্ছে, অন্য অংশে তখন চলেছে তার চেয়ে উঁচু ধরনের চাষ-আবাদ। একটি অংশে যখন সোনা-রুপোর মুদ্রা চলছে, অন্য অংশে হয়ত তখন চলেছে জিনিসের বদলে জিনিস দিয়ে কিংবা বড় জোর কড়ি দিয়ে কেনাবেচা। এক অংশে যখন উপনিষদের ব্রহ্মবাদ, অন্য অংশে তখন গাছপাথরের পুজো, ভোজবাজি আর ভূতপ্রেতে বিশ্বাস। যেমন প্রাচীন বাংলায়, তেমনি আজও সেই একই ছবি। ইতিহাসের ছোঁয়াচ সব

জায়গায় সমানভাবে লাগেনি। ইতিহাসের এই অসমান গতি বাংলাদেশের মানুষকে, তার সংস্কৃতিকে অসংখ্য স্তরে ভাগ করে রেখেছে।

বর্ণ আর শ্রেণীর বাঁধন দিয়ে সমাজের বিভিন্ন স্তরকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ইতিহাসের এই অসমান গতিকে বাঙালী সমাজে ভালভাবে পাকাপোক্ত করা হয়েছে। নানা বিধি-বিধান, নানা বিধি-নিষেধ দিয়ে প্রত্যেকটি স্তর এমনভাবে বাঁধা যে, সে বেড়া ডিঙিয়ে বর্ণ কিংবা বৃত্তির দিক থেকে নিচু স্তর থেকে উঁচু স্তরে ওঠা সহজ নয়। বর্ণ আর বৃত্তি যেখানে অনেকখানি জন্মগত, সেখানে শ্রেণীও কতকাংশে অনড় অচল না হয়ে উপায় নেই। শ্রেণীতে শ্রেণীতে যে সক্রিয় বিরোধ সমাজের এই অনড় অচল বর্ণ আর বৃত্তির দেয়াল কিছুটা ধ্বসিয়ে দিতে পারত, তার কোন নমুনা প্রাচীন বাংলায় পাওয়া যায় না। যে শ্রেণী যখন সামাজিক ধন বেশি উৎপাদন করেছে, সমাজে ও রাষ্ট্রে তার সেইমত প্রভাব পড়লেও সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তারা বিশেষ এগোতে পারেনি। তার কারণ, বর্ণ আর বৃত্তির দুর্লঙ্ঘ্য বাধা।

বর্ণ, বৃত্তি আর শ্রেণীগত বাধা ইতিহাসের পায়ে যে বেড়ি পরিয়েছে, তার কিছুটা ভেঙে যেতে পারত যদি আমাদের সামাজিক ধন উৎপাদনের পদ্ধতির কিছুটা বদল হত। আদিম কৌম জীবন ও সমাজের পাঁচিল ভেঙে দিয়েছিল উন্নত ধরনের চাষবাস ও শিল্প। তারপর যে বৃহত্তর জীবন ও সমাজ দেখা দিয়েছিল, প্রাচীন কৃষি ও শিল্পপদ্ধতির উন্নতির অভাবে তাকে আর ভাঙা গেল না। মাঝখানে শুধু কয়েক শো বছর ব্যবসা-বাণিজ্য আশ্রয় করে বাঙালী সমাজের কিছু বাধা-বন্ধন কেটেছিল, ইতিহাসের পালে কিছুটা হাওয়া লেগেছিল। বণিক-ব্যবসায়ীরা কিন্তু বর্ণ আর বৃত্তির বাধা-বন্ধনের কাছে তেমনি মাথা নুইয়ে চললেন ; শ্রেণী-চেতনা কিছুতেই আর বর্ণ-বৃত্তির বেড়া ডিঙোতে পারল না। প্রাচীন বাংলার জীবন আর সমাজের ভিত যেমন তেমনি রয়ে গেল, কিছুই বদলাল না।

আদিম কোমবদ্ধ জীবনধারায় এমনি করে বাঙালীকে পিছনে টেনে রাখল তার গ্রাম। কেননা পশু শিকারের জন্যে চাই বন, চাষের জন্যে জমি, সেচের জন্যে নদী। সমাজ বাঁধার খুঁটি হল গোষ্ঠী আর পরিবার। এমনি করেই পত্তন হল গ্রামের। গ্রামকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠল বাঙালীর ভাবনা-কল্পনা, বাঙালীর সমাজবন্ধন। গ্রামের চৌহদ্দির মধ্যে আড়ষ্ট বাঁধাধরা জীবন ; জীবিকার জন্যেও বাইরে যাবার

পিছুটান

তাগিদ নেই। গ্রামের এই নিথর নিশ্চল জীবনে ব্যবসাবাণিজ্যের ঢেউ খেলে গেল প্রথম-দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ-সপ্তম শতক পর্যন্ত—বিশেষ করে চতুর্থ থেকে সপ্তম শতক পর্যন্ত। চাষবাস আর জমির ওপর নির্ভরতা কিছুটা কমল। গ্রাম আর গোষ্ঠী পরিবারের বন্ধন কাটিয়ে ব্যবসাবাণিজ্যের টানে দেশদেশান্তরে ঘোরার ফলে চেতনার কিছুটা প্রসার হল। কিছু কিছু নগর নগরী গড়ে উঠল : বড় বড় যৌথশিল্প গ্রাম থেকে নগরে উঠে এল। তবু গ্রামকে তারা জীবনের কেন্দ্র থেকে সরাতে পারল না। বণিকব্যবসায়ীরা দেশবিদেশের ধনদৌলত নিয়ে গ্রামেই ফিরে আসতেন, তাঁদের অর্থ গ্রামেই ব্যয় হত। নগরের যৌথশিল্পের যোগান যেত গ্রাম থেকে। শিল্পের আয়ের একটা মোটা অংশ গ্রামেই ফিরে যেত। এইসব কারণেই বাংলার নগরগুলো চেহারায় হল বড় বড় সমৃদ্ধ গ্রাম—ছোট ছোট গ্রামের সাজানো গোছানো বৃহত্তর রংচঙে সংস্করণ। অষ্টম শতক থেকে যখন বাংলার ব্যবসাবাণিজ্যের স্রোতে ভাঁটা পড়ল, বাঙালীর জীবন তখন আবার পুরোপুরি গ্রামের দিকেই, একান্তভাবে চাষবাসের দিকেই ঝুঁকে পড়ল। ফলে, বাঙালী জীবনে কোন জোয়ার লাগল না ; একটু ঢেউ শুধু দেখা দিয়ে মিলিয়ে গেল।

স্বর্ণযুগ

চতুর্থ আর পঞ্চম শতক ভারতের তাই সত্যিকারের স্বর্ণযুগ। সমুদ্র আর স্থলপথে ব্যবসাবাণিজ্যের ভেতর দিয়ে সে-সময়ে বিদেশ থেকে প্রচুর সোনা-দানা আসত। সমাজের নানা স্তরে সাধারণ মানুষের হাতে সে ধনদৌলতের একটা ভাগ এসেছে। কারণ বাইরের বাজারে কোন কোন শিল্পের চাহিদার ফলে কিছু কিছু কৃষিজাত পণ্যেরও চাহিদা বেড়ে যায়। ফলে, চাষের কাজেও কিছুটা উন্নতি দেখা দেয়।

উত্তর-ভারতের পূর্ব প্রত্যন্ত দেশ হওয়া সত্ত্বেও এই বৈদেশিক বাণিজ্যে বাংলাদেশও কিছুটা ভাগ বসিয়েছিল। বাংলাদেশে গড়ে উঠেছিল দুটি সমৃদ্ধ সামুদ্রিক বন্দর—গঙ্গাবন্দর আর তাম্রলিপ্ত। ফলে, সাধারণ মানুষের কেনাবেচায় এদেশেও স্বর্ণমুদ্রা স্থান পেয়েছিল ; বণিক আর শিল্পীকুল রাষ্ট্রের কাছে পেয়েছিলেন সসম্মান প্রতিষ্ঠা। জীবনযাত্রার মান উন্নত হল, সংস্কৃতি সুসমৃদ্ধ হল।

তারপর রোম-সাম্রাজ্য ভেঙে গেল ; তার যে সোনাদানা নিয়ে ভারতের এত সমৃদ্ধি, বন্ধ হয়ে গেল তার পথ। বৈদেশিক বাণিজ্যের মোটা অংশ আরব বণিকদের হাতে চলে গেল। পঞ্চম শতকের শেষাশেষি থেকে

এমনি করে ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্যের কপাল ভাঙতে শুরু করে দুশো বছরের মধ্যে তার একেবারে মরার হাল হল। এই দুশো বছরে মুদ্রার মধ্যে তার সুস্পষ্ট ছাপ পড়েছিল। প্রথমে দেখা গেল স্বর্ণমুদ্রার ওজন আর নিকষমূল্য ক্রমেই কমে আসছে; দ্বিতীয় স্তরে জাল আর নকল মুদ্রা দেখা দিয়েছে; তৃতীয় স্তরে দেখা গেল, রুপোর মুদ্রা স্বর্ণমুদ্রাকে হটিয়ে দিচ্ছে; চতুর্থ স্তরে রুপোর মুদ্রারও অবনতি ঘটেছে; পঞ্চম স্তরে রুপোর মুদ্রাও একেবারে উধাও হয়েছে।

প্রতিবেশী কোন কোন দেশের সঙ্গে বাংলাদেশ পাল আমলে স্থলপথে বাণিজ্য-সম্বন্ধ পাতিয়ে হারানো সমৃদ্ধি কিছুটা ফিরে পাবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তাতেও তার কৃষির ওপর ঐকান্তিক নির্ভরতা ঘোচেনি। সেন আমলে বাংলাদেশ একেবারেই কৃষিনির্ভর, ভূমিনির্ভর, গ্রাম্য সমাজে পরিণত হল। এই পর্বে সোনা-রুপো দূরের কথা, কোন রকম ধাতুর মুদ্রাই আর দেখা যায় না।

গ্রাম এবং কৃষি বাঙালীর জীবনে সর্বেসর্বা হয়ে থাকল। স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামের থিতিয়ে-থাকা জীবনের নিশ্চিন্ততা আর স্বাচ্ছন্দ্য, স্নিগ্ধতা আর আমেজ বাঙালীকে এমন করে পেয়ে বসল যে, বাইরের সংগ্রামময় তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ বহু-বিস্তৃত জীবনের ডাক কিছুতেই তার কানে গেল না।

বহির্বাংলা

একেবারে এক প্রান্তে হওয়া সত্ত্বেও বরাবরই বাংলার সঙ্গে ভারতের যোগ ছিল। ভারতের রাষ্ট্র-জীবনে বাংলার একটা বড় অংশ ছিল। মৌর্য সম্রাটদের আমল থেকেই একেবারে আদিযুগের শেষ পর্যন্ত কখনও সেই সম্বন্ধ ঘোচেনি। পঞ্চম-ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত বাংলার রাষ্ট্রীয় ইতিহাস হল মধ্য ভারতের বাম বাহু প্রসারণের ইতিহাস—কৌমকেন্দ্রিক বিভিন্ন ঘাঁটিকে রাজতন্ত্রের আওতায় টেনে আনার সুদীর্ঘ ইতিবৃত্ত। ষষ্ঠ শতকের শেষ এবং সপ্তম শতকের গোড়া থেকে বাংলাদেশ উত্তর ভারতের উত্তরঙ্গ স্রোতে ঝাঁপ দিয়ে ক্রমে ক্রমে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের রাজনৈতিক জীবনে নিজের একটি বিশিষ্ট স্থান করে নেয়। অষ্টম ও নবম শতকের দীর্ঘকাল ধরে যে তিনটি রাষ্ট্রশক্তি সারা ভারতে নিজেদের প্রভাব বিস্তারের জন্যে লড়েছিল, তার মধ্যে একটির কেন্দ্র ছিল পাল আমলের বাংলাদেশ। খুব সম্ভব এই সময়ে বাংলাদেশের কিছু কিছু লোক গিয়ে পঞ্জাবের পার্বত্য অঞ্চলে নতুন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজবংশের পত্তন করেছিল। দশম

শতকে বরেন্দ্রভূমির গদাধর দক্ষিণ ভারতে বেলাবি জেলায় একটি ক্ষুদ্র সামন্ত-রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই শতকে প্রথম মহীপালের রাজ্য ও রাষ্ট্রশক্তি উত্তর ভারতের অন্যতম শক্তি বলে গণ্য হত। একাদশ শতক থেকে দক্ষিণ-ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সম্বন্ধ বেড়ে যায় এবং বাংলাদেশ ক্রমে দক্ষিণ ভারতের রাষ্ট্রীয় প্রভাবের কবলে জড়িয়ে পড়ে। তারই ফলে সেন-বংশের প্রতিষ্ঠা। শুধু রাষ্ট্রীয় সম্বন্ধই নয়, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ধর্ম ও সংস্কৃতির দিক থেকেও বাংলাদেশ সারা ভারতের সঙ্গে কাশ্মীর থেকে সিংহল, গুজরাট থেকে কামরূপ পর্যন্ত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বজায় রেখেছে। ভারতবর্ষের বাইরেও তিব্বতে, ব্রহ্মদেশে, সুবর্ণদ্বীপে, পূর্ব-দক্ষিণ সমুদ্রশায়ী অন্যান্য দেশ ও দ্বীপমালায়ও সে যোগাযোগ নানা সূত্রে ছড়িয়ে পড়েছিল।

রাষ্ট্র-স্বাতন্ত্র্য

নানা ভাঙাগড়ার ভেতর দিয়ে বাংলাদেশ কেবলই চেয়েছে তার স্বতন্ত্র রাষ্ট্রীয় সত্তা প্রতিষ্ঠা করতে। গুপ্ত-পর্বে উত্তর-ভারতের কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের বন্ধনে বাঁধা পড়েও বাংলাদেশ সে আদর্শ ভোলেনি। শশাঙ্কের সময় থেকেই এই লক্ষ্যের দিকে তার আরও বেশি রকম নজর পড়ে। পরে বিশেষ করে পাল-আমলে স্বাধীন স্বতন্ত্র সত্তার আদর্শ আরও জোরালো হয়ে ওঠে। শুধু বাংলা নয়, এই পর্বে বৃহদ্বঙ্গের কথা শোনা যায়। এই স্বাধীন স্বতন্ত্র সত্তার চেতনাই বাংলার রাষ্ট্রীয় চেতনা। বার বার অন্তর্দ্বন্দ্বে বিপর্যস্ত হলেও বাংলাদেশ বারবারই আবার সে আদর্শকে ফিরে পাবার চেষ্টা করেছে।

বাংলার সেই স্বাতন্ত্র্যবোধ যত প্রবলই হোক, তা কখনও তার সর্ব ভারতীয় চেতনাকে আচ্ছন্ন করেনি। কিন্তু পাল-পর্বের দ্বিতীয় পর্যায় থেকে এই সর্বভারতীয় বোধের অভাব দেখা যেতে লাগল। সারা ভারতের চেয়ে তার একটি প্রান্তের স্বতন্ত্র সত্তা, একটি প্রান্তের লাভ-ক্ষতিই বড় হয়ে উঠে বাংলার রাষ্ট্রীয় দৃষ্টিকে ছোট করে আনল। বৈদেশিক মুসলিম অভিযাত্রীরা যখন ভারতের বড় বড় অঞ্চল অধিকার করে বসেছে, তখন তার বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের বদলে বাংলার রাজারা বরং সেই প্রতিরোধের শক্তিকেই আঘাত দিয়ে দুর্বল করেছেন।

বাংলাদেশ একদিকে বৌদ্ধ ধর্ম, অন্যদিকে ব্যবসা-বাণিজ্য আশ্রয় করে দেশবিদেশের সঙ্গে যে যোগ প্রতিষ্ঠা করেছিল, পাল-আমলের শেষের দিকে এবং

বিশেষ করে সেন-বর্মণ আমলে সে যোগ যখন ছিন্ন হল—তখন বাংলাদেশ একেবারে নিজের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে নিল। নানা দিক থেকে বিড়ম্বিত সমাজ-জীবনে গণৎকার এসে জাঁকিয়ে বসল ; বাঙালী সমাজকে স্তর-উপস্তরে টুকরো টুকরো করে ভেঙে আরও ভাল করে স্মৃতি-শাসন দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা হল। বামুন-পুরুতেরা হল সমাজের সর্বেসর্বা। ডাণ্ডাবেড়ি পরিয়ে সমাজকে রক্ষণশীলতার গর্তে ঠেলে ফেলা হল। যে সমাজে খামখেয়ালী প্রকৃতির মুখ চেয়ে ফসল ফলাতে হয়, যে সমাজের ঘাঁটি হল নিথর নিশ্চল গ্রাম আর জমি—সেখানে কাজটা কঠিন ছিল না।

সংকীর্ণতা

আর্য-ধর্ম, সংস্কৃতি ও সমাজবন্ধনের যে ঢেউ অনেক পরে বাংলাদেশে এসেছে তার মধ্যে বেগ ছিল খুবই কম। ঢেউ যেটুকু লেগেছে, তা বর্ণ-সমাজের উঁচু কোঠায়, শিক্ষিত এবং মার্জিত স্তরে। একমাত্র আর্য বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতিই কিছুটা সেই গণ্ডির বাইরেও স্থান পেয়েছে—তাও অনেক পরে, সপ্তম-অষ্টম শতকের পর থেকে। আর্য-ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতির ঢেউ কিছুটা আছড়ে পড়েছে গঙ্গার পশ্চিম তীর পর্যন্ত ; অর্থাৎ, মোটামুটি পশ্চিমবঙ্গে। কিন্তু গঙ্গার পূর্ব ও উত্তর তীরে সে ঢেউ যত গেছে ততই তার বেগ স্তিমিত হয়েছে।

আর্য প্রভাব

বাংলাদেশে এমন হবার কারণ আছে। প্রথমত, এত দূর দেশে আর্য ধর্ম ও সংস্কৃতির ঢেউ আসতে দেরি হয়েছে। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশের লোকদের প্রতি এই ধর্ম ও সংস্কৃতির ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যের ভাব কাটতে সময় লেগেছে এবং বরাবরই তা একটা গণ্ডির মধ্যে থেকে প্রাণপণে ছোঁয়াচ বাঁচাবার চেষ্টা করেছে। তৃতীয়ত, বাংলার কৌম সমাজও আর্যধর্ম ও সংস্কৃতির স্রোত ঠেকাবার জন্যে প্রাণপণে যুঝেছে এবং যখন আর পারেনি তখনও সেই স্রোতে গা না ভাসিয়ে, দেওয়া-নেওয়ার ভেতর দিয়ে একটা বোঝাপড়ায় আসবার চেষ্টা করেছে। তাই বাংলাদেশের আর্যধর্ম ও সংস্কৃতির কাছে মাথা নোয়ালেও ব্রাহ্মণ ও উচ্চতর দুয়েকটি সম্প্রদায়ের বাইরে এই ধর্ম ও সংস্কৃতির বন্ধন শিথিল ; তার প্রতি শ্রদ্ধা কুণ্ঠিত। চতুর্থত, বাংলাদেশে নানা রক্তের মেশামেশির ফলে ও অন্যান্য ঐতিহাসিক কারণে জাত ও বর্ণের বাছবিচার আর্যাবর্ত দক্ষিণ-ভারতের মত অতটা কঠোর হয়ে উঠতে পারেনি।

তাই মধ্যগাঙ্গেয় বা আর্য-ভারতের সঙ্গে ধর্ম, সংস্কৃতি ও সমাজবন্ধনের অনেক অমিল দেখা যায়। আর্য-ভারত সনাতনত্বের আদর্শে স্থির ও অবিচল শাস্ত্রশাসনের বন্ধনে আড়ষ্ট। যা পেয়েছে, তাকেই সে আঁকড়ে ধরে থাকতে চায়। যে কোন পরিবর্তনের প্রতি সে বিমুখ। শত শত বছর ধরে তাই তার ধর্মে, রাষ্ট্রে কিংবা সমাজে কোন বৈপ্লবিক আলোড়ন দেখা দেয়নি।

বাংলাদেশ ঠিক এর উল্টো। ধর্মের রূপ বার বার সে বদলেছে। বহু দেবতার সঙ্গে সে মানুষের মত সম্বন্ধ পাতিয়েছে। তার শাস্ত্রচর্চা আর জ্ঞানচর্চায় যুক্তি আর বুদ্ধির চেয়ে প্রাণধর্ম ও হৃদয়াবেগের প্রাধান্য। তার পরিবার ও সমাজবন্ধন সনাতনত্বের বিরুদ্ধে। তার ব্যবহার-শাস্ত্রে দায়াধিকার ও স্ত্রীধনের স্বীকৃতি ও বিধিব্যবস্থা আদিম মাতৃতান্ত্রিক কৌম সমাজের আদর্শ থেকেই নেওয়া। বাঙালীর হৃদয়াবেগ, প্রাণধর্ম ও ইন্দ্রিয়ালুতার উৎসও হল সেই আদিম কৌম সমাজ। এই প্রাণধর্ম ও ইন্দ্রিয়ালুতাই মানুষের প্রতি তার শ্রদ্ধা ও অনুরাগে রূপান্তর লাভ করেছে। দেবতা মাটির ধুলোয় এসে মানুষের বেশে দেখা দিয়েছেন। মানুষই হয়েছে দেবতার মাপকাঠি। এরই অন্যদিকে, বাংলার বস্তুনিষ্ঠা; মানবদেহ ও কায়াসাধনার প্রতি তার অসীম অনুরাগ; সাংসারিক জীবন ও পরিবার-বন্ধনের প্রতি তার নাড়ীর টান, রূপ রসের প্রতি তার গভীর আসক্তি। বেদান্তে তার বিরাগ—শুষ্ক জ্ঞানসাধনার প্রতি তার অভক্তি।

বাঙালীর এই চরিত্র ও জীবনদর্শন তার সমাজে আর রাষ্ট্রবিন্যাসে, জীবন আর সংস্কৃতিতে একদিকে যেমন শক্তি অন্যদিকে তেমনি দুর্বলতা হয়ে দেখা দিয়েছে। তাই পরবর্তী দুশো বছরের হাতে আদিকালের বাঙালী যে সমাজ-বিন্যাস উত্তরাধিকার হিসেবে রেখে গেল—স্তর উপস্তরের কঠিন নিগড়ে বাঁধা সেই সমাজ বিদেশী আক্রমণের সামনে সুদৃঢ় চরিত্রবল ও দুর্জয় প্রতিরোধের স্পৃহা নিয়ে দাঁড়াতে পারল না। ব্যাপক সামাজিক দুর্নীতির কীট ভেতর থেকে সমাজ-জীবনের সমস্ত শাঁস ও রস টেনে নিয়ে তাকে ফোঁপরা করে দিয়েছিল। শাস্ত্রের অন্ধ বিধির বাঁধনে সমাজের যে স্তর পঙ্গু, আচার-বিচারের অরণ্যে যারা দিগ্‌ভ্রান্ত—তাদেরই হাতে ছিল

লাভ-ক্ষতি

সামাজিক নেতৃত্বের বন্ধার একটা দিক। সমাজ ছিল একান্তভাবে ভূমি ও কৃষি-নির্ভর ; কিন্তু যারা রৌদ্র-জলে ভিজে-পুড়ে ফসল ফলায়, তাদের প্রতি সমাজভুক্ত রাষ্ট্রের নায়কদের ছিল গভীর অবজ্ঞা। তাই সেই সব রাষ্ট্রে ও সমাজ-নায়কদের প্রতি তাদের কোন আন্তরিক শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস ছিল না। তাদের মধ্যে সুপ্ত হয়ে ছিল বিপ্লব-বিদ্রোহের যে বীজ, তাকে অঙ্কুরিত করে তোলার কোন আয়োজন ছিল না। সে আয়োজন থাকলে পরবর্তী কালে বাঙালীর ইতিহাসের কী চেহারা হত বলা যায় না। বৈদেশিক মুসলিমরা দেশ আক্রমণ ও রাষ্ট্র অধিকার করার ফলে কৃষিজীবী সমাজে নিদারুণ অসন্তোষ দেখা দিল, কিন্তু অনুকূল অবস্থা না পেয়ে তা বিপ্লব-বিদ্রোহের রূপ পেল না—অন্য খাতে বইতে শুরু করল।

দ্বাদশ শতক তার উত্তরাধিকার হিসেবে কিছু সুফলও রেখে গেল। মধ্য-পর্বের হাতে আদি-পর্ব দিয়ে গেল তার গুহ্য রহস্যময় ধর্ম সম্প্রদায়ের মহত্তম, শ্রেষ্ঠ আদর্শ : মানবতা আর সাম্য-ভাবনা। তার দ্বিতীয় উত্তরাধিকার : ভূমিনির্ভর সমাজ—যেখানে জীবনের মূল ছিল মাটির গভীরে। তাই বাংলার সংস্কৃতির ধারা শত উত্থান-পতনেও কখনও রুদ্ধ হয়নি। তৃতীয় উত্তরাধিকার : শক্তিধর্মের দিকে বাঙালীর ক্রমবর্ধমান আকর্ষণ—যার জোরে শক্তি-উপাসনায় বাঙালী ভয়-ভাবনার কিছুটা ওপরে উঠতে পেরেছিল, মনে কিছুটা সাহস সঞ্চয় করতে পেরেছিল। চতুর্থ উত্তরাধিকার : সে-যুগের উঠতি বাংলা ভাষা—বাংলার ইতিহাসে এই প্রথম দেশের মানুষ দেশী ভাষায় মনের কথা খুলে বলতে পারল, সংস্কৃতের রুক্ষ ধড়াচূড়া ছেড়ে বাংলা ভাষায় বাঙালীর স্নিগ্ধ স্বরূপ ধরা পড়ল।

এদেশে বৈদেশিক মুসলিম-রাষ্ট্রশক্তির প্রতিষ্ঠা মোটেই একটি আকস্মিক ঘটনা নয়—কার্যকারণের অনিবার্য শৃঙ্খলে বাঁধা। সে সময়ে সমাজে বিপ্লবের যে ইশারা ফুটে উঠেছিল, তাকে তার সমস্ত বেগ, সমস্ত মহিমা দিয়ে ফুটিয়ে তোলবার মত নেতৃত্ব তখন সমাজের ভেতরে গড়ে ওঠেনি। জমি তৈরি থাকলেও তাতে বীজ ফেলে ফসল ফলানোর কাজে কেউ হাত দিল না। তার দামও দিতে হল। বাইরের একেকটি ধাক্কায় দুর্বল ও পঙ্গু রাষ্ট্র ও সমাজ-ব্যবস্থা ধ্বসে ধ্বসে পড়ল। সেই সুযোগে বৈদেশিক রাষ্ট্রশক্তি এদেশের মাটিতে পাকাপোক্ত হয়ে বসে গেল।

শেষ কথা

সেদিন সময় বয়ে যেতে দিয়ে যে বিপ্লবের সুযোগ আমরা হারিয়েছি তার দাম আজও আমরা দিয়ে চলেছি।

গ্রন্থ-সূচী

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—(১) বাংলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা। (২) জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য।

বিজয়চন্দ্র মজুমদার—বাংলা ভাষায় দ্রাবিড়ী উপাদান।

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়—(১) গৌড়লেখমালা। (২) গৌড়রাজমালা।

এনামুল হক—আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য।

দীনেশচন্দ্র সেন—(১) বৃহৎ বঙ্গ। (২) গোপীচাঁদের গান। বাংলা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—বৌদ্ধ গান ও দোঁহা।

সতীশচন্দ্র মিত্র—যশোহর ও খুলনার ইতিহাস।

সুকুমার সেন—(১) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস। (২) প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী।

উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ—কাছাড়ের ইতিবৃত্ত।

পদ্মনাথ ভট্টাচার্য—কামরূপ শাসনাবলী।

মণীন্দ্রমোহন বসু—চর্যাগীত।

যতীন্দ্রমোহন রায়—ঢাকার ইতিহাস।

ক্ষিতিমোহন সেন—জাতিভেদ।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর—বাংলার ব্রত।

নলিনীনাথ দাসগুপ্ত—বাংলার বৌদ্ধ ধর্ম।

প্রবোধচন্দ্র বাগচী—বৌদ্ধ ধর্ম ও সাহিত্য।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—বাংলার ইতিহাস।

কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়—বাংলার ভাস্কর্য।

P. C. Bagchi. Trans. and Ed.—Pre-Aryan and Pre-Dravidian.

R. P. Chanda—Indo-Aryan Races.

S. K. Chatterji—(1) Origin and Development of the Bengali Language. (2) Rise of Vernacular Language. (3) Indo-Aryan and Hindi.

Caldwell—Comparative Grammar of Dravidian.
Linguistic Survey of India.
B. C. Majumder—Origin of the Bengali Language.
Mackay—Indus Valley Civilisation.
H. Risley—(1) Peoples of India. (2) Tribes and Castes of Bengal. (3) Anthropometric Data of Bengal.
T. C. Raychoudhuri—Varendra Brahmins of Bengal.
Chakladar—Social Life in Ancient India.
Dacca University—History of Bengal.
W. W. Hunter—A Statistical Account of Bengal.
Majumdar—Inscriptions of Bengal.
S. C. Majumdar—Rivers of the Bengal Delta.
R. K. Mukherji—Changing Face of Bengal.
P. L. Paul—Early History of Bengal.
N. G. Majumdar—Inscriptions of Bengal.
B. C. Sen—Some Aspects of the History of Bengal.
Rhys Davids—Buddhist India.
Raychoudhury—Early History of the Vaishnava Sect.
S. K. Saraswati—Early Sculpture of Bengal.
Sastri, Haraprasad—Discovery of Living Buddhism in Bengal.
S. K. De—(1) Sanskritic Poets. (2) Early History of the Vaishnava Faith and Movement in Bengal.
P. C. Ray—History of Hindu Chemistry.

এই তালিকায় শুধুমাত্র বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় লেখা কয়েকটি গ্রন্থের উল্লেখ করা হল। এ ছাড়াও সংস্কৃত ও পালি ভাষায় লেখা আরও গ্রন্থ এবং তাছাড়া বিভিন্ন পত্রপত্রিকা, পাণ্ডুলিপি ও দলিলপত্রের উল্লেখ মূল গ্রন্থে (ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় : 'বাঙালীর ইতিহাস : আদিপর্ব'—বুক এম্পোরিয়াম) দ্রষ্টব্য।
